শম্ভুরাম

উপন্যাস।

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

কলিকাতা,

১১৫।৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেক্‌ট্রিক মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৭

শম্ভুরাম

সূচনা।

অনেক দিনের কথা বলিতে আরম্ভ করিতেছি। কত দিনের
তাহা ঠিক করিয়া বলিব না এবং গ্রন্থোক্ত পাত্র-পাত্রীর বা ঘটনা
কোন সময়ও নির্দ্দেশ করিব না। এই গ্রন্থের সহিত ইতিহাসের
সম্বন্ধ নাই এবং এতল্লিখিত কোন অভিনেতারই ঐতিহাসিক
নাই; সুতরাং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সময় নির্দ্দেশ করিবার কোন আ
দেখিতেছি না। তবে এইমাত্র বলিতেছি যে, তখন এ দেশে ইংরা
আগমন ঘটে নাই; মুসলমানেরাই তখন ভারতের সম্রাট্ ছিলেন।
দিগের অধীনে সুবাদারগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশ শাসন করিতে
ত্রত্য কর সংগ্রহ করিতেন। এই সকল কার্য্য পরিচালনার
সুবাদারগণ উপযুক্ত ব্যক্তি-বিশেষের হস্তে ভারার্পণ করিতেন।
ব্যক্তিগণ রাজা, মহারাজা, মণ্ডল বা চৌধুরী নামে অভিহিত হইয়া
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ শাসন করিতেন। প্রজাপুঞ্জের উপর সর্ব্বতোভাবে
স্থাপন করিয়া, তাঁহারা প্রায়শঃ স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করি

বিশেষ সম্বন্ধে এই সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বদ্ধ থাকিতেন না।
দারও যথাসময়ে কোষাগারে নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইলে এই সকল
শাসনকর্ত্তার কার্য্যে প্রায়ই হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং এই শা
কর্ত্তৃগণ অবিসংবাদে স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতেন। অ
স্থলেই দেশে হৃদয়হীন অত্যাচার ও দুর্ব্ব্যবহারের স্রোত প্রবাহিত হ
অনেক স্থলেই ক্রন্দন ও হাহাকারের রোলে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হ
অনেক স্থলেই প্রজার ধন, প্রাণ ও মান নিয়ত ঘোরতর বিপদের
হইয়া থাকিত।

দেশে তখন কেবল অর্থবল দ্বারাই সকল প্রকার কার্য্যোদ্ধার হ
রাজসমীপে লোকেরা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের প্রার্থনা নি
করিবার সুযোগ প্রায়ই পাইত না। অর্থ দ্বারা অথবা তদপেক্ষা
ঘৃণিত নানাপ্রকার উৎকোচ দ্বারা রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত ক
লোকেরা আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইত। তখন দস্যু ও
রের প্রবল প্রাদুর্ভাব। অনেক দস্যুসম্প্রদায় স্বেচ্ছামত অত্যাচার ক
নিষ্কৃতি লাভ করিত। কেবল অর্থ দ্বারা রাজ-কর্ম্মচারিগণের পূজা ক
তাহারা নির্ব্বিবাদে অত্যাচারের স্রোতে দেশ প্লাবিত করিত।
থাকিলেও, তৎকালে ভারতের সর্ব্বত্র না হউক, বঙ্গদেশের ভূরি
ঘোর অরাজকতা বিরাজ করিত।

রাজ-পরিবর্ত্তন সহজে ঘটিত না। রাজা অত্যাচারী বা অ
হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আবেদন সহসা সুবাদারের নিকটস্থ
না হইলেও সুবাদার তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু যদি কোন
দস্যুসম্প্রদায় প্রতাপান্বিত হইয়া অধিকতর কর দিবার অঙ্গী

রূপ হিসাবনিকাশ রাখিবার মত কিঞ্চিৎ লেখাপড়া সে জানিত। স... অনেক স্থানে বংশীবদনের প্রভুতা যথেষ্ট; নিকটবর্ত্তী লো... জানিত, বংশীবদন বড় দুর্দ্দান্ত লোক—রাজাপ্রজার ভয় রাখে না। তাহার অনেকগুলি বেতনভোগী লাঠিয়াল আছে; যে ভাবে তাহার বাসবাটী গঠিত, তাহাতে তন্মধ্যে সহসা দস্যু-তস্করাদির প্রবেশ করিবারও উপায় ছিল না। ইহার উপর উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীরা বংশীবদনের নিকট হইতে সময়ে সময়ে নজররূপে নানা প্রকার দ্রব্যাদি লাভ করিতেন, সুতরাং তাহার কাজের উপর কথা কহিবার লোক তখন ছিল না। এমন কি, অনেক স্থলেই বংশীবদন অপরের অপরাধের বিচারক হইত। তাহার কৃত অপরাধ বিচার করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না বা সে জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন দরখাস্ত রাজ-কর্ম্মচারীদিগের নিকট কেহ দিতে সাহস করিত না। যদি কেহ সেইরূপ অসমসাহসিক ব্যাপার করিতে প্রয়াসী হইত, তাহা হইলে সকলেই বুঝিত যে, সে ব্যক্তির সর্ব্বনাশ অতি নিকট; যদি কখন কেহ বংশীবদনের অত্যাচার অসহ্য বলিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ করিত, তাহা হইলে যে সে কথা শুনিত এবং যে তাহা বলিত, উভয়কেই ভয়ানকরূপে লাঞ্ছিত হইতে হইত। বংশীবদনের ভয়ে বাঘে বকরিতে এক ঘাটে জল খাইত।

বংশীবদনের বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর। আকৃতি একটু খর্ব্ব, দেহ পেশল ও বিশেষ বলব্যঞ্জক, লোচনযুগল স্বার্থপরায়ণতার দৃষ্টিতে সদা সমাচ্ছন্ন, অধর স্থূল এবং ভোগাসক্তির পরিচায়ক, দেহের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ।

সংসারে অনেক লোক বংশীবদনের প্রতিপাল্য। তাহার তিনটি পুত্র সন্তান এবং পাঁচটি কন্যা। প্রথম পুত্রের বয়স পনর বৎসর, অবশিষ্ট

পরম্পরাক্রমে অল্পবয়স্ক। দুইটি কন্যার বিবাহ হইয়াছে; জামাতৃদ্বয় বংশীবদনের সংসারেই থাকে। পুত্র ও জামাতৃগণ উচ্ছৃঙ্খল এবং সর্ব্বথা কর্ত্তার আচরণের অনুকরণকারী। বংশীবদনের তিন স্ত্রী। সন্তান না হওয়ায় অথবা পত্নীর বন্ধ্যাত্ব আশঙ্কায়, বংশীবদন যে ক্রমে আর দুই স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ নহে। প্রথমা স্ত্রীর উপর একটু বিরক্ত হইয়া, অপিচ বড় লোকের বহুবিবাহ আবশ্যক বুঝিয়া, সে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করে। দ্বিতীয়া পত্নীকে সে অসময়ে আপনার সমক্ষে হাজির হইতে হুকুম দেয়; পত্নী তাহা পারে নাই। এই অপরাধে বংশীবদন তৃতীয়া পত্নী গ্রহণ করিয়াছে। তখনও তাহার পত্নী-গ্রহণের বাসনা অন্তহিত হয় নাই। সেকালে সঙ্গতিশালী লোকেরা এরূপ বহুবিবাহ প্রায়ই করিত। সুতরাং সকল নিন্দার মস্তকে পদাঘাতকারী বংশীবদন এই বহুবিবাহের জন্য কুত্রাপি নিন্দিত হয় নাই। তিন স্ত্রীই ঘরে থাকিত। কাহাকেও এক দিনের জন্য সে স্থানান্তরে যাইতে দিত না। তদ্ব্যতীত বংশীবদনের তিনটি বিধবা ভগ্নী আপনাদের বহু সন্তানাদি লইয়া, সংসারে সতত হাট বসাইয়া রাখিয়াছে।

বংশীবদন সমৃদ্ধিশালী হইলেও, তাহার পরিবারবর্গকে সকল গৃহকর্ম্মই সম্পন্ন করিতে হয়। কর্ম্মের কোন ভাগাভাগি বা পালাপালি নাই। ভগ্নী ও স্ত্রী, ভাগিনেয়ী ও কন্যা সকলকেই সমস্ত দিন কাজ করিতে হয়। পাক করা, খিড়কির পুকুর হইতে জল আনা, ধান সিদ্ধ করিয়া চাউল প্রস্তুত করা, চিঁড়া, মুড়ি প্রভৃতি ঘরে তৈয়ার করা, গো-শালার কাজ করা, ঘুঁটে দেওয়া ইত্যাদি অসংখ্যপ্রায় কাজে বাটীর সকল লোকই সমস্ত দিন ব্যস্ত। দাস-দাসী অনেক থাকিলেও, সেকালের ধনবান্ গৃহস্থের

গৃহলক্ষ্মীরাও কঠোর গৃহকর্ম্ম সম্পাদন অপমানজনক বলিয়া মনে করিতেন না।

বংশীবদনের তৃতীয়া স্ত্রী মন্দাকিনীর বয়স ষোল বৎসর। মন্দাকিনী সুন্দরী। কঠিন গৃহকার্য্য লইয়া সমস্ত দিন ব্যাপৃত থাকিলেও মন্দাকিনীর লাবণ্য অপচিত হয় নাই। তাহার মুখ সরলতা-পূর্ণ; তাহার দেহ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুপরিণত, সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত এবং কমনীয়। অপরাহ্ণকালে এক প্রকাণ্ড মৃৎকলসী লইয়া মন্দাকিনী খিড়কির পুকুরে জল আনিতে গিয়াছে। কলসী ঘাটের নিকট নিম্নমুখে জলে ভাসিতেছে। মন্দাকিনী আকণ্ঠ জলে নামিয়া গা ধুইতেছে, কাপড় কাচিতেছে। তাহার মুখখানি সেই জলের উপর প্রফুল্ল কমলের মত ভাসিতেছে। মন্দাকিনীর অঙ্গ-সঞ্চালনে জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিয়া অনেক দূর যাইতেছে। বোধ হইতেছে যেন, সেই তরঙ্গের সহিত তাহার মুখকমলও হেলিতেছে ও দুলিতেছে। মন্দাকিনীর মাথার মধ্যস্থলের একটু নিম্নে একটা প্রকাণ্ড খোঁপা। এখনকার মত বিবিয়ানা ধরণে, প্রায় কাঁধের উপর সে কবরী রচিত হয় নাই। এখনকার মত কূর্ম্মাবরণ-গঠিত চিরুণী বা স্বর্ণাবৃত কেশমার্জ্জনীসহায়ে তাহার মোহন কবরী রচিত হয় নাই। এখন সে কবরী পুরাকালের অনেক আচার-ব্যবহারের সহিত বিস্মৃতির সাগরে গা ঢাকিয়াছে। এখন তাহার কথা বুঝাইতে হইলে সুন্দরীরা হাসিবেন, সুন্দরেরাও মুখ ফিরাইবেন। বোঝা লইবার জন্য গামছা বা বস্ত্রখণ্ডের বিঁড়া পাকাইয়া রাজমিস্ত্রীর সঙ্গী স্ত্রীলোকেরা যেরূপে মাথায় বাঁধে, মন্দাকিনীর কবরী প্রায় তাহারই অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে ইহা ঘনকৃষ্ণ, উজ্জ্বল ও মসৃণ কেশ দ্বারা রচিত এবং বিঁড়া যে স্থানে যে ভাবে স্থাপিত হয়, ইহা তদপেক্ষা

কিঞ্চিৎ অধোভাগে প্রতিষ্ঠিত। এই নিবদ্ধ কুন্তলরাশির পুরোভাগে মন্দাকিনীর আয়ত লোচন, সূক্ষ্ম ললাটে চিত্রিতবৎ ভ্রূযুগল, সূক্ষ্মাগ্র সুপরিণত নাসা এবং পক্ক-বিম্বফলাভ-অধরৌষ্ঠ-সংবলিত বদন-কমল বড়ই শোভাময় হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ চিমনির মধ্যস্থ আলোক যেরূপ নয়নরঞ্জন করে, মেঘমালা-পরিপ্লুত সৌদামিনী যেরূপ সৌন্দর্য্য বিলায়, পাষাণ-প্রতিমার চরণ-পঙ্কজে জবাকুসুম যেরূপ শোভা পায়, ঘনকৃষ্ণ চিকুর-সন্নিধানে মন্দাকিনীর বদন সেইরূপ অনুপম সৌন্দর্য্য বিকীরণ করিতেছে। মন্দাকিনীর ললাটে সীমন্ত-সন্নিধানে অতি প্রকাণ্ড সিন্দূর-রেখা। হায় সিন্দূর! একদিন তোমাকে লইয়া হিন্দু-সীমন্তিনীগণ কতই আদর করিতেন; তখন তোমাকে সকল শোভার সারস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহারা সীমন্তে প্রতিষ্ঠিত করিতেন এবং তোমারই শোভায় তাঁহারা আপনাদিগকে পরম শোভাময়ী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এখন তুমিও না কি অসভ্যতার পরিচায়ক হইয়াছ এবং অন্যান্য অসভ্যতার সহিত তুমিও না কি সন্ত্রস্ত-ভাবে পলায়ন করিতেছ?

মন্দাকিনীর নাসায় নোলক নাই; কিন্তু নাসায় একটা মোটা ছোট সোণার বেসর। এই বেসর যে কি পদার্থ, তাহা এখনকার পাঠক-পাঠিকা হয় তো বুঝিতেই পারিবেন না। বেসর একটা সোণার পাত-বিশেষ; তাহারই নিম্নভাগে সোণার কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোলনা। ইহা তৎকালে অতি সমাদৃত ভূষণরূপে পরিগৃহীত হইত। বংশীবদন ধনবান্ ব্যক্তি এবং মন্দাকিনী তাহার তৃতীয়া পক্ষের সুন্দরী পত্নী। তাই তাহার নাকে সোণার বেসর উঠিয়াছিল। আরও দুই একখানা সোণার গহনা তাহার ছিল। কিন্তু তৎকালে সোণা প্রায়ই ব্যবহৃত হইত না; কাঁসা ও রূপার

গহনাই তখন এতদ্দেশীয় মহিলাকুলের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিত। এখন সোণার ছড়াছড়ি হইয়াছে এবং অন্যান্য ভাষার শব্দ লইয়া এখন আমাদিগের অলঙ্কারের অভিধান পরিপুষ্ট হইতেছে। যে যে আকারের অলঙ্কার এক সময়ে পরম সমাদৃত ছিল, এখন তাহা হাস্যজনক বা ঘৃণাজনক হইয়াছে। মন্দাকিনীর কর্ণে সোণার ফুলঝুমকা ঝুলিতেছে; তাহার প্রকোষ্ঠে রূপার পঁইছা ও বাউটি, চরণে রূপার স্থূল বাঁকমল। সুন্দরীর দেহে ইহা ছাড়া আর কোন ভূষণ নাই।

অতি সত্বর মন্দাকিনী অঙ্গ-মার্জ্জনাদি শেষ করিল। কর্ত্তার সোহাগের স্ত্রীই হউক, আর পদ-মর্য্যাদা যাহাই হউক, সংসারে গঞ্জনার ভয় অনেক। বাঘিনীর ন্যায় দুই সতিনী ও তিন ননদিনী দোষে অদোষে কেবলই গঞ্জনা দেয়। প্রাণপণে মন্দাকিনীকে সাবধান থাকিতে হয়; কিন্তু নিস্তার কিছুতেই নাই। দোষ না পাইলেও, কাল্পনিক দোষ ধরিয়া মন্দাকিনীর শিরে অপমানের বজ্রপাত স্বতই হইয়া থাকে। ঈষপের কথাগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক ব্যাঘ্র, পানীয় জল অপরিষ্কার করিতেছে বলিয়া এক ক্ষুদ্র পশুকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। পশু যখন বুঝাইয়া দিল যে, জলের সমীপেও সে যায় নাই, তখন ব্যাঘ্র বলিয়াছিল, 'তবে যে জল অপরিষ্কার করিয়াছে, সে তোর পিতা। পিতার অপরাধে তুই বধ্য।' এরূপ আশ্চর্য্য যুক্তি অবলম্বনে মন্দাকিনীকে নিগ্রহ করিতে কেহই ক্রুটি করিত না।

মন্দাকিনী সুশীলা, পতিপরায়ণা, ধর্ম্মভীতা, মিষ্টভাষিণী; কিন্তু এ সকল গুণ না থাকিলেই মন্দাকিনী বোধ হয় সুখী হইতে পারিত। "গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।" মন্দাকিনী রণচণ্ডীরূপে সপত্নী-

হস্তে, মেঘমন্দ্রে চীৎকার করিতে পারিলে, মন্দাকিনী অট্টহাসিতে দিগন্ত কম্পিত করিয়া পদাঘাতে সকলের মস্তক মসৃণ করিতে পারিলে, মন্দাকিনী মিথ্যা, কপটতা, ধর্ম্মহীনতা ও দুর্ব্বৃত্ততায় সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিলে নিরীহ মেষ-শাবকের ন্যায় কাতরভাবে তাহাকে দিন-যামিনী যাপন করিতে হইত না, পালিত কুক্কুরের ন্যায় প্রসাদ-লোলুপ হইয়া কাল কাটাইতে হইত না এবং পদ-দলিত কুসুমের ন্যায় ঘৃণিত-ভাবে সংসারের এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিতে হইত না।

ভয়ে ভয়ে মন্দাকিনী সরোবর হইতে উঠিল। উত্থানকালে তাহার সিক্ত স্থূলবসন অঙ্গের সহিত প্রলিপ্ত হইল। এখনকার রমণীরা যেরূপ সূক্ষ্মবস্ত্রে কমনীয় কলেবর আবৃত করিয়া থাকেন, মন্দাকিনীর পরিধানে সেরূপ বস্ত্র থাকিলে তাহাকে এ অবস্থায় উলঙ্গিনী হইতে হইত। কিন্তু সেই অসভ্য কালের অসভ্যা মন্দাকিনীর পরিধান-বস্ত্র অতি স্থূল এবং সর্ব্বপ্রকার বিলাসাড়ম্বর-বিহান। তথাপি সেই বস্ত্রও মন্দাকিনীর দেহ-সংলগ্ন হইয়া তাহার দৈহিক পরিপুষ্টতা ঘোষণা করিল। সুন্দররূপে মৃৎকলসের বাহ্যাভ্যন্তর ধৌত করিয়া এবং তাহার অধোভাগ দ্বারা বারং-বার জলোপরি ভাসমান আবর্জ্জনাদি দূর করিয়া সে কলসী জলপূর্ণ করিল। তদনন্তর বাম-কক্ষে সেই জলপূর্ণ বৃহৎ কলসী অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া মন্দাকিনী উপরে উঠিল এবং ভবনের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার গতি যদি রাজহংসীর মত হইত অথবা করিণীর ন্যায়ও হইত, তাহা হইলে আমরা এ স্থলে একটা বলিবার কথা পাইতাম। মন্দাকিনী দক্ষিণ-বাহু বহু দূরে প্রসারিত করিয়া, বক্রভাবে দেহ হেলাইয়া অকা-তরে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যদি সেই সুন্দরী ধীর-পাদ-বিক্ষেপে ধরণী

পৃষ্ঠে মৃদুভাবে চরণ অঙ্কিত করিয়া যাইতে পারিত, যদি সে নর্ত্তনশীলা নায়িকার ন্যায় দেহের নানা প্রকার আন্দোলন করিতে করিতে অগ্রসর হইত এবং যদি সে বর্ত্তমান কালের সুশিক্ষিতা স্বাধীনা নারীর ন্যায় হাব-ভাব ও লীলা ছড়াইতে ছড়াইতে পথ চলিতে পারিত, তাহা হইলে এ স্থলে তাহার গতির কথা আমরা বর্ণনা করিবার সুযোগ পাইতাম। অসভ্যা মন্দাকিনী ইহার কিছুই করিতে পারিল না। ষোড়শ বর্ষে সে এখনকার পরিণত-পরিপুষ্ট-কায়া যুবতীর অপেক্ষাও বলশালিনী ও দীর্ঘাবয়বা; অধিকন্তু তাহার কক্ষে মাটীর এক প্রকাণ্ড কলসী। এ সকলই অতিশয় বিরক্তি-জনক ও নিন্দনীয়। কাজেই তাহার সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিতে আমাদের সাহসে কুলাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বড়লোক শুনিয়া কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, বংশীবদনের প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, সেই অট্টালিকায় সারি সারি সবুজ-বর্ণাবৃত অনেক দ্বার ও জানালা আছে এবং সেই জানালা ও দ্বারের অভ্যন্তর-ভাগে সাসির কবাট আছে, তাহা হইলে তাঁহাকে হতাশ হইতে হইবে। বংশীবদনের অনেকগুলি ঘর; কিন্তু সকলগুলিই বিচালি দ্বারা আচ্ছাদিত মাটীর ঘর। তাহার মধ্যে দ্বার ও বাতায়নের সংখ্যা অতি অল্প। অনেকগুলি ঘর দ্বিতল; মাটীর ঘরের উপর মাটীর ছাদ, তাহার উপর খড়ের চাল। বংশীবদনের বাসভবন বহু মহলে বিভক্ত এবং অনেক স্থান অধিকার করিয়া বিস্তৃত। এক মহল অন্তঃপুররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্তঃপুরবাসিনী নারীগণ বাহিরে যাওয়া আসা করে না, এমন নহে; কিন্তু তাহারা নির্দ্ধারিতরূপে অন্তঃপুরখণ্ডেই বাস করে; সে খণ্ডে অনেক ঘর এবং তন্মধ্যে সতত বিষম কলরব। অন্তঃপুর-সংলগ্ন আর এক ক্ষুদ্র খণ্ডে পাক হয়। এই রন্ধন-মহলে দ্বিতল-ঘর নাই, এখানে ঘরের সংখ্যাও কম। সতত প্রয়োজনীয় পদার্থাদি রাখিবার নিমিত্ত দুইটি নির্দ্ধারিত ঘর এবং পাকের জন্য একখানি প্রকাণ্ড চালা, আর আহারাদির নিমিত্ত একখানি বড় ঘর ব্যতীত এ মহলে আর ঘর নাই। আর এক মহলে গোশালা। অনেক দুগ্ধবতী গাভী ও বৎস, মহিষ ও বলদ সেই স্থানে রক্ষিত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চালার চারিদিকে এই সকল গৃহপালিত পশুর নিমিত্ত ডাবা সংস্থাপিত। এই অংশ অতিশয়

পঙ্কিল ও পূতিগন্ধ-পূর্ণ। আর এক অংশে বংশীবদনের কৃষক, রক্ষক, দাস ও কর্ম্মচারিগণ অবস্থিতি করে। অন্য এক অংশে কাছারী হয়। এ অংশে দুইখানি বৃহৎ ঘর সতত নানা প্রকার লোকে পরিপূর্ণ থাকে। তাহার সম্মুখে প্রকাণ্ড অঙ্গন। সেই অঙ্গনে একটা বৃহৎ বকুল-বৃক্ষ, দুইটা চাঁপা, একটা নিম্ব-বৃক্ষ, একটা শেফালিকা ও একটা কদম্ব-বৃক্ষ। সেই সকল বৃক্ষমূলে সমস্ত দিনই নানা লোক নানা অভিপ্রায়ে সমাগত হইয়া বিশ্রাম করে। এই অঙ্গনের অপর দিকে একখানি সুবিস্তৃত দ্বিতল ঘর। সেই ঘরখানি বড়ই সুন্দররূপে নির্ম্মিত। তাহার অভ্যন্তরে তক্ত-পোষের উপর একটা লম্বা বিছানা আছে। দেয়ালের গায়ে অনেক দেবদেবীর পট। ছিন্ন-বস্ত্রের উপর মাটীর প্রলেপ লাগাইয়া এই সকল পট লিখিত হইয়াছে। তাহাতে রেনল্ড বা র‍্যাফেলের ন্যায় কোন অসাধা-রণত্ব আছে কি না, আমরা জানি না। কিন্তু যাহা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশে তৎসমস্ত চিত্রিত, তাহা যে সুন্দররূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমা-দের কোনরূপ সন্দেহ নাই। যে সকল শিল্পী এই সমস্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, তাহারা অবলম্বিত কার্য্য আন্তরিক অনুরাগের সহিত সম্পন্ন করিয়াছে সন্দেহ নাই। একখানি চিত্রে রজতগিরি-সন্নিভ মহাদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। তাঁহার বাম-হস্তে এক প্রকাণ্ড ডম্বুরা; আবেশে তাঁহার নয়নদ্বয় মুকুলিত; গ্রীবা দক্ষিণে ঈষৎ নত। জটাজূট সমস্ত বিশৃঙ্খলভাবে আপতিত। দেহস্থিত ফণিগণ আলস্যে অবসিত; যেন দেবাদিদেবের পবিত্র-মুখ-নিঃসৃত প্রেমপূর্ণ হৃদয়-দ্রবকর সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণে বিশ্ব-সংসার ভক্তি ও প্রেমে আপ্লুত হইতেছে। চিত্রকরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। আর একখানি চিত্রে শুম্ভনিশুম্ভ-নিসূদিনী জগদম্বার ভয়ঙ্করী

মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন, প্রলয়ঙ্করী দেবী রণরঙ্গিণী-সাজে বসুন্ধরা ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হৃদয় ভয়ে ও ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া স্বতঃ সেই স্থানে নত হইয়া পড়ে। আর এক চিত্রে গোপীজনবল্লভ মদনমোহন রাসলীলায় প্রমত্ত। চিরবসন্ত-বিরাজিত বৃন্দাবনে যমুনাতীরে ধীরসমীরে মদন-মোহন রূপ ধারণ করিয়া বিশ্বনাথ প্রেমার্থিনী গোপিকাগণের মনোরঞ্জনে নিরত। কোকিল কুহরিয়া বসন্তের সমাগম ঘোষণা করিতেছে। নবোদ্গত মুকুল-কিশলয়াদির সুগন্ধে বসুন্ধরা আমোদিত হইয়াছে। কুঞ্জে কুঞ্জে, বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায় কুসুম-সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আকাশে শরতের পূর্ণ শশধর অমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সমস্ত পদার্থকে স্বর্ণবর্ণে আবৃত করিয়াছেন। কুসুমে কুসুমে কুঞ্জে কুঞ্জে ষট্‌পদ-সমূহ গুঞ্জন করিতেছে। গভীর নিশাতেও উষাভ্রমে বিহঙ্গমগণ কূজন করিয়া উঠিতেছে। পশু-পক্ষী অতৃপ্ত-নয়নে ভগবানের সেই মধুর লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছে। কুরঙ্গাদি সকলেই যেন চিত্রার্পিত-পুত্তলিকাবৎ স্বস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেবলীলা দর্শন করিতেছে। বামে হর্ষোৎফুল্ল-নয়না প্রেমময়ী অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে হৃদয়-দেবতা বিশ্বনাথের প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতেছেন, আর সেই মুরলীধারী, কেলি-কুশল, লীলাময় নন্দনন্দন বঙ্কিমঠামে দণ্ডায়মান হইয়া উৎফুল্লাননে বংশীধ্বনি করিতে করিতে জগতের সর্ব্বত্র প্রেম, শান্তি ও আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। এই চিত্র দেখিলেই এই সকল ভাব হৃদয়ে যেন জাগিয়া উঠে। ঘরের চতুর্দ্দিকেই এইরূপ ভাবময় অনেক চিত্রপট বিলম্বিত।

এই ঘরে বংশীবদন একাকী বসিত এবং তাহার অনুমতি ব্যতীত

এই ঘরে অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। এমন কি, তাহার পুত্র-কন্যা কি জামাতাও এ ঘরে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। ঘরের অনেকগুলি দ্বার। কোন কোন দ্বার অবলম্বন করিয়া গৃহান্তরে গমন করা যায়। অনেকে বলে, এই ঘরের নিম্নদেশে একটা দ্বার আছে, সে দ্বারের কথা সকলে জানে না। সেই দ্বারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে ভূগর্ভে একটি ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ঘরটি বংশীবদনের ধনাগার। লোকে মনে করে, ধনাগারের পথ এই ঘরে আছে বলিয়াই সাধারণতঃ এ স্থানে অন্যের প্রবেশাধিকার নাই। আমরা কিন্তু এরূপ মনে করি না। কারণ, নিম্নদিকে যে পথ আছে তাহা কোনরূপেই দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয়, বংশীবদন অতুলনীয় ধনী, অথচ কোথায় তাহার ধন থাকে, ইহা জানিতে না পারিয়া লোকে ইহাই ধনাগারে প্রবেশের দ্বার বলিয়া মনে করে। আমরা কিন্তু এই ঘরকে বড়ই কুকীর্ত্তির পাপনিকেতন বলিয়া মনে করি। কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য, হৃদয়হীন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ বংশীবদন এই ঘরে অনেক কুল-কামিনীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছে। এই ঘরে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহার জন্য অনেকের প্রাণান্ত হইয়াছে, অনেককে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে এবং অনেককে বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া দেশত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইহা পাপের মন্দির এবং অপবিত্রতার পঙ্কিল নিকেতন।

বংশীবদনের এই সুবিস্তৃত ভবনের চতুর্দ্দিকে অনেক উন্মুক্ত স্থান। তন্মধ্যে কুত্রাপি একটি বৃক্ষ বা গুল্মেরও সমাবেশ নাই; তাহার পরে প্রকাণ্ড প্রাচীর; সে প্রাচীরও মাটীর, কিন্তু তাহা অতিশয় স্থূল ও উচ্চ। এই মৃত্তিকা-প্রাচীর অতি দৃঢ়। এই প্রদেশের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অতিশয়

কঠিন। বহু বর্ষা ও ঝটিকা তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার কোন অংশই ক্ষয় হয় নাই। প্রাচীর-পরিবেষ্টিত এই সুবিস্তৃত ভবনে প্রবেশ করিবার এক প্রকাণ্ড দ্বার আছে। সেই দ্বারে অসংখ্য লোহার গুল-মারা প্রকাণ্ড কবাট। সেই দরজা সহজে ভগ্ন করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। দরজার বাহিরে ও ভিতরে দিবা-রাত্রি অনেক রক্ষী অপেক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদিগের অবস্থানের জন্য উভয় পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর আছে। ভবনে প্রবেশ করিবার আর এক পথ আছে, তাহা অন্তঃপুর-সংলগ্ন, কিন্তু সেই খিড়কির দ্বারে সদর-দরজার ন্যায় দুর্ভেদ্য কোন কবাট নাই। সেই দরজার পরেই খিড়কির পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চারিদিকেই প্রকাণ্ড পাহাড় এবং পাহাড়ের প্রায় সকল দিকে কুঁচ, বৈঁচ, বনফুল প্রভৃতি কণ্টকী বৃক্ষলতাদির দূরব্যাপী বন। লোকে বলে, সদর-বাড়ীতে প্রবেশ করিবার আরও অনেক প্রচ্ছন্ন পথ আছে; কিন্তু বংশীবদন ও তাহার কয়েকজন অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য ব্যতীত আর কেহই সে পথের সংবাদ জানে না।

মন্দাকিনী সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে সরোবর হইতে প্রত্যাগতা হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তাহার একটি নির্দ্ধারিত কক্ষ ছিল, সে যথা-স্থানে বারিপূর্ণ মৃৎকলস রক্ষা করিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার পর সিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিল; পরে একখানি ক্ষুদ্র মুকুর বাহির করিয়া একবার আপনার মুখ দেখিল; তাহার পর কালব্যাজ না করিয়া ননদিনীগণের নিকটে কার্য্যের আদেশ শুনিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল; কিন্তু তাহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না। সম্মুখে এক গোয়ালিনী আসিয়া তাহার পথরোধ করিল। গোয়ালিনী যৌবনের

শেষ সীমা অতিক্রম করিয়াছে। যখন তাহার দিনকাল ছিল, তখন অকাতর দাতার ন্যায় সে আপনার যৌবন লুটাইয়াছে। এখন সে ভিক্ষুক। সুতরাং তাহার কাছে আর কেহ ভিক্ষা চাহে না; সে নিজেও পরের নিকট ভিক্ষা চাহিলে আর পায় না। তাহাকে দর্শনমাত্র মন্দাকিনী বলিল, "সুন্দরী যে! কি মনে করিয়া?"

সুন্দরী গোয়ালিনী বলিল, "একটা বিশেষ কথা বলিতে আসিয়াছি, তোমার ঘরে চল।"

মন্দাকিনী বলিল, "অনেকক্ষণ দেরি হইয়াছে, ঠাকুরঝিরা হয় তো রাগ করিতেছেন। এখনই কত কথা শুনিতে হইবে। তোমার কথা আর এক সময় শুনিব।"

সুন্দরী বলিল, "আমার কথা আগেই শুনিতে হইবে। তোমার অদৃষ্টে যাহা থাকে, থাকুক, আমার ব্যবস্থা আগে না করিলে সর্ব্বনাশ হইবে।"

মন্দাকিনী বলিল, "তবে চল।"

তখন মন্দাকিনী ও সুন্দরী পূর্ব্ব-কথিত ঘরে প্রবেশ করিল। সুন্দরী বলিল, "আজ ব্রাহ্মণ-কন্যার ধর্ম্ম যাইবে; তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

মন্দাকিনী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল, "কাহার ধর্ম্ম যাইবে? আর আমিই বা কিরূপে রক্ষা করিব?"

সুন্দরী বলিল, "তুমি মনে করিলে রক্ষা করিতে পারিবে বুঝিয়াই তোমার কাছে আসিয়াছি। ও পাড়ার চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিধবা কন্যা [illegible]দিন হইল শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে। কিন্তু আজ তার সর্ব্ব-

নাশ উপস্থিত। এ সম্বন্ধে তুমি মনোযোগী না হইলে আর কোন উপায় নাই।"

মন্দাকিনী বলিল, "সতী স্ত্রীর ধর্ম্মনাশ হইবে! বড়ই ভয়ানক কথা। তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। কি করিলে আমার দ্বারা উপকার হইতে পারে, বলিয়া দেও; আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব।"

সুন্দরী বলিল, "তোমার স্বামী কল্য তাহাকে দেখিয়াছেন, দেখিয়া অবধি তাহার জন্য পাগল হইয়াছেন। পুরুষ পাগল করিবার মতই সে বটে; কিন্তু বড়ই সতী, বড়ই ধর্ম্মশীলা।"

মন্দাকিনী বলিল, "তিনি পাগল হইয়াছেন। কি দুঃখে তিনি পাগল হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। ঘরে তাঁহার তিন স্ত্রী, তা ছাড়া পথে ঘাটে তাঁহার উপস্ত্রী বোধ হয়, পায়ে পায়ে ঠেকে। ইহাতেও ব্রাহ্মণ-কন্যার উপর কু-নজরে চাহিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় কেন?"

সুন্দরী বলিল, "এ কথার উত্তর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও। আপাততঃ সেই সতীকে রক্ষা করিবার উপায় তোমায় করিতেই হইবে। আমি জ্ঞানোদয় হইতে এই পাপে পাপী; নিজের দিন ফুরাইয়াছে, এখন পরের জন্য পাপের পথ পরিষ্কার করিয়া দিই। কাজেই এ বিষয়ে আমার মনে কখনই কোন সঙ্কোচ নাই। কিন্তু এই বিধবার ভাব দেখিয়া, ইহার কান্না, দুঃখের কথা শুনিয়া আমিও বুঝিয়াছি, এ কাজ বন্ধ করিতে পারিলেই মঙ্গল হইবে। আমার দ্বারা কোন উপায় হইতে পারে না। তুমি এখন কর্ত্তার নূতন স্ত্রী, তুমি রূপসী, নবযুবতী, তোমার কথায় একটা পথ হইলেও হইতে পারে; তাই বুঝিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি।"

মন্দাকিনী বলিল, "আসিয়া ভাল করিয়াছ কি না, জানি না। স্বামীর উৎকট পাপের সংবাদ শুনাইয়া আমাকে কেবল মনঃ-পীড়া দেওয়া হইল। ফল কিছু আমার দ্বারা হইবে কি না, বলিতে পারি না। তাঁহার সহিত আমার মাসে চারি দিন সাক্ষাৎ হয় কি না সন্দেহ। তাঁহাকে কোন কথা বলিবার অধিকার আমার নাই। তিনি দয়া করিয়া যে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তর দিতেও আমার সাহস হয় না। তথাপি যদি সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিব। যেমন করিয়া পারি, তাঁহাকে এ বিষয়ে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিব।"

সুন্দরী বলিল, "তুমি চেষ্টা করিলেই ফল হইবে। এ কার্য্যে ভগবান্ তোমার উপর তুষ্ট হইবেন, যাহাতে তাঁহার সহিত তোমার আজি সাক্ষাৎ ঘটে, তাহার উপায় আমি করিয়া দিব।"

সুন্দরী প্রস্থান করিল, মন্দাকিনী মনে মনে অনেক চিন্তা করিতে লাগিল। স্বামীর ভালবাসা কি, তাহা মন্দাকিনী জানে না। স্বামীকে ভক্তি করিতে হয়, দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিতে হয়, তাঁহার আদেশে অসাধ্য কর্ম্মও সম্পন্ন করিতে হয়, তাঁহার বাসনায় জীবন দিতে হয়, তিনি মরিলে তাঁহার সহিত সহমরণে যাইতে হয়, তাঁহার সংসার-রক্ষার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে হয়, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সকলেরই পরিচর্য্যা করিতে হয়, ইহাই মন্দাকিনীর বিশ্বাস।

তখন নাটক-নভেল ছিল না; প্রেমের পবিত্রতা ও উচ্চতার কথা মন্দাকিনী শুনে নাই। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি অনে-কের কথা সে শুনিয়াছে। কিন্তু তাহার কোন স্থানেই বর্ত্তমান-কাল

প্রচলিত প্রণয়-নীতির কথা সে শিখিতে পায় নাই। আমি যতটুকু দিব, প্রণয়ীর নিকট হইতে ওজন করিয়া তাহার কম লইব না, বেশী হইলে চুপ করিয়া থাকিব, এই যে প্রেমমন্ত্র এখন দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং যে সকল মধুর সম্ভাষণ ও গীতি এখন প্রণয়ীর অত্যুচ্চতার পরিচায়করূপে পরিগণিত হইয়াছে, সে তাহার কিছুই জানিত না। সে বড় জোর বংশীকে কখন বা 'কর্ত্তা,' কখন বা 'হাঁগা' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিত। স্বামীর অদর্শনে বিরহ-বিধুরা হইয়া সে বাপীতটে গিয়া ঊর্দ্ধমুখে আকাশপানে চাহিয়া থাকিতে জানিত না। তাহার প্রকৃতি এইরূপ।

যাহা হউক, মন্দাকিনী সুন্দরী গোয়ালিনীকে আশ্বাসবাক্যে বিদায় করিয়া ত্রস্তপদে আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সে দিন মন্দাকিনীকে ননদিনীগণের ও সপত্নীগণের নিকট অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল। কাজের জন্য বা সাংসারিক কোন না কোন ব্যাপারের জন্য অকারণে তাহার মস্তকে অনেক অপমানের স্রোত বহিয়া যাইত। কিরূপে অকাতরভাবে তাহা সহ্য করিতে হয়, মন্দাকিনী তাহা জানিত। সে কাহারও কথায় প্রতিবাদ না করিয়া, সকলের আজ্ঞা পালন করিয়া এবং সকলকে সাধ্যমত সন্তুষ্ট করিয়া কাল কাটাইতে শিখিয়াছিল, নিত্য যেরূপ বাক্যবাণ তাহাকে বুক পাতিয়া সহিতে হইত, আজি তাহা অপেক্ষা এক নূতন অস্ত্র তাহার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইল। তাহার খোঁপা একটু স্থানভ্রষ্ট হয় নাই এবং একটু বিশৃঙ্খল হয় নাই। ললাটের উর্দ্ধে কবরী পর্য্যন্ত তাহার চুলে পেটো-পাড়া ছিল, পেটোপাড়া ব্যাপারটা এখন উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু যে কালের কথা বলা হইতেছে, তখন সীমন্তিনীগণ অতিযত্নে পরম শোভার কার্য্য বলিয়া চুলের পেটো পাড়িতেন। এ স্থানে আসিবার পূর্ব্বে মন্দাকিনী একবার দর্পণে মুখ দেখিয়াছিল, এবং স্থানভ্রষ্ট কেশগুলাকে আবার পূর্ব্ববৎ বিন্যস্ত করিয়াছিল, ইহাই তাহার প্রধান অপরাধ। তাহার পর তাহার দ্বিতীয় অপরাধ, সে সুন্দরী গোয়ালিনীর সহিত নির্জ্জনে কথা কহিয়াছিল। এই দুই অপরাধের সম্মিলনে এক গুরুতর অপরাধের উদ্ভব হইল। ননদিনী ও সপত্নীগণ একযোগে স্থির করিলেন

যে, মন্দাকিনী কুলে কালি দিতে বসিয়াছে আর বংশীবদনের সম্মানিত নাম ডুবাইতে উদ্যত হইয়াছে ; যে নারী সতত সযত্নে আপনার বেশ-বিন্যাস করে, এবং যে নারী সতত সুযোগ পাইলে নির্জ্জনে দুশ্চরিত্রা প্রৌঢ়ার সহিত আলাপ করে, সে চরিত্রহীনা।

কোন দিনের কোন তিরস্কার মন্দাকিনীর অন্তরকে ব্যথিত করে নাই ; কিন্তু আজিকার এই অমূলক অপবাদ তাহার চিত্তকে মথিত করিল। যে ধর্ম্ম নারী-জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ এবং অবশ্যপালনীয় ব্রত বলিয়া মন্দাকিনী বিশ্বাস করে, তাহার বিরুদ্ধে এরূপ অকারণ ভিত্তিহীন কলঙ্কারোপ শ্রবণে সে অতিশয় ব্যথিত হইল ; কিন্তু সে ইহার কোনই প্রতিবাদ করিল না ; মিথ্যাকথা ও বালির বাঁধ কখনই টিকে না মনে করিয়া সে নীরব রহিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া শত্রুগণের ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল ; জ্যেষ্ঠা ননদিনী বলিলেন, "তখনই দাদাকে বলিয়াছিলাম, এত সুন্দরী বউ ঘরে আনিও না !"

দ্বিতীয়া ননদিনীর নাম সুভদ্রা ; সে নিঃসন্তান, বালবিধবা। মন্দাকিনীর উপর বাটীর সকলেরই অল্পাধিক হিংসা ছিল ; কিন্তু এই সুভদ্রা এবং বংশী-বদনের দ্বিতীয়া পত্নী মেজ-বউ এই দুই জনই বোধ হয় মন্দাকিনীর ভয়ানক শত্রু। অন্য সকলের সহিত এ আখ্যানের বিশেষ সম্বন্ধ নাই ; কিন্তু মেজ-বউ ও সুভদ্রা বারংবার আমাদের সমক্ষে দেখা দিবে।

দ্বিতীয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "সুন্দরী হউক, আর ভিজা বিড়ালের মত চুপ করিয়াই থাকুক, দাদাকে বুঝি এখনও চিনিতে পারে নাই। দাদা যে ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে, মাথা কাটিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিবেন, তাহা বুঝি এখনও জানে না ?"

তৃতীয়া বলিল, "এ কথা চাপা থাকিবে না। আমাদের দোষের ভাগী হইয়া কাজ নাই ; ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িবে।"

জ্যেষ্ঠা সপত্নীর অনেক সন্তান। বংশীবদনের দ্বিতীয়া স্ত্রী বন্ধ্যা। মন্দাকিনীর এখনও সন্তানাদি হয় নাই। এই জ্যেষ্ঠা আপনার সন্তানাদি লইয়া সর্ব্বদা বড়ই বিব্রত থাকিত ; সুতরাং সাংসারিক সকল বিষয়ে মিশিতে সে সময় পাইত না। আজি কিন্তু সে এ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল ;—বলিল, "সুন্দরী বলিতেছ কি দেখিয়া, তাহা তো বুঝিতেছি না। তোমাদের মত সুন্দরী এ অঞ্চলে আর কেহ কখন দেখে নাই। তোমাদের দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু কখন একটা নিন্দার কথা মুখে আনিতে কৈ কাহারও তো সাহস হইল না ?"

মেজ-বউ বলিল, "আমরাও তো এখন বুড়ী হই নাই। কিন্তু এমন করিয়া চুল সাজাইয়া রঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া কখন দিন কাটাই নাই। আর কুলোকের সহিত কথা কহা দূরে থাকুক, কখন তাহাদের ছায়াও মাড়াই নাই।"

সকল কথাই মন্দাকিনী শুনিল। "ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে" এই কথার সার্থকতা সে বেশ বুঝিল। যাহার অন্তরে পাপ না থাকে, সে কোন ভয়েই ভীত হয় না ; মাথা যাইবে শুনিয়াও মন্দাকিনী ভয় পাইল না। কারণ, তাহার হৃদয় সম্পূর্ণ নির্ম্মল। সে অবিকৃত-চিত্তে প্রাণের বেদনা প্রাণে লুকাইয়া উপস্থিত গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিল। সকলের আহারাদি শেষ হইল, সে সপত্নীগণের সহিত আহার করিল। বিদ্রূপ-বাণ তাহার উপর তখনও পড়িতে থাকিল। হাসিতে হাসিতে সকল কথা উড়াইয়া দিয়া মন্দাকিনী আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

বংশীবদন প্রতি রাত্রিতে বাটীর মধ্যে আহার করে না। কোন কোন দিন তাহার আহার্য্য বাহির-বাটীতে রাখিয়া আসিতে হয়, কোন কোন দিন তাহার খাদ্য তাহার কোন পত্নীবিশেষের ঘরে রক্ষিত হয়, কোন কোন দিন সে কোথায় আহার করে, তাহার কোন স্থিরতা থাকে না। অদ্য সে বাহিরে আহার করিবে সংবাদ দিয়াছিল এবং বাটীর কোন খাদ্য পাঠাই-বার প্রয়োজন নাই বলিয়াছিল, সুতরাং তাহার প্রতীক্ষায় সংসারের কোন লোকেরই অপেক্ষা করিতে হইল না।

মন্দাকিনী আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া শত্রুগণের দুর্ব্ব্যবহারের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। চরিত্রে এরূপ ভয়ানক কলঙ্কের আরোপ যাহারা করিতে পারে, তাহাদের অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই। যদি তাহারা গোপনে মন্দাকিনীকে হত্যা করিত অথবা কোন মন্ত্রণাবলে মন্দাকিনীর রূপ-যৌবন কাড়িয়া লইত অথবা মন্দাকিনীকে পথের ভিখারিণী করিয়া তাড়াইয়া দিত, তাহা হইলেও দুঃখের কোন কারণ ছিল না। ভাবিতে ভাবিতে মন্দাকিনীর অনেক দুঃখের কথা মনে পড়িল; পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতির কথা তাহার স্মরণ হইল। শৈশবে সেই সকল আত্মীয়ের সংসর্গে যখন বনের বিহঙ্গিনীর ন্যায় মন্দাকিনী হাসিয়া হাসিয়া উড়িয়া বেড়াইত, তখনকার কথা মনে পড়িল; যখন সরলতা তাহাকে দেবতার মত প্রসন্নতা-মণ্ডিত করিয়া রাখিত, তখনকার সুখের কথা মনে পড়িল; যখন সকলেই অক-পট ভাবে তাহার সৌভাগ্যের কামনা করিত এবং প্রীতিপূর্ণ সদয় ব্যবহারে তাহাকে নিত্যানন্দ-পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিত, তখনকার দিন মনে পড়িল। আর এখন সে সুবর্ণ-পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী। এখন সে দেশবিখ্যাত প্রতাপ-

শালী পুরুষের পত্নী; কিন্তু তাহার সুখ কোথায়? চারিদিকে তাহার প্রবল শত্রু। অনেকেই তাহার সর্ব্বনাশের নিমিত্ত চক্রান্তকারী। নানা কথা মন্দাকিনীর মনে হইল। যাহারা এই মিথ্যা কুৎসা রটাইতেছে, মন্দাকিনী সভয়ে তাহাদের চরিত্রে অতি ঘৃণাজনক অনেক দোষের কথা স্মরণ করিল। শিহরিয়া ভাবিল, লোকে জানুক না জানুক, ভয়ে কেহ বলুক না বলুক, আমি অনেক জানি। ছি! ছি! আজি তাহাদের মুখে আমার নিন্দা! আমাকে সাবধান করিবার জন্য, শাসন করিবার জন্য তাহাদের এই চেষ্টা! কল্পনাতেও যে পাপ মনে আসে না, অপরে যে পাপ করিতেছে শুনিলে সে শিহরিয়া উঠে, যাহা নারী-জীবনের একমাত্র পরমধন বলিয়া সে জ্ঞান করে, তাহারই বিরুদ্ধে সেই পাপের কালিমা প্রলিপ্ত হইতেছে। সেই পাপে কলঙ্কিত বলিয়া তাহার সর্ব্বনাশ-সংসাধনের ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে। এ দুঃখের কথা সে কাহাকে জানাইবে? এ সংসারে কোন্ আত্মীয় সহানুভূতির সুধা-প্রয়োগে তাহার অবসন্ন হৃদয়কে শান্ত করিবে? ভাবিতে ভাবিতে মন্দাকিনী কাঁদিয়া ফেলিল। একাকিনী বলিয়াই সে কাঁদিতে সাহস করিল, তাহার এই ক্রন্দন আর কেহ জানিতে পারিলে হয় তো বিপদের মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া যাইত। অধোমুখে উপাধানে মুখ লুকাইয়া মন্দাকিনী অনেকক্ষণ রোদন করিল।

তাহার কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল না। পত্নীত্রয়ের কক্ষদ্বার চাপিয়া রাখাই ব্যবস্থা ছিল। বংশীবদন ইচ্ছা করিলে যে কোন পত্নীর কক্ষে আসিতে পারে, এই জন্য সকলকেই মুক্তদ্বার কক্ষে রাত্রিযাপন করিতে হইত। বালিকা যখন অধোমুখে রোদন করিতেছে, তখন নিঃশব্দে তাহার

কক্ষদ্বার খুলিয়া গেল এবং এক কৃষ্ণকায় পুরুষ সেই দ্বার দিয়া মৃদুপাদ-বিক্ষেপে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; সেই পুরুষ বংশীবদন। বংশীবদন পত্নীর শয্যা-সন্নিধানে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া লাবণ্যময়ী মন্দাকিনীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল। তাহার বোধ হইল, মন্দাকিনী পরমাসুন্দরী, এ বোধ যে তাহার আজি নূতন হইয়াছে, এরূপ নহে। সে জানে ও বিশ্বাস করে যে, মন্দাকিনীর ন্যায় সুন্দরী এ দেশে আর নাই। তথাপি সেই পাষণ্ড কেন যে নিত্য নূতন নূতন নারী অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত থাকে, অথবা কেন যে সে প্রভূত অত্যাচার করিয়া কুলকামিনীর সর্ব্বনাশ সংঘটিত করে, ইহার উত্তর মানব-হৃদয়জ্ঞ দার্শনিকগণ কি স্থির করিয়াছেন, আমরা জানি না; কিন্তু ইহা আমরা বলিতে পারি যে, যাহারা বাল্যকাল হইতে চরিত্র-সংযম শিক্ষা করে নাই, যাহারা নূতনত্বের উপভোগই পরম সুখ বলিয়া বুঝিয়াছে, যাহারা আত্মসুখের মন্দিরে সকলের সকল বাসনা পদদলিত করিতে অভ্যাস করিয়াছে এবং যাহারা ধর্ম্ম ও নীতি কেবল অমূলক সমাজ-শাসন বলিয়া বুঝিয়াছে, সেই স্বার্থপর কামান্ধগণ এইরূপে বাসনা-বায়ু দ্বারা শুষ্কপত্রের ন্যায় অনবরত পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহারা ভালবাসিতে জানে না, প্রেমের কোন সন্ধানই রাখে না, পবিত্র সংসর্গের উপাদেয়তা অনুভব করে না, কেবল ভোগ-মাত্রই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য। এইরূপ হতভাগ্যগণ মনুষ্য-নামের কলঙ্ক, এইরূপ দুরাচারীরা পশুরই রূপান্তর।

অনেকক্ষণ সুন্দরী পত্নীর শোভা-সন্দর্শনে বংশীবদন বিমোহিত হইল। ভালবাসার বন্ধন থাকিলে কুৎসিতা প্রণয়িনীও শোভাময়ী বলিয়া অনুমিত হয়; প্রেমের সম্বন্ধ থাকিলে দৈহিক হীনতা বা সৌন্দর্য্যের অভাব

গণনায় আইসে না; কিন্তু ভোগানুরক্ত বংশীবদন সে ভাবে পত্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না। শোভাময়ী নারীমাত্রকেই সে যে ভাবে দর্শন করে, মন্দাকিনীকেও সেই ভাবে দর্শন করিল। ধীরে ধীরে সে মন্দাকিনীর অনাবৃত পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করিল। মন্দাকিনী চমকিতা হইয়া উঠিয়া বসিল। বংশীবদন বলিল, "তুমি আজি সুন্দরীকে দিয়া আমাকে ডাকাইয়াছ, আজি আমি একটা গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত আছি, তাহা ফেলিয়া আসিয়াছি, এখনই আবার যাইতে হইবে। তোমার যে শোভা দেখিতেছি, তাহা ছাড়িয়া যে শীঘ্র যাইতে পারিব, তাহা বোধ করি না।"

মন্দাকিনী বড়ই লজ্জাশীলা। অধিকন্তু স্বামীর সমক্ষে সে অতিশয় ভীতা। সুতরাং স্বামীর মধুর-বাক্যের কোন উত্তর দিতে পারিল না; আপনার বিশৃঙ্খল বসন সুবিন্যস্ত করিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল। বংশী-বদন শয্যায় বসিল এবং বাহু দ্বারা মন্দাকিনীকে বেষ্টন করিয়া তাহার বদন-চুম্বন করিল। তখন বংশীবদন দেখিতে পাইল, মন্দাকিনীর চক্ষু রক্তবর্ণ এবং এখনও নয়ন অশ্রুচিহ্ন-সংযুক্ত। সে সাগ্রহে বলিল, "তুমি কাঁদিতে-ছিলে মন্দাকিনি? কেন কাঁদিতেছিলে? কি দুঃখ হইয়াছে, বল? আমি এখনই তাহার প্রতীকার করিব।"

মন্দাকিনী বলিল, "কৈ, না; তুমি দয়া করিয়া দেখা দিয়াছ, দুঃখ কেন হইবে?"

বংশীবদন জিজ্ঞাসিল, "তবে কি আমাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাও না বলিয়া তুমি কাঁদিতেছিলে? আমার অনেক কাজ; পোড়া কাজের জ্বালায় তোমার ন্যায় রূপসী পত্নীর নিকট প্রতিদিন আসিতে পারি না। এ জন্য কোন অভিমান করা উচিত নহে।"

মন্দাকিনী বলিল, "আমি সে জন্য কোন অভিমান কাঁদ-তেছি না।"

বংশীবদন বলিল, "তবে কি মন্দাকিনি, কেহ কি তোমাকে কোন মন্দ কথা বলিয়াছে? কি দুঃখে তুমি কাঁদিতেছিলে?"

মন্দাকিনী বলিল, "কেহ সহস্র মন্দ বলিলেও আমার দুঃখ হয় না। তবে আমি কাঁদিব কেন?"

তখন বংশীবদন জিজ্ঞাসিল, "আমাকে ডাকিয়াছিলে কেন? বিশেষ কোন কথা আছে কি?"

মন্দাকিনী বুঝিল, সুন্দরী কৌশল করিয়া স্বামীকে এখানে পাঠায় নাই। স্বামীর উপর সে আসিবার নিমিত্ত হুকুম জারি করিয়াছে। মন্দাকিনীর বড় লজ্জা হইল;—বলিল, "আমি ডাকিয়া পাঠাই নাই। সে সাহস আমার হয় না। একটা কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল, তাই হয় তো সুন্দরী তোমাকে আসিতে বলিয়াছে।"

বংশীবদন বলিল, "বেশ করিয়াছে। এ জন্য সুন্দরী বক্‌সিস পাইবে। কি কথা বলিবে, শীঘ্র বল?"

বড়ই ভয়ানক! স্বামীর দুশ্চরিত্রতার কথা, সে জন্য তাঁহাকে সাবধান হইবার উপদেশ দিতে বা অনুরোধ করিতে মন্দাকিনী সাহস করিতে পারে কি? সে নীরবে মস্তক আর একটু নত করিল। বংশীবদন আবার তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বদন-চুম্বন করিল এবং বলিল, "বল মন্দাকিনি, কি করিতে হইবে? তোমার বাসনা পূরণ করিতে আমি সতত প্রস্তুত। এখন যদি বলিতে সঙ্কোচ হয়, তবে না হয়, পরে বলিও। আমি আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

মনের কথা এখনই না বলিলে নয়, স্বামীর আদরে, মিষ্টকথায় ও আশ্বাসে ভীতা মন্দাকিনীর সাহস একটু বাড়িল, তথাপি বড় ভয়। বংশী-বদন দুর্দ্দান্ত লোক; ইচ্ছার বিরোধী কোন কথাই সে শুনিতে চাহে না এবং সেরূপ ব্যাপারে যে তাহাকে উপদেশ প্রদান করে, তাহাকে দণ্ডিত হইতে হয়। এ সকল ভাবিয়াও মন্দাকিনী আজি স্বামীকে মনের কথা বলিবে স্থির করিয়াছে। স্বামীর হিতচেষ্টা করাই স্ত্রীর ধর্ম্ম; স্বামীর ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সহায়তা করাই সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য। এইরূপ বুঝিয়া প্রস্তাবিত দারুণ দুষ্কৃতি হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মন্দাকিনী কৃতসঙ্কল্পা।

অনেকক্ষণ পত্নীকে নীরব দেখিয়া বংশীবদন আবার জিজ্ঞাসিল, "কেন বলিতেছ না মন্দাকিনি? আমি তোমার স্বামী, আমার নিকট মনের কথা অকপটে বলাই তোমার ধর্ম্ম। তবে না হয়, এখন থাকুক, পরে বলিও।"

এবার মন্দাকিনী বলিল, "আমার ভয় হইতেছে। আমি নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক; ভাল মন্দ কিছুই বুঝি না, তুমি যদি দয়া করিয়া আমার কথায় দোষ গ্রহণ না কর, তবে আমি একটা কথা সাহস করিয়া এখনই বলি।"

বংশীবদন আদর করিয়া পত্নীকে বড়ই অভয় দিল। সেই আদরই মন্দা-কিনীর কাল হইল। তখন মধুরস্বরে মন্দাকিনী বলিল, "দাসী কখন তোমার কোন কার্য্যের কথা বলে নাই; আজি তুমি একটা ভয়ানক কার্য্য করিবে শুনিয়াছি। বড় ভয়ে ভয়ে তাহারই একটা কথা তোমাকে বলিতেছি।"

বংশীবদনের ললাট কুঞ্চিত হইয়া আসিল এবং ক্রোধও যেন তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল। তথাপি সে বলিল, "বল।"

তখন মন্দাকিনী বলিল, "শুনিতেছি, তুমি এক বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার আজ সর্ব্বনাশ করিবে।"

বংশীবদন ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "করিব। তাহাতে তোমার কি?"

ভয়ে মন্দাকিনীর প্রাণ উড়িয়া গেল। সে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল, "আমার কিছু নহে, তোমার পাপ হইবে।"

বংশীবদন উঠিয়া দাঁড়াইল; কর্কশস্বরে বলিল, "আমার পাপ পুণ্যের বিচারক তুমি না কি? তোমার কথা শুনিয়া এখন হইতে আমাকে কাজ করিতে হইবে না কি?"

মন্দাকিনী কাতরভাবে বলিল, "না না, তুমি প্রভু, আমি দাসী। তোমার কথাই আমি শুনিব। তুমি রাগ করিও না।"

তখন মন্দাকিনী কম্পিত-কলেবরে উঠিয়া স্বামীর চরণ ধারণ করিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "অধর্ম্ম করিও না; ব্রাহ্মণীর দেহ স্পর্শ করিও না; সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিও না।"

কুপিত বংশীবদন বলিল, "এই উপদেশ দিবার জন্য তুমি আমাকে ডাকিয়াছিলে? হয় তো আমি ব্রাহ্মণীর সর্ব্বনাশ করিতে ক্ষান্ত হইতাম, কিন্তু আর হইব না। এই সাহসের জন্য তোমাকে অনেক শাস্তি পাইতে হইবে।"

পূর্ব্ববৎ কাঁদিতে কাঁদিতে মন্দাকিনী বলিল, "আমার যত শাস্তি হউক, ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি কখনই এই পাপ করিতে পাইবে না। তুমি ইহাতে সম্মত না হইলে, তোমার দাসী কখনই চরণ ছাড়িবে না।"

তখন বংশীবদন জোরে সুন্দরীর বাহুবন্ধন হইতে আপনার চরণ মুক্ত করিল এবং তাহার বদনে পদাঘাত করিয়া বলিল, "শাস্তির এই আরম্ভ

হইল, দুর্গতি আরও হইবে। অপেক্ষা করিয়া থাক্; আর কিছুকাল পরেই সেই ব্রাহ্মণী উপপত্নীকে তোর সম্মুখে আনিয়া রঙ্গরস করিব। তাহার পর কাল প্রাতে এই বাটী হইতে তোকে দূর করিয়া দিব।"

বেগে বংশীবদন প্রস্থান করিল। মন্দাকিনী সেই ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া অধোমুখে রোদন করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বামী প্রস্থান করিলে মন্দাকিনী চিন্তা করিতে লাগিল, 'কিছুই হইল না। যে মহাপাপ নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না, বাড়ার ভাগ হয় তো তাঁহাকে রাগাইয়া দিলাম, হয় তো তিনি নিরস্ত থাকিলেও থাকিতে পারিতেন; কিন্তু আমার উপর রাগ করিয়া তিনি আর নিরস্ত থাকিবেন না। এখন কি আর কোন উপায় হইতে পারে না? ব্রাহ্মণীর সর্ব্বনাশের নিমিত্ত ধর্ম্মের দ্বারে আমারও অপরাধ হইল।' স্বামিকৃত পদাঘাত বা তিরস্কারের কথা মন্দাকিনীর মনে পড়িল না, স্বামী কোন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়াও সে বুঝিল না, তাহার ন্যায় সামান্যা দাসীর স্বামীকে উপদেশ প্রদান করা অন্যায় হইয়াছে, এ অন্যায়ের জন্য যদি স্বামী তাহাকে দণ্ড দিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার দোষ কিছুই হয় নাই।

মন্দাকিনী মনে করিল, 'দোষ করিলাম, অতি সাহসে স্বামীকে কর্ত্তব্য-পথ দেখাইতে চেষ্টা করিলাম, ফল কিছুই হইল না। সত্যই কি তবে এখনই ব্রাহ্মণ-কন্যার সর্ব্বনাশ হইবে? এতক্ষণে বৈঠকখানায় সেই মহাপাপের সূত্রপাত হইতেছে কি? কি করিব? আমার ন্যায় সামান্যা স্ত্রীলোক কোন্ উপায়ে এ দুষ্কার্য্য বন্ধ করিতে পারে? আর উপায় নাই, এখন ভগবান্ রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই।' তখন মন্দাকিনী উঠিয়া বসিল এবং ঊর্দ্ধে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া করযোড়ে শ্রীহরির চরণে অপরিচিতা ব্রাহ্মণ-কন্যার ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।

সেই সময় উন্মুক্তদ্বার দিয়া দুইটি নারী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; একজন মন্দাকিনীর ননদিনী এবং অপরা দ্বিতীয়া সপত্নী। উভয়েই সন্তান-বিহীনা, সুতরাং উভয়েই অনেকক্ষণ পরের ক্লেশে অনায়াসে রঙ্গ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

যখন বংশীবদন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন এই দুই নারী নিঃশব্দে বাহিরে দাঁড়াইয়া, আজি মন্দাকিনীর সৌভাগ্য-উদয়ের অভিনয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎকর্ণভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। হিংসায় উভয়েরই প্রাণ জর্জ্জরিত হইতেছিল। একজনের হিংসার কারণ অনু-মেয়; কিন্তু ননদিনীর হিংসার কারণ কিছুই ছিল না; তথাপি তাহার হৃদয়ে সপত্নীর অপেক্ষা হিংসার পরিমাণ কম ছিল না। কেন এরূপ হইয়া ছিল, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। কোন কোন মনুষ্য পরের অভ্যুদয় দেখিলে বিনা কারণে আপনি ফাটিয়া মরে। মন্দাকিনীর যে যে শত্রু যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারাও সমস্ত ব্যাপার জানিবার নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহান্বিত ছিলেন। পদাঘাত পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার, বংশীবদন প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগের গোচর করা হইয়াছে। যখন প্রেমলীলা ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইল এবং ক্রোধ যখন মন্দাকিনীর ঘোরতর অপমান করিয়া ক্ষান্ত হইল, তখন অন্তরালে অবস্থিতা নারী-দ্বয়ের আহ্লাদের সীমা থাকিল না। তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই আনন্দ-বার্ত্তা অনেককে জানাইল; কিন্তু এই পর্য্যন্ত করিয়াই তাহাদের মনের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইল না। সেই অপমানিতা সুন্দরীর সহিত এই উপলক্ষে একটুকু তামাসা না করিয়া তাহারা থাকিতে পারিল না। কাটা হই-য়াছে, একটু নুণের ছিটা সেই ক্ষতস্থানে না দিলে চলে কি? যে যন্ত্র-

পায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তাহাকে আর দুইটা খোঁচা না মারিয়া থাকা যায় কি?

ননদিনী বলিল, "তা তোর যে সকলি বাড়াবাড়ি ছোট বউ! স্বামী কোথায় কি করে না করে, তার সন্ধানে তোর কাজ কি?"

মেজ-বউ বলিল, "কেবল সন্ধান করা ত নয়, এ জন্য আবার রাজার মত স্বামীকে শাসন!—বাড়াবাড়ি বেজায় হইয়াছে;—আমরাও সুন্দরী বলিয়া পরিচিতা, আমাদেরও বয়েস, দিন এখনও যায় নাই, কিন্তু স্বামীকে শাসন করিতে কখনও আমাদের সাহস হয় নাই ত!"

সুভদ্রা বলিল, "ছোট বউয়ের দুঃখ দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব, বুঝিতে পারি না! বলে কি না, ব্রাহ্মণ-কন্যার সর্ব্বনাশ করিতে পাইবে না। ও মা, কি বুকের পাটা! স্বামী দেশমান্য ব্যক্তি, সে কি তোমার চরণে ছুঁচা হইয়া বসিয়া থাকিবে?"

মেজ-বউ বলিল, "কত লোকের কত সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, আমরা চখের উপর কত জনের কত হাহাকার, কত কাণ্ড দেখিলাম, কখনও সে জন্য একটা কথা কহিতে আমাদের সাহস হয় নাই। আজি উনি রূপসী—নূতন গৃহিণী! কাজেই স্বামীকে বশ করিতে বড় সাধ! সাধ এখন মিটিয়াছে? মুখের মত লাথি পাইয়াছ।"

উভয়ের এইরূপ অযাচিত সমালোচনা মন্দাকিনী শ্রবণ করিল;—বলিল, "লাথি, তাহাতে কি হইয়াছে? লাথি কি তিনি মারিয়াছেন? মারিয়া থাকিলে দয়াপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার চরণধূলা আমার গায়ে লাগিয়াছে—বড় ভাগ্যের কথা। কিন্তু তোমরা জান কি দিদি

এতক্ষণে ব্রাহ্মণীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে কি না? এ মহাপাপে তাঁহার যে ভয়ানক অকল্যাণ হইবে।”

উভয়েই হাসিয়া উঠিল। ননদিনী বলিল, “সর্ব্বনাশ কি হইবে? প্রথমে কত স্ত্রীলোককে আপত্তি করিতে শুনিলাম, কত পলায়ন করিতে দেখিলাম, কত কান্নার চীৎকার শুনিলাম; কিন্তু শেষ সকলকেই ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে দেখিলাম। যে ব্রাহ্মণীর কথা বলিতেছিস্, যদি তাহার সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলেই সে দাদার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া চরিতার্থ হইবে। এমন কত দেখিলাম!”

সপত্নী বলিল, “আজি নূতন গুরু-ঠাক্রুণ এই সর্ব্বনাশ বন্ধ করিবেন! দেশের যে যুবতী একদিন তাঁহার মনে ধরিয়াছে, তাহাকে কর্ত্তার বিছানায় আসিতে হইয়াছে, কেহ কখনও অব্যাহতি পায় নাই;—কে জানে ব্রাহ্মণ, কে জানে দেবতা। আজ তোমার কথায় নূতন নিয়ম হইবে নাকি? তোমার চাঁদপারা মুখখানা দেখিয়া চিরদিনের অভ্যাস ছাড়িবে না কি?”

মন্দাকিনী বলিল, “এ প্রার্থনা আমি করি না, তিনি শত সুন্দরী লইয়া সমস্ত দিন-কাল কাটান, কখন একবার দাসীর নিকটে না আসেন, তাহাতে দুঃখ নাই; কিন্তু এই ব্রাহ্মণী রক্ষা পাইলেই ভাল হইত। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি কি দুঃখিনীর প্রার্থনা শুনিবেন না?”

সপত্নী বলিল, “ভগবান্ তোমার হাত-ধরা। এমন ধন যখন তোমাদের ঘরে আসিয়াছে ঠাকুরঝি, তখন এ সংসারে সুখের ভরা উথলিয়া উঠিবে!”

বাহিরে যেন একটা চীৎকারধ্বনি উঠিল, বাহির-বাটী অনেক দূর হইলেও রাত্রিকালের শব্দ মন্দাকিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। সে কাঁপিতে

কাঁপিতে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সত্যই বাহিরে তখন ভয়ানক কাণ্ড চলিতেছে। বংশীবদনের সেই বৈঠকখানায় এক গৌরবর্ণা বিধবা ব্রাহ্মণী শয্যার উপর পড়িয়া কাতরভাবে রোদন করিতেছেন। ব্রাহ্মণীর বয়স অনুমান বিংশতিবর্ষ। সেই ব্রাহ্মণীকে বংশীবদনের দুর্ব্বৃত্ত অনুচরেরা কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ধরিয়া আনিয়াছে, এবং বৈঠকখানার শয্যার উপর রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছে। সুন্দরী অচৈতন্য ছিলেন। চেতনাগমে সম্মুখে বংশীবদনকে দেখিয়া তিনি বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই চীৎকার-শব্দ মন্দাকিনীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণীর চীৎকার ও আর্ত্তনাদে বংশীবদন অতিশয় বিরক্ত হইল;— বলিল, "বাল্যকালে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলে, বারো চৌদ্দ বৎসর পরে এখানে ফিরিয়াছ; কাজেই আমার সকল কথা তুমি হয় ত জান না। আমি এ বিষয়ে কখনও কোন বাধা মানি না, কাহারও আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমার প্রাণ গলে না। কখনও কোন স্ত্রীলোক আমার বৈঠকখানায় আসিয়া সহজে ফিরিতে পায় না। তুমি যত চীৎকার করিবে, ততই আমি বেশী বিরক্ত হইব। আমাকে অনর্থক বিরক্ত করিলে আরও ভয়ানক ফল হইবে। যে আমাকে জ্বালাতন করে, তাহার শাস্তি বড়ই ভয়ানক হয়। আমি চণ্ডালের দ্বারা তাহার সর্ব্বনাশ করাইয়া থাকি। অতএব যদি তোমার বুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে এখনও সাবধান হও।"

ব্রাহ্মণী উঠিয়া বসিলেন; নয়নের জল মুছিয়া ফেলিলেন; স্রোতস্বিনী-মধ্যগতা লতিকার ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন; অতিশয় ভীতভাবে

বংশীবদনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনি আমাদের দেশের স্ত্রীসকলের সহায়; আপনি যদি আশ্রিত লোকদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে রক্ষার আর উপায় নাই। ধর্ম্ম চণ্ডালের হস্তে যাউক আর ব্রাহ্মণের হস্তেই যাউক, সমান কথা। আপনি সর্ব্বনাশ না করিয়া কোন স্ত্রীলোককে ছাড়েন না, ইহা পৌরুষের কথা নহে। আপনি অনেক দুঃখিনীর ধর্ম্ম হরণ করিতেছেন, কিন্তু একদিন না একদিন দর্পহারী নারায়ণ ইহার বিচার করিবেন, একদিন না একদিন ই সকল পাপের জন্য আপনাকে ছট্‌ফট্‌ করিতে হইবে।"

বংশীবদন চীৎকার করিয়া বলিল, "অনেকের অনেক অভিসম্পাত আমি ভোগ করিয়াছি, তোমার সহিত বাদানুবাদ অনাবশ্যক। আমার বাসনা তোমাকে চরিতার্থ করিতেই হইবে। কেন সুখের সময় বৃথা নষ্ট করিতেছ?"

এই বলিয়া বংশীবদন সেই সুন্দরীর হস্ত ধারণ করিল। কম্পিত-কণ্ঠে সুন্দরী তখন চীৎকার করিয়া বলিলেন, "জগদম্বে! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? পিশাচের করস্পর্শে আমার দেহ অপবিত্র হইল? নারায়ণ! তুমি কি পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছ? তুমি যদি আমাকে রক্ষা না কর, তাহা হইলে দুঃখিনীর আর গতি নাই।"

বংশীবদন বলিল, "তুমি কেন ভুল বকিতেছ? ভগবান্‌কে অনেক ডাকাডাকি এই বৈঠকখানায় হইয়াছে, আমার কথা ছাড়া নারায়ণ আর কাহারও কথা শুনেন না, প্রসন্ন-মনে সুখের ভোগে প্রবৃত্ত হও।"

পাষণ্ড বংশীবদন সুন্দরীকে বাহুপাশে বদ্ধ করিল। সুন্দরী জ্ঞান হারাইলেন। সহসা একটা তুমুল শব্দ হইল। সভয়ে বংশীবদন সুন্দরীকে

ছাড়িয়া শব্দাগমের দিকে চাহিয়া দেখিল। তৎক্ষণাৎ ঘরের একটা বাতায়ন ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেই রন্ধ্রপথ দিয়া এক উচ্চকায় আজানুলম্বিত-বাহু বিশালবক্ষা পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বংশীবদন চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি কোন্ সাহসে আমার জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিলে? আমার রক্ষিগণ কোথায়? এখনি তোমার প্রাণান্ত হইবে।"

আগন্তুক বীর গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "আমার প্রাণান্ত করিতে তোমার ন্যায় শত ব্যক্তির সাধ্য নাই। তোমার রক্ষিগণ সকলেই বন্ধনদশায় পড়িয়াছে; দুই ব্যক্তি আঘাত পাইয়াছে। ধর্ম্মের সাহসে, শ্যামরূপার কৃপায় আমি তোমার জানালা ভাঙ্গিয়াছি। ভবানীর আদেশে, আমি তোমাপেক্ষা বহুগুণে প্রতাপান্বিত লোকের সমক্ষে এইরূপে উপস্থিত হইয়া থাকি। তোমাকে সমুচিত দণ্ড দিবার আদেশ পাইয়াছি; কি দণ্ড দিব, তাহা এখনও স্থির করি নাই। আমি শম্ভুরাম, ভবানীর দাস আর কোন পরিচয় আমার নাই।"

আগন্তুককে চাপিয়া ধরিবার নিমিত্ত বংশীবদন বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়াছিল, এক্ষণে সেই উত্তোলিত বাহু কাঁপিতে কাঁপিতে নত হইল, সে কোন কথা বলিতে পারিল না, কেবল প্রকাণ্ড হাঁ করিল। সে প্রায় সংজ্ঞাশূন্যভাবে শম্ভুরামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শম্ভুরাম বলিলেন, "আমার সময় নাই, তোমাকে বধ করা উচিত, কিন্তু আমি তাহা করিব না। আপাততঃ তোমার পাঁচ সহস্র মুদ্রা অর্থ-দণ্ড হইল। এই টাকা তোমায় এখনই দিতে হইবে, অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তোমার ধনাগার লুণ্ঠন করিতে আদেশ দিব। যেখানে তোমার

ধন থাকে, তাহা আমার অবিদিত নাই,তুমি সাবধান হইয়া কার্য্য করিবে। যেরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইতেছিলে, এইরূপ কার্য্য আর কোন দিন করিলে তদ্দণ্ডেই তোমাকে বধ করিব।"

এতক্ষণে বংশীবদন প্রকৃতিস্থ হইল;—বলিল, "পাঁচ হাজার টাকা এখন আমার তহবিলে উপস্থিত নাই। তিন দিন সময় পাইলে টাকা সংগ্রহ করিয়া আমি আপনার আদেশমত স্থানে পাঠাইয়া দিতে পারিব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তিন দিন সময় দিন।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই, আমার সহিত কথার অন্যথা হইলে কি ফল হইতে পারে, তাহা স্মরণ রাখিবে। আগামী অমাবস্যার দিন রাত্রিকালে দুবরাজপুরের পাহাড়ে পাহাড়েশ্বরীর মন্দির-সন্নিধানে আমার লোক অপেক্ষা করিবে। যদি টাকা লইয়া তুমি বা তোমার লোক সেই দিন সে স্থানে হাজির না হও, তাহা হইলে আবার তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। অদ্য পূর্ণিমা, সুতরাং তুমি পূর্ণ এক পক্ষ সময় পাইলে।"

সংজ্ঞাহীনা সুন্দরী এতক্ষণে চৈতন্য লাভ করিলেন, এবং বলিয়া উঠিলেন, "আমার ধর্ম্ম গিয়াছে, মৃত্যু কেন হয় নাই?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "না, মা! নরাধম তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই, তুমি যেমন দেবী, তেমনই আছ। মা, তোমাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসি। এ দুর্ব্বৃত্তকে বিশ্বাস নাই, আমি শম্ভুরাম, আমাকে ভয় করিও না।"

সুন্দরী সবিস্ময়ে শম্ভুরামের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি দেবতা; আপনার নাম কে না জানে?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "আর কথার সময় নাই। বংশীবদন! আমার বোধ হয়, তোমার সর্ব্বনাশ শিয়রে, তুমি ধর্ম্মশীলা সতী পত্নীকে পদাঘাত করিয়াছ। তোমার পুরমধ্যে ব্যভিচারের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। তুমি নিজে সংসারের পাপস্রোত বৃদ্ধি করিতেছ, আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম; বারান্তরে আমি তোমাকে বিশেষ দণ্ড দিব। অমাবস্যার কথা ভুলিও না।"

আর কোন উত্তর শুনিবার নিমিত্ত শম্ভুরাম অপেক্ষা করিলেন না, ইঙ্গিতে সুন্দরী ব্রাহ্মণ-কন্যাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন, এবং তাঁহাকে পশ্চাতে লইয়া নির্ভীক ও অকাতরভাবে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিবিড় বন। শাল, মহুয়া, পলাশ, খদির, ভেলা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছোট বড় গাছ গায়ে গায়ে মিলিয়া ভয়ানক বনে পরিণত হইয়াছে। কোন কোন গাছ অত্যুচ্চ,কোন কোন গাছ অতি ক্ষুদ্র ; প্রায় দুই ক্রোশ ব্যাপিয়া এই দুর্ভেদ্য অরণ্য বিস্তৃত। কোথাও সন্ধি নাই, এই অরণ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইবার কোন পথ নাই।

যে স্থানে দামোদর ও বরাকর নদের সম্মিলন হইয়াছে, তাহারই প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে পঞ্চকোট পর্ব্বতের পশ্চিমদিকে এই ঘনারণ্য সংস্থিত। এখন যেখানে বরাকর ষ্টেশন হইয়াছে এবং পাথরিয়া কয়লার ব্যবসায়ে যে স্থান সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, সেই স্থান হইতে এই বন প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী। অর্থ ও স্বাস্থ্যের অন্বেষণে তখন নানাদিগ্‌দেশীয় লোক তথায় যাইত না, তখন তথায় লাবণ্যময়ী শ্বেতমহিলা অপরাহ্ণে ট্যাণ্ডাম হাঁকাইতে হাঁকাইতে বায়ুসেবন করিতেন না, তখন মাড়োয়াড়ি-গণ বিবিধ পণ্য-সামগ্রী লইয়া তথায় ফিরিত না, তখন বাঙ্গালী বাবুগণ কোঁচা দুলাইয়া সেখানকার পথে বিচরণ করিতেন না ; তখন সমস্ত পাথরিয়া কয়লার প্রদেশটা প্রায়শঃ মানবের অনধিকৃত ছিল , অধিকাংশ স্থানেই ক্ষুদ্র বা মহৎ জঙ্গল ছিল এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সর্ব্বত্র নির্ভীকভাবে ক্রীড়া করিত।

আমরা পূর্ব্বে যে বনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তখনকার দিনে সে বনের অনুরূপ গহনারণ্য নিকটে আর কেহই দেখে নাই। যে স্থান

হইতে সেই বন ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিয়াছিল, যে স্থানকে সেই বনের সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, একদিন বৈকালে সেই অরণ্যের পশ্চিমসীমায় এক কৃষ্ণকায় যুবক একাকী দণ্ডায়মান। যুবকের পরিধানে একখানি অতি স্থূল বস্ত্র,—কটিদেশ হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বিলম্বিত; আর কোথাও কোনরূপ বস্ত্রাদি নাই, পায়েও জুতা নাই। বস্ত্রাদি দ্বারা দেহ সমাচ্ছাদিত না থাকায় যুবাকে অসভ্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহার এ অসভ্যতা বড়ই শোভার ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে। তাহার বিশাল বক্ষ এবং পেশল কঠিন কলেবর কেবল যে পরম রমণীয় শোভা প্রকাশ করিতেছে, এরূপ নহে, সঙ্গে সঙ্গে যুবার অপরিসীম শক্তিশালিতারও পরিচয় দিতেছে। যুবার ললাট প্রশস্ত, আনন্দপূর্ণ, মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও সর্ব্বপ্রকার ভীতি-বিরহিত। যুবার কটিদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকার অত্যুজ্জ্বল তীক্ষ্ণধার চন্দ্রহাস ঝুলিতেছে, অপর দিকে একখানি প্রকাণ্ড ছুরিকা দোদুল্যমান। যুবকের বামস্কন্ধে এক প্রকাণ্ড ধনুক, হস্তে দুইটি মাত্র তীর. যুবক সেই তীরদ্বয়ের এক প্রান্ত দ্বারা মাটীর উপর রেখাপাত করিতেছে। এইরূপ জনহীন ও শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে যুবক নিতান্ত নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান।

যুবক বঙ্গবাসী। বঙ্গদেশের জনসাধারণের যেরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে, দৈহিক সামর্থ্য ও সাহসিকতার যেরূপ অপচয় হইয়াছে, বিলাসিতা ও উচ্চশিক্ষার অনুরোধে যেরূপ স্বাস্থ্যহানি ও খর্ব্বাকার হইয়া আসিতেছে, তখন এরূপ ছিল না। এক সময়ে যে বঙ্গদেশ বীরের নিবাসভূমি ছিল, ইতিহাস ও কিংবদন্তী তাহার অনেক প্রমাণ সযত্নে আনিয়া দেয়। যে স্থানের কথা আমরা কহিতে বসিয়াছি, তাহার সন্নিহিত প্রদেশ-সমূহের নাম এখনও অনেক অতীত গৌরবের পরিচয় দিতেছে। বীরভূমি, মান-

ভূমি, সিংহভূমি, মল্লভূমি এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রদেশের নাম অতীত গৌরবের পরিচায়ক। এ সকলই বঙ্গদেশ এবং বঙ্গীয় আচারব্যবহার-বিশিষ্ট হিন্দুর আবাসভূমি। কিন্তু হায়! সার্ব্বজনীন অধঃপতনের সহিত এই সকল প্রদেশের বীর-সন্তানেরাও এখন অধঃপতিত হইয়াছে।

আমরা বলিয়াছি, যুবক বাঙ্গালী; কিন্তু এখন সে যুবককে দেখিলে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে কাহারও সাহস হইবে না। সে দীর্ঘাকার, সেরূপ বলদৃপ্ত সমুন্নত শরীর এখন সমস্ত বঙ্গদেশে পর্য্যটন করিয়া কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। যুবক কায়স্থ। মানভূম জেলার গোবিন্দপুর-সন্নিহিত রতনী গ্রাম তাহার নিবাসস্থল। যুবকের নাম রাঘব-চন্দ্র দাস। এখনকার হিসাবে যুবক নিতান্ত মূর্খ; কিন্তু যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, তখনকার হিসাবে যুবা বিশেষ পণ্ডিতরূপে পরিগণিত না হইলেও মূর্খরূপে পরিচিত ছিলেন না। রাঘব বাঙ্গালা লেখাপড়া জানিতেন, মুখে মুখে প্রায় সকল প্রকার অঙ্কই কষিতে পারিতেন, চাণক্য-শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারিতেন। অতি দ্রুত লিখিয়া যাইতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল, নানাপ্রকার দেবদেবীর স্তব-স্তুতি তিনি জানিতেন। ইহাতে তাঁহাকে শিক্ষিতলোক বলিয়া স্বীকার করিতে অনেকেই আপত্তি করিবেন সন্দেহ নাই।

রাঘব অনেকক্ষণ একস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর আপন মনে মনে বলিলেন, "না—এখন যাইব না। গুরু এখন সেখানে নাই, গুরু না থাকিলে রঙ্গিলার নিকটে যাইতে আর সাহস হয় না।"

সহসা একটা দুর্গন্ধ রাঘবের নাসিকায় প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন, নিকটেই কোথায় বাঘ আসিয়াছে। সতর্কভাবে রাঘব একবার

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার বোধ হইল, পার্শ্বের ঘনবনে অদূরে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের শাখা দুলিতেছে। তিনি অনুভব করিলেন, সেই স্থানেই ব্যাঘ্র লুকাইয়া আছে। তখন তিনি একটা হুঙ্কার-ধ্বনি ছাড়িলেন, সমস্ত বন সে শব্দে প্রকম্পিত হইল। বন অতিক্রম করিয়া দূরে পাহাড়ের অঙ্গে সেই ধ্বনি যেন গিয়া আঘাত করিল। যে স্থানে পূর্ব্বে বৃক্ষশাখা দুলিতেছিল, সে স্থানের বৃক্ষলতাদি বড়ই আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

তৎক্ষণাৎ এক অতি ভীষণ শার্দ্দূল-মূর্ত্তি বনের মধ্য হইতে বাহির হইল এবং সমস্ত দংষ্ট্রা বিস্তার করিয়া বিকট-নয়নে রাঘবের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। শার্দ্দূলের কলেবরের উপর দীর্ঘ কৃষ্ণ রেখা-সমূহ বিস্তৃত, তাহার মুখখানা একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ির অপেক্ষাও বড়। সে মাটীতে বসিয়া পড়িল এবং পুচ্ছ দ্বারা ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিতে লাগিল। তাহার লোচন হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইতে থাকিল। লেজ বাদ দিলেও তাহার সমস্ত শরীর বোধ হয় পাঁচ-হাত-পরিমিত দীর্ঘ।

ব্যাঘ্রকে তদবস্থায় দেখিয়া রাঘব আপনাআপনি বলিলেন, "একটু ছেলে-খেলা করা যাউক।" ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,"যম তোমাকে আমার সম্মুখে আনিয়াছে, আমি কি করিব? মরিতে যখন আসিয়াছ, কিরূপে মরিতে চাহ, বল, আমি তাহাই করি। কেবল কিলের আঘাতে মরিতে হইলে তোমার একটু কষ্ট বেশী হইবে! যদি ছুরি দিয়া কলিজা ফাঁক করিয়া দিই, তাহাতে কষ্ট কম হইতে পারে, আর যদি তীর দিয়া মাথা বিঁধিয়া দিই, তাহাতেও অনেকক্ষণ কষ্ট

পাইতে পার। চন্দ্রহাস দিয়া একেবারে গলাটা কাটিয়া দিলে, বোধ হয়, তোমার সুবিধা হইবে।"

তীর দুইটি পিঠের দিকে কটির কাপড়ে গুঁজিয়া রাঘব একহস্তে ছুরিকা, অপর হস্তে চন্দ্রহাস গ্রহণ করিলেন। তিনি নির্ভীকভাবে মৃদু মৃদু হাস্যের সহিত ব্যাঘ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন সে ব্যাঘ্র একটা অত্যুৎকট রবে লাফাইয়া উঠিল এবং চক্ষুর নিমিষে রাঘবের উপর পতিত হইল। ব্যাঘ্রাবয়বে রাঘবের মূর্ত্তি ঢাকিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রের হস্তে রাঘবের জীবনান্ত ঘটিবে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিল না! কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র সময় অতীত হইতে না হইতেই শোণিতাক্ত ব্যাঘ্র ভূতলে পড়িয়া গেল এবং যন্ত্রণা-সূচক পুচ্ছ ও চরণান্দোলন করিতে লাগিল। তাহার বক্ষঃস্থলের ভূরিভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং কণ্ঠদেশের অর্দ্ধাধিক ছিন্ন হইয়াছে।

ব্যাঘ্র তদবস্থায় নিপতিত হইলে রাঘব দেখিলেন, তাঁহার বাহুর এবং পৃষ্ঠের কিয়দংশ ব্যাঘ্রনখরে বিদারিত হইয়াছে। ক্ষত-স্থান দিয়া রুধির বহিতেছে। তখন তিনি বলিলেন, "বড়ই অন্যায় কাজ হইয়াছে গুরুর নিকট তিরস্কার খাইতে হইবে। ক্ষুদ্র একটা বাঘের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি নাই,—ইহার জন্য লজ্জিত হইতে হইবে।" তখন রাঘব সন্নিহিত একটা প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের নিকটে আগমন করিলেন, লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সেই শিলার পার্শ্বে একপ্রকার লতা রহিয়াছে। তীরের দ্বারা তিনি সেই লতা টানিয়া আনিলেন; তাহার পর একখণ্ড ক্ষুদ্র প্রস্তর দ্বারা তৎসমস্ত পেষণ করিলেন, এবং প্রথমে পৃষ্ঠের ক্ষতের উপর উভয় হস্ত দ্বারা অনুমান করিয়া সেই

ঔষধ অনেকখানি লাগাইয়া দিলেন; নিকটে শাল-বৃক্ষ হইতে তিন চারিটি বড় বড় পাতা ছিঁড়িয়া লইলেন এবং সেগুলি পৃষ্ঠের ক্ষতের উপর দিয়া একটা দৃঢ় লতা দ্বারা বুক বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। পৃষ্ঠের ব্যবস্থা এইরূপে শেষ করিয়া রাঘব সেই ঔষধ যথেষ্ট পরিমাণে হস্তে লাগাইলেন, এবং পূর্ব্ববৎ পত্রাচ্ছাদিত করিয়া লতা দ্বারা বন্ধন করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "ছালখানা লওয়া আবশ্যক কি না? অনেক কাজে লাগিবে, লইতেই হইবে। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আর অপেক্ষা করা চলে না। যে কার্য্যের নিমিত্ত গুরুদেব ভার দিয়াছেন, তাহার যে কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না। সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিবার আদেশ আছে, কাজেই আর অপেক্ষা করা চলে না। ছালখানার জন্য দুইজনকে এখনই পাঠাইব। বিলম্ব হইলে শৃগালে খাইয়া ফেলিবে।"

তাহার পর রাঘব সেই ব্যাঘ্রের নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, তাহার সকল যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। তখন তিনি সেই মৃত ব্যাঘ্রদেহের উপর একবার দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার পর তাহার পুচ্ছের অতি অল্প এক অংশ কাটিয়া লইলেন এবং একটা দাঁত ও একটি নখ তাহার দেহ হইতে বাহির করিলেন। যদি ব্যাঘ্রের নখ বা দন্তাঘাতে কেহ ক্ষত হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষত অতি শীঘ্র অতীব ভয়ানক প্রদাহ উৎপাদন করে এবং তজ্জন্য প্রাণান্ত হয়। এইরূপ আঘাতে যে প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে সাধারণতঃ "মেউয়া চাগান" বলে। মেউয়া চাগাইলে আহত ব্যক্তি প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সংস্কার ছিল যে, সেই ব্যাঘ্রকে তৎক্ষণাৎ পদাঘাত করিতে পারিলে এবং

পুচ্ছের কিয়দংশ, একটা দাঁত ও একটা নখ সঙ্গে থাকিলে সেরূপ প্রদাহ হয় না। রাঘব জানিতেন, যে ঔষধ তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে মেউয়া যোগাইবার কোন সম্ভাবনা নাই; তথাপি চিরন্তন সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক বলিয়া তিনি বুঝিলেন।

সেই অরণ্যের প্রত্যেক স্থানই যেন রাঘবের সুপরিচিত। তিনি অবলীলাক্রমে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করার পর একটি পার্ব্বত্য ঝরণা তাঁহার নয়নে পড়িল। ঝরণায় রক্তাভ বালুকা প্রচুর, একদিক দিয়া অতি অল্পপরিমাণ জল ঝির ঝির করিয়া ঝরিতেছে। কি মনোহর! কি সুন্দর! দুই দিকে গহন বন, পশ্চাতে অত্যুচ্চ গিরি আর তন্মধ্য দিয়া এই স্বল্পতোয়া কলভাষিণী প্রবাহিণী প্রবাহিতা। রাঘব সেই নদীমধ্যে নামিয়া হস্তস্থিত ছুরিকা ও চন্দ্রহাস সেই জলে ধৌত করিলেন; তাহার পর তিনি মুখে ও মস্তকে একটু জল প্রদান করিয়া সেই নদীর বালুকার উপর দিয়া পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বন ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে সেই সন্ধ্যার প্রাক্কালেই গভীর নিশার অন্ধকার পরিদৃষ্ট হইল। কোথাও পাষাণ-খণ্ড হইতে পাষাণখণ্ডান্তরে নির্ঝরিণীর বারিপাত হওয়ায় অতি প্রীতিপ্রদ শব্দের উদ্ভব হইতেছিল। কুত্রাপি কোন মনুষ্য বা অন্য কোন জীবেরও সমাবেশ ছিল না। কোন স্থানে ক্ষুদ্র শৈল অতিক্রম করিয়া, কোন স্থানে নদী-নিপতিত অবনত বৃক্ষশাখা-সমূহের তলে হামাগুড়ি দিয়া, কোন স্থানে একটু বেষ্টন করিয়া রাঘব অনায়াসে নিশ্চিন্তভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রমেই নদীর পথ

দুর্গম হইয়া আসিতে লাগিল, স্থানে স্থানে প্রস্তররাশি যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীররূপে নদীগহ্বরের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র ভেদ করিয়া নদীর জল মধুর শব্দ করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে বহিয়া আসিতেছিল; কিন্তু মনুষ্য বা অন্য কোন বৃহৎ জীবের সে স্থান দিয়া যাইবার উপায় ছিল না। এই পাষাণ-প্রাচীর যেন কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইল; তাহা নদী-গহ্বরের উভয় পার্শ্বে ঘনারণ্য-মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক কণ্টকীলতা নদীর উভয় পার্শ্ব হইতে আসিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে পার্শ্বস্থ বৃক্ষের শাখা এবং প্রকাণ্ড শিলা মিলিয়া নদীর পথ প্রায় রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রাঘব অনায়াসেই এই সকল বাধা অতিক্রম করিলেন। তাঁহার গতি দেখিয়া বোধ হইল, এই সকল স্থান দিয়া তিনি সতত যাতায়াত করেন এবং যে যে উপায়ে গমন করিলে অনায়াসে প্রতিবন্ধক অতিক্রম করা যায়, তাহা তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন।

প্রায় অর্দ্ধক্রোশ এইরূপে অতিবাহিত করার পর নদীর পথ বড়ই সুপরিষ্কৃত বলিয়া বোধ হইল এবং বনের গাঢ়তাও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। অনতিকালমধ্যে বৃক্ষমাত্র-পরিশূন্য প্রশস্ত প্রান্তর রাঘবের নয়নে পড়িল। রাঘব তখন নদীপথ পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে উঠিলেন। প্রান্তর বহুদূর-বিস্তৃত। তাহার উপরে কোনরূপ বৃক্ষলতাদির সমাবেশ নাই। অদূরে সম্মুখে কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য কুটীর, এই স্থানে রাঘব একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মনে হইল, এই সকল কুটীরের মধ্যে সংসারের সার, সৌন্দর্য্যের সার, কোমলতার সার— সুরসুন্দরী

রঙ্গিলা আছেন। যাইব না—এ দিকে অকারণে কখনই আর যাইব না, গুরুর নিকট কার্য্যে বা মনেও কখন অবিশ্বাসী হইব না।

রাঘব সে সকল কুটীরের দিকে গমন না করিয়া উত্তরমুখে চলিলেন। উত্তরে প্রান্তরের সীমায় পুনরায় ঘনারণ্য আরম্ভ হইল। তাহার মধ্য দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর আবার একটি বহ্বায়ত প্রান্তর রাঘ-বের নয়নগোচর হইল। সেই প্রান্তরের মধ্যে অনেক ঘর এবং তথায় অনেক লোক। তন্মধ্যস্থ এক সামান্য পর্ণকুটীরে রাঘব প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রথমে রাঘব যে প্রান্তরে উপনীত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকখানি কুটীর ছিল। একখানি কুটীরের সম্মুখে নানাপ্রকার ফুলের গাছ, গাছগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে যত্ন সহকারে সংস্থাপিত নহে; বিশৃঙ্খলভাবে মণ্ডলাকারে তৎসমস্ত প্রতিষ্ঠিত। ছোট বড় নানা প্রকার ফুলের গাছ সেখানে আছে;—চম্পক ও কুরুবক, সেফালিকা ও স্থলপদ্ম, রজনীগন্ধ, বেল, মল্লিকা, যূঁই, গাঁদা, করবী প্রভৃতি অনেক প্রকার পুষ্পবৃক্ষ ও গুল্ম অনিয়মিতরূপে তথায় সংস্থাপিত। সেই সামান্য পুষ্পোদ্যান-সমীপে এক শোভাময়ী যুবতী একাকিনী একখণ্ড পাষাণের উপর বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। সেই গহনবনে উপলাসীনা সেই ভুবনমোহিনীকে যেন বনদেবী বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার নয়নে লালসার প্রখরতা নাই; ভঙ্গীতে ভোগাসক্তির মত্ততা নাই, মুখে সরলতা ভিন্ন অন্য কোনও ভাবের বিকাশ নাই। সুন্দরীর নয়ন হৃদয়ের কোন ভাব গোপন করিতে জানে না। যুবতীর মুখ নিয়ত অন্তরের পূর্ণ পবিত্রতা পরিব্যক্ত করিতেছে।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী; আকাশে চন্দ্র-তারকা সুনির্ম্মল আলোক বিতরণ করিতে করিতে হাসিতেছেন। অরণ্যের বৃক্ষচূড়ে এবং পার্শ্বস্থ শৈলশিরে সেই আলোকমালা মনোহর শোভা ছড়াইতেছে। পঞ্চকোটের পাহাড় যেন একখণ্ড ঘনকৃষ্ণ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

যে স্থানে যুবতী আসীনা, তত্রত্য কুসুম-সংবলিত বৃক্ষরাজি চন্দ্রালোকে ভাসিত হইয়া অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের নিকেতনরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে। সেই সুধাংশুকিরণ-সম্পাতে শোভা-ময়ী যুবতীর সৌন্দর্য্য বড়ই মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছে। উজ্জ্বল, মসৃণ কেশদামে চন্দ্রকিরণ এক একবার বড়ই চাক্‌চক্যময় দেখাইতেছে। সুন্দরীর নয়ন এক একবার হীরকখণ্ডের ন্যায় প্রভাময় হইতেছে; তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভ বর্ণ এক একবার যেন অত্যুজ্জ্বল হইতেছে; শিশির-নিষিক্ত কমলিনীর ন্যায় ম্লানমুখে সুন্দরী ঊর্দ্ধে চাহিয়া আছেন। সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ, কোথাও একটি পক্ষীর শব্দ বা পশুবিশেষের রবও কর্ণগোচর হইতেছে না, কেবল ঝিল্লীগণের অবিশ্রান্ত সমভাবাপন্ন ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাইতেছে না।

যুবতীর দেহ একখানি সামান্য শ্বেতবস্ত্রে সমাচ্ছন্ন। তাঁহার শরীরের কুত্রাপি কোনরূপ ভূষণ নাই। বামহস্তে একটা লৌহ-বলয় এবং সীমন্তে স্থূল সিন্দূররেখা যুবতীর সধবত্বের পরিচয় দিতেছে। তিনি পরিণত-কায়া ও লাবণ্যপ্রদীপ্তা। অনেকক্ষণ একাকিনী গভীর রাত্রিকালে সেই স্থানে বসিয়া বসিয়া যুবতী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার পর আপন মনে বলিলেন, "এত বিলম্ব হইতেছে কেন? সব আছে, কিন্তু ঘরে নাই কেবল একজন। সেই একজনের বিহনে এমন চাঁদের আলোও যেন অন্ধকার; ফুল তুলিব কি? মালা গাঁথিব কি? না, যাঁহাকে পরাইব, তিনি এখানে নাই। নিজে পরিয়া ত সুখ পাইব না। যাঁহাকে দেখাইয়া সুখী হইব, তিনি না ফিরিলে কিছুই করিব না।"

যুবতী অনেক দূর চলিয়া গেলেন; স্থানে স্থানে কাণ পাতিয়া স্থির হইয়া তিনি কি শুনিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইলেন না। আবার পূর্ব্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিলেন; আবার বলিলেন, "চাঁ

এইখানে আসিলে তিনি ফিরিবেন কথা ছিল, চাঁদ তো এখান হইতে ছাড়িয়া চলিতেছে ; কৈ, তিনি ত আসিলেন না ?”

বহুদূরে একটা হিংস্র পশুর কণ্ঠস্বর উঠিল। যুবতীর মনে পড়িল, বাঘ-ভল্লুকের কণ্ঠস্বর শুনিলে তাঁহাকে ঘরের মধ্যে থাকিবার আদেশ ছিল ; তিনি বলিলেন, “ঘরের মধ্যে যাইব কি ?—না। এখানে অনেক লোক আছে, কাহাকেও ডাকি।—না, কেন ?” আবার মনে করিলেন,“ডাকিলে এখনই ভল্লুকের প্রাণ যাইবে। আমার লাভ কি হইবে ?—না,কাজ নাই।”

এইরূপ সময়ে আমাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিত রাঘব ধীরে ধীরে যুবতীর নিকটে আসিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র যুবতী বলিয়া উঠিলেন, “এ কি রাঘব দাদা, তুমি কি আজি ঘরেই আছ ? তোমাকে তো বৈকালে কোথাও দেখি নাই ?”

রাঘব বলিলেন, “আমি ঘরে ছিলাম না। তবে নিকটেই ছিলাম বটে। অনেকক্ষণ ঘরে ফিরিয়াছি, এক্ষণে একটা ভল্লুকের আওয়াজ পাইয়া তোমার কাছে আসিলাম। আমি জানি, গুরু বাটীতে না থাকিলে তুমি বনে বনে একাকিনী বেড়াইয়া থাক, এই জন্যই ভয়ে ভয়ে আমাকে আসিতে হইয়াছে।”

রঙ্গিলা বলিলেন, “এ কি ! দাদা ! তোমার পিঠে, হাতে পাতা বাঁধা কেন ? কি হইয়াছে ?”

রঙ্গিলা অতিশয় উৎকণ্ঠিতভাবে রাঘবের নিকটে আসিলেন এবং কাতর-নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাঘব বলিলেন, “ও কিছু নয়, একটা বাঘে আঁচড়াইয়া দিয়াছিল। ঔষধ বাঁধিয়া রাখিয়াছি এখন একটু বেদনা আছে, কালি সারিয়া যাইবে।”

রঙ্গিলা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "বাঘে আঁচড়াইয়া দিয়াছিল? কি ভয়ানক! বড় লাগিয়াছিল? অনেক রক্ত পড়িয়াছিল? আমাকে ডাক নাই কেন? আমি হাত বুলাইয়া দিতাম, হাওয়া করিতাম, তুমি ঠিক জান কি দাদা, কালি সারিয়া যাইবে?"

রাঘব বলিলেন, "তা যাইবে বই কি? ওরূপ আঘাত আমরা গ্রাহ্যই করি না। খানিকটা রক্ত পড়িয়াছিল বটে, অনেকখানি মাংস ও ছাল উঠিয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে আমরা ভ্রূক্ষেপও করি না।"

রঙ্গিলা বলিলেন, "তুমি এইখানে বসো দাদা, দাঁড়াইয়া থাকিও না। এখন পাতা খুলিয়া দেখিলে,বোধ হয় ক্ষতি হইবে। কালি প্রাতে আমাকে ঘা দেখাইবে তো দাদা? তুমি রাত্রিতে কি খাইয়াছ?"

রাঘব বলিলেন, "রাত্রিতে যাহা খাই, তাহাই খাইয়াছি, এমন কিছুই হয় নাই যে, এজন্য খাওয়ার কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

রঙ্গিলা বলিলেন, "ভালুকের আওয়াজ শুনিয়া তুমি কেন উঠিয়া আসিলে দাদা? তোমার শরীরে এত ব্যথা, এখন তোমার উঠিয়া আসা কিছুতেই ভাল হয় নাই। যদি এ সময় ভালুক এখানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেও তোমাকে আমি কোন কাজই তো করিতে দিব না। আজি তুমি এত আঘাত পাইয়াছ, আবার ভগ্নীর বিপদের ভয়ে ছুটিয়া আসিয়াছ, এ সংসারে যে তোমাকে 'দাদা' বলিতে পাইয়াছে, সেই সুখী।"

রাঘব একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,কিন্তু কথা কহিলেন না। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এ সংসারে করুণাময়ী রাঙ্গলা যথার্থই ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যে রঙ্গিলাকে আপন বলিয়া জানিয়াছে, সেই ভাগ্যবানের অগ্রগণ্য; যথার্থ দেবতার কণ্ঠে এই অপূর্ব্ব মাল্য ভগবান্ সাজাইয়াছেন।

রঙ্গিলা আমার ভগিনী, এরূপ দেবীকে ভগিনীরূপে লাভ করাও অপরিসীম সৌভাগ্য। কিন্তু হায়, কেন এ পাষণ্ডের চিত্ত এরূপ অপরিসীম সৌভাগ্যে পরিতৃপ্ত হয় না? কেন এই দেবীকে আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ করিতে আমার পাপ-প্রাণ ব্যাকুল হয়? ছি ছি! কি ঘৃণার কথা! এ চিন্তা পরিহার করিতে হইবে, এ বাসনা বিসর্জ্জন দিতে হইবে। রঙ্গিলা গুরুপত্নী। ভগ্নীর চক্ষুতে তাঁহাকে দেখিতে হইবে।"

সহসা বহুদূরস্থ অশ্বের পদশব্দ রঙ্গিলার কর্ণে প্রবেশ করিল। রাঘবও যে সে শব্দ শুনিতে পাইলেন না, এরূপ নহে, তিনি চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "গুরু তো আজি ঘোড়া লইয়া যান নাই! তবে ঘোড়ার পায়ের শব্দ কেন আসিল?" রাঘব আর কোন কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া, যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। রঙ্গিলা তাঁহার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে বলিলেন, "তুমি যাইও না দাদা, আর কাহাকেও পাঠাও। তোমার শরীর আজি কাতর আছে।"

রাঘব বলিলেন, "এমন কথা বলিও না। গুরুর আদেশমত কার্য্য করিতে আমি বাধ্য। তিনি আমাকে সতর্ক থাকিবার ভার দিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।' সামান্য একটু আঘাতের জন্য তাঁহার কার্য্যে অপরকে পাঠাইলে আমার কর্ত্তব্যপালনের হানি হইবে, আমি জীবন থাকিতে তাহা পারিব না। তুমি ঘরের ভিতর যাও রঙ্গিলা! খবরদার, বাহিরে আসিও না।"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে রাঘব ঘনারণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইলে রঙ্গিলা বলিলেন, "যেমন গুরু, তেমন শিষ্য। দেব গুরুর দেবতা শিষ্যই হইয়া থাকে।"

বনভূমি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। রঙ্গিলা ভাবিতে লাগিলেন, "দাদা এত ব্যাকুলভাবে প্রস্থান করিলেন কেন? গুরু ঘোড়া লইয়া যান নাই, ইহাতে চিন্তার কথা কিছুই নাই তো? বিনা অশ্বে যাত্রা করিয়াও বহুদিন কত অশ্ব লইয়াই তিনি ফিরিয়াছেন। বোধ হয়, দাদা কর্ত্তব্য-পালনের অনুরোধে ব্যস্তভাবে ধাবিত হইয়াছেন, ভয়ের আমি কোন কারণ দেখিতেছি না। মনুষ্যরূপধারী দেবতার, জগদম্বার প্রিয়-দাসের অমঙ্গলের কোনই সম্ভাবনা নাই।"

রঙ্গিলা আবার সেই পাষাণের উপর বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনেকক্ষণ অতীত হইল, রাঘব ফিরিয়া আসিলেন না। রঙ্গিলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু দারুণ উৎকণ্ঠা হেতু কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি পাষাণাসন ত্যাগ করিয়া কুটীরদ্বারে আসিলেন এবং উৎসুক-চিত্তে বসিয়া দূরাগত শব্দ শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।—"কৈ, অশ্ব-পদধ্বনি আর তো হয় না, মনুষ্যের কণ্ঠস্বর একবারও শুনিতে পাওয়া গেল না। দাদা কোনরূপ সঙ্কেতধ্বনি করিলেন না, কাহারও পদশব্দও পাওয়া যাইতেছে না; তবে কি হইল?"

অনেকক্ষণ অস্থিরভাবে চিন্তা করিয়া রঙ্গিলা কুটীরদ্বার ত্যাগ করিলেন। যে দিকে রাঘব গিয়াছেন, সেই দিকে বনের সীমা পর্য্যন্ত রঙ্গিলা আসিলেন। বৃক্ষপত্র সরাইয়া তিনি বনের মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করাইলেন, অনেকক্ষণ সেই ভাবে রহিলেন, কোন শব্দ পাওয়া গেল না। তখন অত্যন্ত বিচলিতভাবে রঙ্গিলা কুটীর-সম্মুখে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর ফুলগাছ-সমূহের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "বড় মন কেমন করিতেছে। তাঁহার জন্য ভয় কিছুই নাই, তিনি ভবানীর দাস। তথাপি মন প্রসন্ন হইতেছে না। তোমরা কেহ তাঁহার সংবাদ আনিয়া দিতে পার?"

সহসা পশ্চাতে মনুষ্যের পদশব্দ হইল। রঙ্গিলা দেখিলেন, চিন্তাযুক্ত রাঘব দ্রুতপদে ফিরিতেছেন। ব্যস্ততা সহ রঙ্গিলা তাঁহার নিকটস্থ হই-

লেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "তোমাকে চিন্তিত দেখিতেছি কেন দাদা? কি সংবাদ পাইলে?"

রাঘব বলিলেন, "চিন্তার কোন কারণ নাই, তথাপি একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক। অশ্বপদশব্দ শুনিয়াছি; সকল ঘোড়াই আস্তাবলে রহিয়াছে, একটিও কোথাও যায় নাই, রক্ষকেরা ঠিক আছে, তবে ঘোড়ার পদধ্বনি কেন হইল? এজন্য একটু সাবধানভাবে বনের চারিদিক্ দেখা আবশ্যক। তুমি সাবধানে থাকিও রঙ্গিলা, আমি শীঘ্রই ফিরিব।"

তখন রঙ্গিলা আসিয়া রাঘবের হস্ত ধারণ করিলেন এবং উদ্বেগের সহিত বলিলেন, "বুঝিতেছি, তুমি বড় চিন্তিত হইয়াছ। তোমার কপাল. তোমার ভাবভঙ্গী, সকলই মনের অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। তুমি যখন চিন্তিত হইতেছ, তখন বুঝিতে হইবে, বিপদ্ হয় তো নিকটবর্ত্তী।"

রাঘব বলিলেন, "না না, এ আশঙ্কা তুমি কেন করিতেছ? কাহার বিপদ্ ঘটিবে? কে বিপদ্ ঘটাইবে? দেবতার বিপদ্ মানুষে ঘটাইতে পারে কি? তুমি ঘরে থাক, আমি এখনই ফিরিতেছি।"

রঙ্গিলা বলিলেন, "একটা কথা শুন, তুমি কোথাও যাইও না। তোমার হাতে এখনও ঔষধ জড়ান রহিয়াছে, তোমার অনেক রক্তক্ষয় হইয়াছে; আবার কোন কাণ্ড উপস্থিত হইলে তোমার বড়ই অনিষ্ট হইবে, আমি তোমাকে যাইতে দিব না।"

কথাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উভয় হস্তের পাতা একত্র করিয়া রঙ্গিলা তাহার মধ্যে জোরে ফুৎকার দিলেন। তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ, কর্কশ ও বহুদূরব্যাপী এক ধ্বনি উৎপন্ন হইল। সে শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত কাঁপিতে কাঁপিতে

ছুটিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে চারিদিকের বন হইতে সেই গভীর রাত্রি-শেষে অস্ত্রধারী মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখা দিল।

রাঘব বলিলেন, "করিলে কি? এই গভীর রাত্রিশেষে কেন অকারণ সকলের শান্তিভঙ্গ করিলে?"

রঙ্গিলা বলিলেন, "যদি অপরাধ হইয়া থাকে, ভগ্নীবোধে ক্ষমা কর। তোমাকে যাইতে দিব না, এই সকল বীরের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা, পাঠাইয়া দাও।"

রাঘব বলিলেন, "বুঝিতেছি, আমার জন্য তুমি বড়ই চিন্তিতা হইতেছ; কিন্তু তুমি জান না রঙ্গিলা, আমার স্কন্ধে কি গুরুভার অর্পিত আছে। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ কর্ত্তব্যপালন করিতে আমি বাধ্য। তোমার ইচ্ছাতেও স্থির থাকিতে আমার অধিকার নাই। আমার দেহে কোন কষ্ট নাই। রঙ্গিলা, বীরেরা আসিয়াছেন, তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই; তাঁহারা এই স্থানে আমার প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন।"

তখন প্রায় একশত ধনুর্ব্বাণধারী বীর সেই প্রান্তর বেষ্টন করিয়া এবং অরণ্যের দিকে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

রাঘব বলিলেন, "ভাই সব, তোমরা কিছু কাল এই স্থানে অপেক্ষা কর; আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি। কেন এই গভীর রাত্রিকালে তোমাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে, তাহা আমি আসিয়া বলিব।"

চারিদিক্ হইতে সকল বীর মস্তক নত করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আর কোন কথা না বলিয়া রাঘব পূর্ব্বদিকের বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বীরেরা পাষাণ-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

রঙ্গিলা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "রাঘব, এ সংসারে তুমিই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার আদর্শ। কিন্তু আজি তোমাকে চঞ্চল দেখিতেছি কেন? এ সংসারে গুরু তোমার প্রত্যক্ষ দেবতা, গুরু তোমার সর্ব্বস্ব, গুরু তোমার জীবন। নিজের বিপদে কাতর হইবার ব্যক্তি তুমি নহ। তবে কি গুরুর সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা তোমার মনে উদিত হইয়াছে? তিনি একাকী গিয়াছেন, অশ্বও লন নাই, তাহাতে চিন্তার বিষয় কি আছে? এই পাহাড় লোকে কাটাইয়া দিতে পারে, কিন্তু গুরুর কেশাগ্র কেহ স্পর্শ করিতে পারে না; তবে চিন্তার বিষয় কি আছে?—আছে। ঐ অশ্বপদ-শব্দ ভাবনার কথা বটে। বুঝিয়াছি, তুমি কোন বিপক্ষের আগমন আশঙ্কা করিতেছ। গুরু কাননে নাই, তুমিও আঘাত পাইয়াছ, এ অবস্থায় তোমার চাঞ্চল্য অসম্ভব নহে। আমি অনেকক্ষণই এইরূপ বুঝিতেছি; কিন্তু দাদা, তুমি সে কথা বলিতেছ না বলিয়া আমিও তাহা বলিতে সাহস করিতেছি না।"

অনেকক্ষণ অতীত হইল, রাঘব ফিরিলেন না। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, দূরে দেবস্থানে মঙ্গলারতিসূচক বাদ্যধ্বনি সুস্পষ্টরূপে রঙ্গি-লার কর্ণে প্রবেশ করিল। রঙ্গিলা ঘোর চিন্তার সহিত শূন্যদৃষ্টিতে কুটীর-দ্বারে বসিয়া রহিলেন।—"দাদা কাতর আছেন, অস্ত্র লন নাই, কোন লোকই সঙ্গে লন নাই। যদি কোন শত্রু আসিয়া থাকে, তাহা হইলে দাদাকে হয় তো কষ্ট পাইতে হইবে। কিন্তু ভয় কিছুই নাই; মনুষ্য কখনই দেবীর রক্ষিত এই ধর্ম্মকাননের অনিষ্ট করিতে পারে না।"

কোমল ও কঠোরের অদ্ভুত সম্মিলন। সেই কুটীর-দ্বারে চিন্তাক্লিষ্টা ভুবনমোহিনী, সেই কুসুমভারাবনত লতাগুল্ম, সেই সুমধুর জ্যোৎস্না,

সেই হীরকখচিত নভোমণ্ডল, সকলই কোমলতার ঘোষণা করিতেছে ; আর সেই স্ফীত-বক্ষঃ, আয়ুধহস্ত শতবীর, সেই হিংস্র-পশুপূরিত বহুবিস্তৃত ঘনারণ্য, সেই কঠিন-প্রস্তর-গঠিত বিশাল পাহাড়, সকলই কঠোরতার পরিচয় দিতেছে। রঙ্গিলা চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দভাবে উপবিষ্টা। সহসা এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল, শতবীর একসঙ্গে অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "গুরুজীর জয় !" রঙ্গিলা পাগলিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন ;—দেখিলেন, সেই প্রান্তরের মধ্যদেশে বিশালোরস্ক, দীর্ঘবাহু, প্রসন্নমূর্ত্তি এক পুরুষ দণ্ডায়মান। সেই পুরুষ আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত শম্ভুরাম। শম্ভুরাম তখন উপস্থিত বীরবৃন্দকে অভিবাদন করিয়া একজনকে জিজ্ঞাসিলেন, "এই অসময়ে সকলে এখানে কেন ?"

বীরেরা উত্তর দিল, "জানি না। রাঘবজীর হুকুম।"

শম্ভুরাম আবার জিজ্ঞাসিলেন, "রাঘব কোথায় ?"

সে ব্যক্তি আবার বলিল, "কোথায় জানি না ; পূর্ব্বদিকে যাইতে দেখিয়াছি।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তোমরা এখন যাইতে পার।"

বীরেরা তখন পুনরায় অভিবাদন করিয়া বনমধ্যে অদৃশ্য হইল। তখন পক্ষিণীর ন্যায় বেগে রঙ্গিলা আসিয়া সেই বীরের বক্ষে মস্তক স্থাপন করিলেন। তাঁহার নয়নে জল, অধরে হাসি। শম্ভুরাম সেই ক্ষুদ্রকায়া যুবতীকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার বদনে বার বার চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,"কি হইয়াছে রঙ্গিলা? এত যোদ্ধা কেন ? রাঘব কোথায় ?"

তখন রঙ্গিলা সেই গজরাজ সদৃশ বীরের হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া একখণ্ড শিলার উপর আনিয়া বসাইলেন। তাঁহার

পর তাঁহার উরুদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া বলিলেন, "আগে তুমি আমার কথার উত্তর দাও, পরে আমি যাহা বলিতে হয়, বলিব।"

শম্ভুরাম সাদরে রঙ্গিলাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন; বলিলেন, "কি জিজ্ঞাসা করিবে, বল?"

রঙ্গিলা বলিলেন, "তুমি কতক্ষণ ধর্ম্মকাননে আসিয়াছ?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "এইমাত্র আসিতেছি।"

রঙ্গিলা বলিলেন, "ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছ কি হাঁটিয়া আসিয়াছ?"

শম্ভুরাম উত্তর দিলেন, "ঘোড়া লইয়া যাই নাই, হাঁটিয়াই আসিয়াছি।"

তখন রঙ্গিলার মুখ বিবর্ণ হইল, তিনি ঘোর চিন্তিত ও অন্যমনস্ক হইলেন। শম্ভুরাম বলিলেন, "তোমার কথার উত্তর দিয়াছি, এখন আমার কথার উত্তর দাও। প্রথমে বল, তোমাকে এত চিন্তিত দেখিতেছি কেন?"

রঙ্গিলা মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঘোড়ার পায়ের শব্দ হইল কেন?"

"কোথায় ঘোড়ার পায়ের শব্দ?"

"পাহাড়ের দিকে।"

"কতক্ষণ আগে?"

"প্রায় আড়াই দণ্ড হইবে।"

শম্ভুরামও একটু চিন্তিত হইলেন;—জিজ্ঞাসিলেন, "রাঘব কোথায়?"

রঙ্গিলা উত্তর দিলেন, "তাহা তো শুনিয়াছ। তুমি কি ভাবিতেছ? কি বুঝিতেছ?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "ভাবিয়াও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। ঘোড়ার পায়ের শব্দ হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। আস্তাবলে সন্ধান করা হইয়াছে?"

রঙ্গিলা বলিলেন, "হাঁ, কোন ঘোড়া লইয়া কেহ কোথাও যায় নাই।"

তখন শম্ভুরাম বলিলেন, "রাঘবের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

তখন রঙ্গিলা কৃত্রিম ক্রোধ সহকারে স্ফুরিতাধরে একটু সরিয়া বসিলেন;—বলিলেন, "আমি ছোট—আমি স্ত্রীলোক, তাই বলিয়া তুমি আমাকে গ্রাহ্য কর না, আমাকে কোন কথা বলিতে চাহ না। সত্য বটে, আমি তোমাদিগের মত যুদ্ধ করিতে জানি না; কিন্তু পৃথিবীর যিনি প্রধান যোদ্ধা, তাঁহার দাসী কখনই তেজঃশূন্য—সাহসশূন্য, শক্তিশূন্য হইতে পারে না।"

শম্ভুরাম সাদরে রঙ্গিলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "কে বলিতেছে, তোমার শক্তি নাই রঙ্গিলা? তুমি যাহাকে পৃথিবীর প্রধান যোদ্ধা বলিয়া সম্মানিত করিতেছ, তুমিই তো তাহার শক্তি। প্রাণের প্রাণের মধ্যে মা ভুবানী হাসিতে হাসিতে দুলিতে দুলিতে অভয় দিতেছেন, আর বাহিরে—তাঁহারই শক্তি লইয়া—রঙ্গিলা, তুমি হৃদয়, মন, দেহ মাতাইয়া রাখিয়াছ। আর কিছু তো জানি না রঙ্গিলা, প্রাণে সেই পূজার দেবী, আর বাহিরে এই জীবনের সঙ্গিনী, ইহা ছাড়া আর কিছুই তো নাই রঙ্গিলা! যে দিন এই দুইকে চিনিতে ভুলিব, সেই দিন দেহ যাইবে, বল যাইবে, বীরত্ব যাইবে, শম্ভুরাম নদীর বালুকার ন্যায় নগণ্য হইবে।"

সহসা দিগন্ত কম্পিত করিয়া এক তীব্র বংশীধ্বনি উঠিল। রঙ্গিলা করপল্লবের সংযোগে যেরূপ শব্দের উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহাও সেইরূপ শব্দ; কিন্তু তদপেক্ষা উৎকট ও তদপেক্ষা দূরসঞ্চারী। তৎক্ষণাৎ শম্ভুরাম বাহুপাশ হইতে রঙ্গিলাকে ছাড়িয়া দিলেন, তৎক্ষণাৎ সিংহের ন্যায় বিক্রমে তিনি শব্দাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

রঙ্গিলা আপন মনে বলিলেন, "হায়, কেন আগে বলি নাই, দাদা আহত? তাঁহার সহিত সকল প্রকার অস্ত্র নাই। কিন্তু চিন্তা কি, যখন দেবতা স্বয়ং গমন করিলেন, তখন ভাবিবার বিষয় আর কিছুই নাই।"

অনেকক্ষণ গেল। ঊষার শ্বেতবর্ণ বনস্থলীর অন্ধকার অপসারিত করিতে আসিল, চারিদিকে দলে দলে বিবিধ-জাতীয় বিহঙ্গম কূজন করিয়া উঠিল। পূর্ব্বাকাশের নিম্নদেশ নায়ক-সম্মিলনে বিরহ বিধুরা নায়িকার গণ্ডদেশের ন্যায় রক্তাভ হইল। কিন্তু পূর্ব্বদিকে প্রকাণ্ড শৈলের বিদ্যমানতা হেতু সে শোভা রঙ্গিলার নয়নে পড়িল না। প্রতাপান্বিত সমৃদ্ধিশালী নরপতির পুরোভাগে যেরূপ বিবিধ বর্ণের পতাকা চলিতে থাকে, সেইরূপে পূর্ব্ব-গগনাঙ্গনে রক্তবর্ণ কৌষিকবস্ত্র-বিরচিত কেতনমালা মার্ত্তণ্ডদেবের সমাগম ঘোষণা করিতে লাগিল। নবাগত সুমধুর আলোকে বসুন্ধরা পুলকিত হইল এবং অন্ধকার আপনার কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদন লইয়া দূরে পলায়ন করিল। কিন্তু যাহার হৃদয়ে অন্ধকারের পূর্ণ আধিপত্য, সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্যরশ্মি তথায় আলোক বিকীর্ণ করিতে পারিল না। রঙ্গিলার হৃদয় চিন্তা-তমসাচ্ছন্ন, সেই অশ্বপদ-ধ্বনির আবির্ভাব হইতে এ কাল পর্য্যন্ত নিরন্তর চিন্তার বৃদ্ধি হইতেছে। শেষ যে তীব্র-ধ্বনি শুনিয়া শম্ভুরাম বেগে প্রস্থান করিয়াছেন, তাহা সুন্দরীর

চিন্তার মাত্রা অতিশয় বাড়াইয়া দিয়াছে। ব্যাকুলভাবে রঙ্গিলা একবার উপলখণ্ডে, একবার কুটীর-দ্বারে, একবার পুষ্পকাননে, একবার শম্ভু-রামের পরিগৃহীত অরণ্যসমীপে গমন করিতেছেন। মধুর প্রভাত-বায়ু তাঁহার অলকদাম নাচাইতেছে, ললাট সুশীতল করিতেছে, বিশৃঙ্খল বস্ত্রের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শান্তি নাই, আনন্দ নাই। সহসা রঙ্গিলা শুনিতে পাইলেন, শম্ভুরাম উচ্চস্বরে বলিতেছেন, "দেহে হস্তক্ষেপ করিও না; সাদরে সঙ্গে লইয়া আইস।"

অবিলম্বে শম্ভুরামের উন্নতমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল, আবার রঙ্গিলা ক্রীড়াশীলা হরিণীর ন্যায় বেগে তাঁহার সন্নিকটস্থ হইলেন;—জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "কি হইয়াছে, এখনও ঠিক জানি না, ভয়ের কোন কারণ নাই; কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে অধিকক্ষণ থাকিবার সুযোগ হইবে না। আমাকে এখনই বিচারালয়ে বসিতে হইবে। তাহার পর আসিয়া তোমার সঙ্গে মায়ের পূজা করিতে যাইব।"

আর কোন কথা না বলিয়া শম্ভুরাম অন্য এক পথ দিয়া বনের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুদূরব্যাপী সেই ঘনারণ্যের এক স্থানে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। শাখা-প্রশাখা সহ সেই বিশাল পাদপ বহু স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষাধিকৃত স্থানের চতুর্দ্দিকে বিংশতি-হস্ত-প্রমাণ স্থানে অন্য কোন বৃক্ষলতাদি নাই। বটবৃক্ষনিম্নে কয়েকখানি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাষাণ বিশৃঙ্খলভাবে ভূপৃষ্ঠ বিদার করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। শম্ভুরাম ঝটিতি আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক লোক। সকলেই ধনুর্ব্বাণধারী, সকলেরই কটিদেশে কোষমধ্যে প্রকাণ্ড ছুরিকা। সকলেরই মস্তকে উষ্ণীষ, সকলেরই পরিধান ধুতি,—সামান্য এবং মল্লগণের ন্যায়; সকলেরই আকার তেজ ও সাহসিকতা-ব্যঞ্জক, সকলেরই উন্নত বক্ষঃ এবং পূর্ণ কলেবর।

শম্ভুরামকে দর্শনমাত্র সকলেই মৃদুস্বরে "গুরুজীর জয়" শব্দে অভিবাদন করিল; শম্ভুরামও সকলকেই সবিনয়ে সম্মান জানাইলেন। তিনি এক নির্দ্দিষ্ট শিলাখণ্ডের উপর আসনগ্রহণ করিলে পার্শ্বস্থ অরণ্য হইতে প্রথমে রাঘব নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে সম্ভ্রান্তজনোচিত পরিচ্ছদধারী এক যুবা পুরুষকে চারি ব্যক্তি সঙ্গে লইয়া আসিল। যুবা নির্ভীক ও অকাতরভাবে শম্ভুরামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রাঘব সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু যাহারা বন্দীর সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা দূরে সরিল না।

শম্ভুরাম গম্ভীর-স্বরে বন্দীকে বলিলেন, "গভীর রাত্রিকালে অশ্বারোহণে কেন তুমি এ বনে আসিয়াছিলে, আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।

তুমি দৈবাৎ ধরা পড়িয়াছ, এখন আমরা তোমাকে যেরূপ ইচ্ছা দণ্ড দিতে পারি। তুমি যদি অকপটে সত্য কথা বল, তাহা হইলে হয় তো তোমার দণ্ড লঘু হইতে পারে।"

বন্দী হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলেন;—বলিলেন, "আমি জানিতাম না যে, ইহা পাগলের বন। তুমি কে? আমাকে ধরিয়া রাখিতে বা দণ্ড দিতে তোমার কি অধিকার, তাহা আগে শুনিলে তোমার কথার উত্তর দেওয়া আবশ্যক কি না, স্থির করিব।"

রাঘব বলিলেন, "সাবধানে কথা কও। বঙ্গের মাতৃগর্ভস্থ শিশুও ভবানীর দাস ধর্ম্মসংস্থাপক শম্ভুরামের নাম জানে। ইনিই সেই শম্ভুরাম।"

বন্দী আবার উচ্চ হাস্য করিলেন;—বলিলেন, "ঠিক কথা, শম্ভুরাম নামে এক দুর্ব্বৃত্ত দস্যুর প্রসঙ্গ আমি অনেকবার শুনিয়াছি। সেই ডাকাইতকে কোন সময়ে ধরিতে পারিলে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিতে হইবে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আজি সেই ডাকাইতের আড্ডা চিনিতে পারিলাম। শম্ভুরাম! তুমি রাজবিদ্রোহী, ধর্ম্মদ্বেষী, প্রজার সর্ব্বস্বলুণ্ঠনকারী দস্যু। তুমি ভবানীর দাস অথবা ধর্ম্মের সংস্থাপক কবে হইলে?"

চারিদিকে গভীর বিরক্তিসূচক একটা অব্যক্ত ধ্বনি উঠিল। তৎক্ষণাৎ বন্দীকে খণ্ড খণ্ড করিবার নিমিত্ত অনেকের বাসনা হইল।

শম্ভুরাম বলিলেন, "তুমি আমার প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞার কথা কহিলে আমি ক্ষুণ্ণ হইব না। বুঝিতেছি, তুমি রাজপরিবারভুক্ত কোন লোক। যাহারা রাজ-সংসৃষ্ট, তাহারা চিরকালই আর কাহারও স্বাধীনতা সহ্য করিতে পারে না। রাজা নাম ধারণ করিয়া যাহারা প্রজার

হিতাহিত অন্বেষণ করে না, রাজ্যের কোন সংবাদ রাখে না, অকাতরে প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে ক্ষান্ত হয় না, নিরীহ প্রজার জাতিধর্ম্ম নাশ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না, তাহারা পাষণ্ড। সেই অত্যাচারী নরাধমদিগের হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করাই শম্ভুরামের ব্রত। সুতরাং তাহাদিগের বিচারে শম্ভুরাম ধর্ম্মদ্বেষী, রাজদ্রোহী এবং দুরাচার। কিন্তু তোমার ন্যায় ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথা কহিতে আমার সময় নাই। আমি ক্রোধের বশবর্ত্তী নহি; তাহা হইলে আমার এই লোকেরা এতক্ষণ তোমাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিত। আমি আবার তোমাকে বলিতেছি, তুমি সরলভাবে কথা কহিলে হয় তো তোমার শাস্তি অপেক্ষাকৃত লঘু হইতে পারে।"

বন্দী বলিলেন, "দেখিতেছি, তুমি ডাকাইতের মধ্যে বড়ই দুর্দ্ধর্ষ। তোমার মত বুদ্ধিমান্ ডাকাইত আমি ইহার পূর্ব্বে আর দেখি নাই। আমার প্রতি কোনরূপ রূঢ় ব্যবহার করিলে যে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ; সেই জন্য তুমি কৌশলে আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখিতেছ। তুমি যদি আমাকে ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাট, তাহা হইলেও আমি তোমার ন্যায় ইতর ব্যক্তির নিকট কখনই কোন কথা বলিব না।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে আমি বলি না। আপাততঃ তুমি বন্দী, যতক্ষণ আমার সন্তোষ না হয়, ততক্ষণ তোমাকে এই বনমধ্যে কালপাত করিতে হইবে।"

তাহার পর ইঙ্গিতে রাঘবকে ডাকিয়া শম্ভুরাম তাঁহার কর্ণে অস্ফুট-স্বরে অনেক কথা বলিলেন; আবার বন্দীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "তুমি যেই হও, আপাততঃ এই ভাবেই এই স্থানে তোমাকে থাকিতে

হইবে। কত দিন তোমার এইরূপ দুর্গতি চলিবে, কখনও তোমার এ দুর্দ্দশার অবসান হইবে কি না, তাহা আমি এখন বলিতে পারি না। রক্ষিগণ! এই বন্দীকে সাবধানে রাখিবে। আবশ্যক হইলে ইহার চরণও বাঁধিয়া দিবে; কিন্তু ইহার সহিত অন্য কোনরূপ মন্দ ব্যবহার করিবে না। ইহার আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিবে। আপাততঃ এ ব্যক্তি কারাগারে থাকিবে। ইহাকে লইয়া যাও।"

বন্দীকে লইয়া রক্ষিগণ প্রস্থান করিল। তখন শম্ভুরাম অনুচরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বোধ হয়, আজি রাত্রিতে আমাদিগকে ভয়ানক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। সকলে সাবধান থাকিবে, এক্ষণে তোমরা আপন আপন স্থানে যাইতে পার।"

লোকেরা পুনরায় আন্তরিক সম্মান জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিল। কেবল রাঘব সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শম্ভুরাম তাঁহাকে বলিলেন, "এই ব্যক্তি মানভূম-রাজের প্রথম পুত্র বলেন্দ্র সিংহ। এই ব্যক্তি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সাহসী ও সচ্চরিত্র। ইহার বৃদ্ধ পিতা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও পাপাচারী। ইহার কনিষ্ঠও ঘোর দুষ্ক্রিয়াসক্ত। মানভূমরাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত আমাদের কোন আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। সে সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র এই বলেন্দ্র সিংহ। কিন্তু কনিষ্ঠ বীরেন্দ্র সিংহ ইহার প্রবল শত্রু। বলেন্দ্র যুবরাজ এবং ন্যায়তঃ সিংহাসনের অধিকারী হইলেও বীরেন্দ্র ইহাকে দূর করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছে। এই যুবাকে সাবধানে রক্ষা করিবে। ইহার সহিত আত্মীয়তা-স্থাপনের চেষ্টা করিবে, উত্তরকালে যাহাতে এই যুবা সিংহাসনের অধিকারী হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে।"

রাঘব বলিলেন, "আমাদিগের প্রতি এ ব্যক্তি বড়ই অসন্তুষ্ট। ইহার কথা শুনিয়া বোধ হয় না যে, আমাদিগের সহিত ইহার কোনরূপ আত্মীয়তা ঘটিবে।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তুই এক দিন ব্যবহার দ্বারা ইহাকে সন্তুষ্ট কর, আমাদিগের অভিপ্রায় ও কার্য্যপ্রণালী ইহাকে বুঝাইয়া দেও, তাহা হইলে অবশ্যই এই রাজপুত্র অসন্তোষের ভাব পরিত্যাগ করিবে। সম্প্রতি দেশের রাজারা আমাদিগকে সাধারণ দস্যু বলিয়াই জানে, সুতরাং এ ব্যক্তির সেরূপ কথায় কোন দোষ হয় নাই।"

রাঘব এই উদার-বাক্যের মর্ম্ম প্রণিধান করিলেন;—বলিলেন, "যে আপনাকে দেখিয়াছে, আপনার সহিত একটিও কথা কহিয়াছে, তাহাকে নিশ্চয়ই আপনার প্রেমে বদ্ধ হইতে হইবে। আমি আপনার অভিপ্রায়মত কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব।"

শম্ভুরাম কিয়ৎকাল রাঘবের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; পরে বলিলেন, "তুমি এখনও ছেলেমানুষী ছাড় নাই। বাঘ মারিতে গিয়া গায়ে দাগ করিয়াছ। বেদনাটা আজ কেমন আছে?"

রাঘব একটু লজ্জিতভাবে বলিলেন, "সামান্য একটা বাঘ মারিতে গিয়া গায়ে নখের দাগ হওয়া বড়ই লজ্জার কথা বটে।"

শম্ভুরাম আবার বলিলেন, "চরেরা কোথায়? তাহাদিগকে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে রাখিয়া দিবে। আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু এখন সময়ে কুলায় না; একবার মার মন্দিরে যাইতে হইবে। তাহার পর আমাদিগের সকল লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া দেখা করিতে ইচ্ছা করি। বৈকালে কতকগুলি নিরন্ন ব্যক্তির সাহায্য পাঠাইবার ব্যবস্থা

করিতে হইবে। সামান্য ব্যয়ের অভাবে বীরভূম আর বর্দ্ধমানের কতকগুলি ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন হইতেছে না, তাহার উপায় করিতে হইবে। একটা দুষ্ট লোক প্রতারণা করিয়া এক ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, তাহার একটা প্রতীকার করিতে হইবে। টাকা আমা-দিগের তহবিলে কত আন্দাজ মজুত আছে?"

রাঘব বলিলেন, "দুই হাজারের অধিক নয়।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "আরও অনেক টাকার প্রয়োজন হইবে। সেজন্য আপাততঃ নগরের রাজাকে পত্র লিখিলে হয় না? সে বড়ই দুর্দ্দান্ত এবং অত্যাচারী, তাহাকে শাসন করা আবশ্যক হইয়াছে। সে জন্য প্রথমে তাহার দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করায় ক্ষতি কি?"

রাঘব বলিলেন, "উত্তম, আমি এই মর্ম্মে আজি তাঁহাকে পরোয়ানা পাঠাইতেছি।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তবে এখন আইস। আজি রাত্রিতে বোধ হয়, আমার বাহিরে যাওয়া ঘটিবে না। কারণ, সাবধানতার অনুরোধে এখানে থাকাই উচিত।"

উভয়ে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তখন বেলা প্রায় দেড় প্রহর। রাঘব আপনার নির্দ্দিষ্ট কুটীরাভিমুখে গমন করিলেন, আর শম্ভুরাম হাসিতে হাসিতে রঙ্গিলার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মায়ের মন্দিরে যাইবে না?"

রঙ্গিলা বলিলেন, যদি দাসীকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে যাইব কিরূপে? তুমি সকল কথা আমাকে বলিতেছ না কেন? কাল রাত্রি হইতে আমি চিন্তায় ছট্‌ফট্ করিতেছি।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিন্তার কোন কারণ নাই। একটা রাজপুত্র বিপদে পড়িয়া এই বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, শত্রুভাবে সে আইসে নাই। তাহারই অশ্বপদ-শব্দ শুনিয়া তোমরা চিন্তিত হইয়াছিলে। লোকটা ধরা পড়িয়াছে, এখন বন্দী-ভাবে আছে। শত্রুভাবে সে আইসে নাই, সুতরাং আপাততঃ তাহাকে কোন দণ্ড দিবার প্রয়োজন নাই। ইহার মধ্যে চিন্তার কথা কোথায় আছে রঙ্গিলা?"

রঙ্গিলা জিজ্ঞাসিলেন, "রাজপুত্রের কি করিবে? তোমার এই কারাগারে থাকিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইবে। যদি তাঁহার কোন দোষ না থাকে, তাহা হইলে ছাড়িয়া দিলেই ভাল হইত না?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "অসম্ভব, আমাদিগের এই ধর্ম্মবন সে চিনিয়াছে, আমাদিগকে সে দেখিয়াছে। তাহার পিতা আমাদিগের প্রধান শত্রু। মুক্তি পাইলেই সে পিতাকে আমাদিগের সকল সন্ধান জানাইতে পারে। এ অবস্থায় সহজে তাহাকে ছাড়িতে পারা যায় না।"

রঙ্গিলার মুখ বিষণ্ণ হইল;—বলিলেন, "তবে কি তাঁহাকে যাবজ্জীবন বন্দীভাবে এখানে থাকিতে হইবে?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "না রঙ্গিলা, তাঁহার সহিত একটা ব্যবস্থা করিব, তাহার পর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব। আমি মাতৃচরণে প্রণাম করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি, পুষ্প-চন্দনাদি সংগ্রহ কর, আমি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি।"

শম্ভুরাম প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া রঙ্গিলার সহিত দেবদর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। এই ধর্ম্ম-বনের এক-

দেশে শৈল-নিম্নে নির্ঝরিণীর পার্শ্বে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে পাষাণময়ী কালিকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। দেবীর রূপে সন্নিহিত স্থান সকল শোভা-ময় হইয়াছে, এবং তাঁহার প্রতাপে সেই প্রদেশ সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। বিবিধ পুষ্পে মায়ের চরণ আচ্ছন্ন রহিয়াছে। অদূরে এক বিপ্র বসিয়া অতি মধুর-স্বরে দেবীর স্তবপাঠ করিতেছেন। বিপ্র দীর্ঘকায়, জটাজূটধারী এবং তাঁহার দেহের নানা স্থানে রুদ্রাক্ষমালিকা বিভূষিত।

ভক্তিপরিপ্লুত-হৃদয়ে শম্ভুরাম ও রঙ্গিলা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র স্তোত্রপাঠে ক্ষান্ত হইলেন।

শম্ভুরাম ও রঙ্গিলা একসঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হইয়া অনেকক্ষণ মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন; তাহার পর তত্রত্য ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা উঠিয়া বসিলেন। তখন শম্ভুরাম যুক্তকরে বলিলেন, "মা জগদম্বে! তুমি যাহাতে নিযুক্ত করাও, তাহাই করি। দেশ অত্যাচারে, অধর্ম্মে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাই ক্ষুদ্র জীবকে তুমি দেশ-উদ্ধারে নিযুক্ত করিয়াছ। কিন্তু দেবি! এই অধমের—এই অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সে মহদ্‌ব্রত সম্পন্ন হইবে কি? আমার কিছুই প্রার্থনা নাই, আমি রাজ্য চাহি না, ধন চাহি না, সম্মান চাহি না; যথাকালে একমুষ্টি অন্ন আমার জীবনধারণের নিমিত্ত মাত্র আবশ্যক। আমি পর্ণ-কুটীরে তৃণশয্যায় শয়ন করি, তাহার অপেক্ষা আর কোন ভোগেই আমার বাসনা নাই। তুমি দয়া করিয়া রঙ্গিলাকে আমার সহধর্ম্মিণী করিয়া দিয়াছ, তোমার এই সেবিকা হৃদয় হইতে ভোগবাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছে। বল মা, বল শুভে! দেশের অরাজকতা নিবারণ করিতে আমরা

সক্ষম হইব কি? অধর্ম্মের স্রোত নিরুদ্ধ করিতে আমরা কৃতকার্য্য হইব কি? দেশে শান্তি সংস্থাপন করিতে আমরা সমর্থ হইব কি? সাধনা জানি না, উপাসনা জানি না, জানি কেবল তোমার ঐ রাজীব-চরণ। আমরা দুইটি স্বতন্ত্র জীব হইলেও তোমার ব্যবস্থায় এক হইয়াছি। মা, কৃপা করিয়া এই কর যেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এইরূপ এক হইয়া তোমার চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি।"

আবার দম্পতী সেই স্থানে পূর্ব্ববৎ প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের চক্ষুতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। তখন সেই বিপ্র মাতার আশীর্ব্বাদী ফুল লইয়া দম্পতীর হস্তে প্রদান করিলেন। তাঁহারা উভয়েই তাহা মস্তকে ধারণ করিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণ উভয়ের হস্তে চরণামৃত প্রদান করিলে,তাঁহারা সেই চরণামৃত পান করিয়া ধন্য হইলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভবানী তোমার প্রতি প্রসন্ন রহিয়াছেন। যত দিন তোমার সম্প্রদায়ে শঠতা প্রবেশ না করিবে, তত দিন তাঁহার কৃপার লাঘব হইবে না। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা দেবকার্য্যে সমভাবে উৎসাহশীল থাক।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদই আমাদিগের অবলম্বন। দেবীর আদেশ আপনার মুখেই ব্যক্ত হয়। আপনার বাক্যই দেববাক্য। যাহা আপনারা করাইবেন, ক্ষুদ্র শম্ভুরাম তাহাই করিবে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রশান্তচিত্তে শম্ভুরাম ও রঙ্গিলা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

অতি অল্পকালের মধ্যে রঙ্গিলা অন্নপাক করিলেন। অতি নিকৃষ্ট তণ্ডুলের মোটা মোটা লাল রঙ্গের ভাত হইল। এক প্রকার বন্য মূল এবং ঈষৎ অম্লরসযুক্ত এক প্রকার বনের ফল সেই অন্নের সহিত সিদ্ধ করা হইয়াছিল; এই উপকরণের সাহায্যে শালপাতের উপর শম্ভুরাম পরিতোষ সহকারে ভোজন করিলেন, মৃৎভাণ্ডে জল পান করিলেন, তাহার পর হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া তিনি একটু দূরে একটি গাছে হেলান দিয়া বসিলেন। তখন রঙ্গিলা স্বামীর প্রসাদ ভোজন করিলেন। ভোজনসমাপ্তির পর স্থান মার্জ্জন করিয়া ও মৃৎপাত্রাদি যথাস্থলে রাখিয়া রঙ্গিলা স্বামীর নিকটস্থ হইলেন।

তখন শম্ভুরাম নয়ন মুদিয়া চিন্তা করিতেছিলেন।—"আপনার পত্নীতে মনুষ্য কেন পরিতুষ্ট থাকিতে পারে না? কেন তাহারা পরনারীর লোভে সংসারে ঘোর অনর্থের উদ্ভাবন করে? কেন মনুষ্য আপন অবস্থায় পরিতুষ্ট না থাকিয়া পরের সম্পত্তিলাভের নিমিত্ত লুব্ধ হয়?—মনকে প্রসন্ন রাখিতে পারিলে সকল অভাব মিটিয়া যায়। মন কামনা-বিহীন না হইলে কুবেরের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারে না। এ সংসারে আমার কিছুই নাই। আমার অনুগত অনেকেই আমার অপেক্ষা বিত্তবশালী। তাহাদের ধনরত্ন আছে, বসন-ভূষণ আছে এবং আহার-নিদ্রার সুব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমার এই পাতার ঘর, মাটীর ভাণ্ড, কদর্য্য অন্ন, অতি সামান্য বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারি,

আমার অনুগত সকল লোকের অপেক্ষা আমি সুখী। তাহাদিগের হিংসা আছে, ক্রোধ আছে,' অধিক বস্তুলাভের নিমিত্ত কামনা আছে, প্রাণে অনেক আকাঙ্ক্ষা আছে; সুতরাং তাহারা সদাই অসুখী। তাহাদিগের নিত্য অভাব ও অভিযোগ।"

আবার শম্ভুরামের মনে হইল, 'তাহাদের স্ত্রী-পুত্র আছে, ভালবাসা ও স্নেহের বন্ধন আছে, কিন্তু রঙ্গিলা নাই। বহু জন্মের পুণ্যফলে আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির ভাগ্যে এই দেব-দুর্ল্লভ রত্ন মিলিয়াছে। মা কালী আমাকে দেশোদ্ধার-ব্রত গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন; রঙ্গিলা ও রাঘব সেই ব্রত-পালনের সহায়। রঙ্গিলা আমার প্রাণ, রাঘব আমার দেহের শক্তি; রঙ্গিলা আমাকে ব্রত-পালনে মাতাইয়া দেয়, রাঘব আমাকে কর্ত্তব্য-সাধনের উপায় করিয়া দেয়। রঙ্গিলা প্রাণের মধ্যে ঝটিকা উৎপাদন করে, রাঘব দেহ আলোড়িত করিয়া তুলে। দুই জনে এই ব্রতের পূর্ণ-সাধক; তাহাদিগের সহায়তায় এই ব্রতে আমি সিদ্ধি লাভ করিব, ইহাই ভবানীর অভিপ্রায়। যদি তাহাদের একজনও কখন আমার আনুগত্য ত্যাগ করে, যদি কখন তাহাদের একজনও অবিশ্বাসী হয়, যদি কখন তাঁহাদের একজনও কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হয়, তাহা হইলেই ব্রত নিষ্ফল হইবে। ইহাই জগদম্বার আদেশ।'

শম্ভুরামের আবার মনে হইল,—'দেবীর আদেশের অন্যথা কখনও ঘটিতে পারে না। সুতরাং দেশের কল্যাণসাধন অবশ্যই হইবে। প্রাণের রঙ্গিলা ও রাঘব ভিন্ন আমার কিছুই নাই। দেশের মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত আমি এ তিনকেই বিসর্জ্জন দিতে পারি; এ তিনই আমার সহিত অভিন্নভাবে জড়িত। যখন প্রাণ যাইবে, তখন রঙ্গিলা-রাঘবও যাইবে, যখন

রাঘব যাইবে, তখন শম্ভুরাম-রঙ্গিলাও যাইবে, আর যখন রঙ্গিলা যাইবে, তখন শম্ভুরাম-রাঘব যাইবে। এ তিনের অচ্ছেদ্য সুদৃঢ় বন্ধন। কেহ অবিশ্বাসী হইবে না, কেহ কর্ত্তব্য-বিমুখ হইবে না, দেশের মঙ্গল অবশ্য ঘটিবে।'

এইরূপ সময় নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে রঙ্গিলা আসিয়া বিশ্রামশীল শম্ভু-রামের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শম্ভুরাম তখনই নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "কত দিন হইয়া গেল, কিন্তু ভবানীর আদেশমত কার্য্য এখনও শেষ করিতে পারিলাম না। দেশে অত্যাচারের স্রোত সমানই চলিতেছে। বল রঙ্গিলা, জীবনান্ত হওয়ার পূর্ব্বে মার কষ্ট-নিবারণ করিতে পারিব না কি?"

রঙ্গিলা বলিলেন, "কেন পারিবে না? পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় আর কত হইবে? এখনই তোমার নামে পাপীদিগের হৃৎকম্প হইতেছে, অনেকেই প্রচ্ছন্নভাবে পাপের অনুষ্ঠান করিতেছে। আর পাঁচ বৎসর এইরূপ উৎসাহে কার্য্য করিলে তোমার বাসনা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "জানি না, কি হইবে; তুমি আর রাঘব আমার সহায়। আমি তোমাদিগের যন্ত্র-চালিত পুত্তলি। রাঘবেরও বিশ্বাস, নিশ্চয়ই বাসনা সুসিদ্ধ হইবে। তুমি এ অবস্থায় সুখে আছ কি রঙ্গিলা?"

রঙ্গিলা বলিলেন, "এত দিন পরে এ প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ গুরুদেব? আমার ন্যায় সুখী এ জগতে আর কে আছে? তোমার মত ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ যাহার স্বামী, রাঘবের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ দেবতা যাহার ভাই, তাহার অপেক্ষা সুখী জগতে কে হইতে পারে? তুমি রাজা। অনেক ভূস্বামী, অনেক প্রবল-পরাক্রান্ত ব্যক্তি তোমার ইঙ্গিতে বিচলিত

হয়। অনেকে তোমায় নির্দ্ধারিত কর দিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করে; অনেকে তোমার আদেশ অবনত-মস্তকে পালন করে; সুতরাং তোমার অপেক্ষা মহদ্‌ব্যক্তি এ দেশে এখন আর কেহ নাই। কত কালের পুণ্যে, কত জন্মের সাধনায় আমি নারী হইয়া তোমার মত দেবতা স্বামী লাভ করিয়াছি।”

শম্ভুরাম বলিলেন, “কিন্তু রঙ্গিলা, অনেকেই তো আমাকে ডাকাইত বলে; দেশের সম্মানিত লোকেরা আমাকে নির্দ্দয় দস্যু বলিয়া মনে করে। তুমি ডাকাইতের পত্নী।”

রঙ্গিলা ঘৃণা-সূচক হাসির সহিত বলিলেন, “যাহারা নরাধম, যাহারা ধর্ম্মের মর্য্যাদা জানে না, যাহারা পাপ ভিন্ন সদনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য বুঝে না, যাহারা জীবনে স্বার্থান্বেষণ ও ভোগসুখ ব্যতীত আর কিছুরই অনুষ্ঠান করে না, তাহারা অবশ্যই তোমার ন্যায় দেবতাকে ডাকাইত বলিবে। তাহাতে তোমার গৌরবেরই বৃদ্ধি হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ করিতে পার যে, দেশের ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মারা, হৃদয়বান্ বিজ্ঞ জনেরা তোমাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, তোমাকে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা উপহার দিয়া অর্চ্চনা করেন। ইহার কোন্‌টি অধিক গৌরবাত্মক গুরু? পাপীর নিন্দা অথবা পুণ্যাত্মার প্রশংসা এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রার্থনীয়? রাজা! আমি ডাকাইতের পত্নী! ভবানী করুন, ধর্ম্মদ্বেষী দুরাচারগণের এই নিন্দা আমি যেন চিরদিন ভোগ করিতে পাই। আমার রাজা নিস্ব, আমার রাজা ভিক্ষুকের অপেক্ষা দরিদ্র; কিন্তু কি সৌভাগ্য, যিনি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই রাজরাজেশ্বরের ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়া ভোগ-বিলাসের সাগরে সন্তরণ করিতে

পারেন, তিনি কপর্দ্দক-হীন, অন্ন-বস্ত্র-বিহীন, আশ্রয়-স্থান-শূন্য, কি পুণ্য, কি গৌরবের পরিচয়, কি মাহাত্ম্যের নিদর্শন! ভবানি! দাসীর প্রতি তোমার কি দয়া! তুমি এইরূপ মহাপ্রাণ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চরণ-সেবার অধিকারিণী করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছ।”

শম্ভুরাম যাহা জানিতেন, যাহা বারংবার শুনিয়াছেন, আজ আবার তাহাই বুঝিলেন। মনে মনে বলিলেন, “মা জগদম্বে! ব্রতপালনের এমন সহায় কখনও কোন ভক্তকে দেও নাই। তোমার অনুকম্পা লাভ করিয়াছি। হৃদয়ে এই দেবী, বাহ্যে সর্ব্বগুণময় রাঘবকে পাইয়াছি। ইহাতেও যদি ব্রত অপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শম্ভুরাম অযোগ্য, শম্ভুরাম ঘৃণিত, শম্ভুরাম নরকের কীট।” প্রকাশ্যে বলিলেন, “রঙ্গিলা! আমি এখন এই ধর্ম্ম-কাননের অনেক স্থান পরিদর্শন করিব। তুমি কি করিবে?”

রঙ্গিলা বলিলেন, “ছায়ার ন্যায় আমি সঙ্গে থাকিব; তোমার যুদ্ধাদি কার্য্যে সঙ্গিনী হইতে দাসীর অধিকার নাই। কিন্তু যখন তোমার সাংসারিক কার্য্য, যখন আশ্রিত-বাৎসল্যের পরিচয়, যখন তোমার ধর্ম্ম-কানন-পরিদর্শন, তখন সেবিকা সঙ্গে থাকিবে না কেন?”

তখন শম্ভুরাম ও রঙ্গিলা সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। শম্ভুরাম কত দিন হইতে কি কারণে দেশের পাপ-প্রবাহ নিরুদ্ধ করিতে, অত্যাচারের স্রোত মন্দীভূত করিতে এবং দেশমধ্যে ধর্ম্ম ও শান্তি স্থাপন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। এই বিশাল অরণ্যের নানা স্থানে তিনি নানারূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহার একদেশে তাঁহার আরাধ্যা কালিকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, অন্যত্র তাঁহার বিশ্বস্ত সঙ্গিগণের

বাসস্থান, অন্য স্থানে তাঁহার বিচারালয়, অন্যত্র তাঁহার কারাগার, একদেশে তাঁহার অশ্বশালা, এক স্থানে কোষাগার, এক স্থান তাঁহার ও রঙ্গিলার অবস্থানের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট, তাহারই অব্যবহিত পার্শ্বে রাঘবের বাসস্থান।

প্রথমে শম্ভুরাম সামান্যভাবে স্বকীয় বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য দ্বারা লোকের দুঃখ নাশ করিতেন; তাঁহার এই সাধু চেষ্টা সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ই বিত্তশালিগণের নিকট হইতে ছলে, কৌশলে বা বলে তাঁহাকে ধন সংগ্রহ করিতে হইত। সেই সময় হইতে শম্ভুরাম ডাকাইত নামে পরিচিত। ডাকাইত শম্ভুরামের অলৌকিক সাহস, অসাধারণ বীর্য্য, একান্ত ত্যাগস্বীকার, নিরতিশয় পরদুঃখকাতরতা এবং দেবোপম সদ্বিবেচনা দেখিয়া দেশীয় অনেকেই তাঁহার পক্ষপাতী হইতে থাকেন। সেই সময় রাঘব তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন এবং সর্ব্বত্যাগী হইয়া শম্ভুরামের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া দেশহিতব্রত গ্রহণ করেন। তদবধি রাঘব স্বকীয় অসাধারণ গুণে শম্ভুরামের একান্ত প্রেমপাত্র, সর্ব্বথা বিশ্বাসভাজন এবং সর্ব্বকার্য্যে দক্ষিণহস্তস্বরূপ।

দয়াময় শম্ভুরাম যখন ডাকাইতরূপে পরিচিত, একাকী কেবল নিজের বুদ্ধি, বীর্য্য ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়া যখন তিনি লোকহিতসাধনে রত, তখন পিতৃ-মাতৃ-হীনা দুঃখিনী রঙ্গিলার ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। বালিকা দেবতা-জ্ঞানে শম্ভুরামের ভক্ত হইয়া পড়ে। লতা যেরূপ বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরে, গন্ধ যেরূপ বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়, ছায়া যেরূপ পদার্থের সঙ্গিনী হয়, প্রতিধ্বনি যেরূপ ধ্বনির অনুগামী হয়, সেইরূপ রঙ্গিলা শম্ভুরামের অবিচ্ছিন্না সহচরী হইয়া পড়ে। শম্ভুরামও এই বালিকার সরলতা, একপ্রাণতা এবং তন্ময়তায় বিহ্বল হইয়া যান।

দেবীর আদেশে দেব-সেবক বিপ্র এই উভয়কে পবিত্র বিবাহ-সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছেন। তদবধি রঙ্গিলা ভূতলে স্বর্গের আনন্দ অনুভব করিতেছেন আর সেই কর্ম্মবীর অশেষ চিন্তারত শম্ভুরাম পরম সুখী হইয়াছেন। যে অসাধ্য-সাধনার্থী মহাপুরুষের পশ্চাতে প্রেমের বন্ধন না থাকে, যে কর্ম্মময় মহাত্মার প্রাণ ব্যক্তিবিশেষের ভালবাসায় ডুবিয়া না থাকে, যে উচ্চাভিলাষী বীরের হৃদয় কুত্রাপি আসক্তির আকর্ষণে বদ্ধ না থাকে, বুঝি বা তাহার দ্বারা উচ্চকার্য্য—মহদ্‌ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে না। তাই বুঝি, সনাতনী আদ্যাশক্তি এই কর্ম্ম-সন্ন্যাসীর হৃদয়ে এই প্রেমময়ীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বুঝি বা প্রেম-বন্ধনের সহিত কর্ম্মাসক্তির কিরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত জগন্মাতা কার্য্য ও প্রেমের এই অদ্ভুত সম্মিলন ঘটাইয়াছেন। প্রেম কর্ত্তব্য প্রণোদিত করে, কখন প্রতিবন্ধকতাচরণ করে না। যিনি ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসিতে জানেন, তিনিই জগতের বন্ধু। যিনি বিশ্বরূপ জগন্নাথ, তিনিও শ্রীরাধিকার প্রেম-সাগরে মগ্ন; যিনি সর্ব্বত্যাগী পরম সন্ন্যাসী, সেই মহাদেব মহেশ্বর ভগবতী আদ্যাশক্তির প্রেমসুধায় সতত বিহ্বল।

ক্রমে ক্রমে শম্ভুরামের দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল; অনেকেই তাঁহাকে দেবতার কৃপাভাজন বুঝিয়া তাঁহার অনুচর হইল। অনেকেই তাঁহার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব প্রণিধান করিয়া, তিনি গৌরবান্বিত হইবেন বুঝিয়া তাঁহার চরণে আত্মোৎসর্গ করিল; তাঁহার আজ্ঞায় প্রাণ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। শম্ভুরাম নির্দ্ধারিত ব্যক্তিগণকে পরিবারাদি সহ আনিয়া নিজাশ্রয়ে রাখিলেন; সকলকেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করিলেন। সকলেই ধর্ম্মপ্রাণ ও দেবভক্ত হইল। এইরূপ

শতাধিক ব্যক্তি শম্ভুরামের এই ধর্ম্মকাননে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে লাগিল।

শম্ভুরামের এই ধর্ম্মারণ্য বহু-লোক-পূর্ণ হইলেও বাহির হইতে তথায় যে মনুষ্য বাস করে, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন সুগম পথ ছিল না; কেবল অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত পথ নির্দ্ধারণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে কাহারও সাধ্য ছিল না। কিন্তু বনবাসী তাবতেই এই ঘনারণ্যমধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিত এবং আবশ্যক হইলে অনায়াসে বন অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে পারিত।

শম্ভুরামের সুব্যবস্থায় অরণ্যবাসী বীরগণের ও তন্মধ্যে যে যে ব্যক্তির স্ত্রী-পুত্রাদি আছে, তাবতের নিমিত্ত যথাসময়ে অন্ন-বস্ত্রাদির আয়োজন হইত। কোন বিষয়েই কেহ কোন অভাব বা ক্লেশ অনুভব করিত না। বীরগণের নিমিত্ত অস্ত্র-শস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল। বনবাসিনী নারীগণও বীরত্ব-বিমুখ ছিল না।

অদ্য রঙ্গিলা ও শম্ভুরাম নানা স্থান পরিভ্রমণ করিলেন; সকল স্থানের লোকেরাই তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। নারীগণের সহিত রঙ্গিলা মধুরালাপ করিলেন; শিশুগণকে তিনি ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন; সকলের সহিত আনন্দ-কৌতুক ও রহস্য করিলেন। বীরগণের সহিত শম্ভুরাম আলাপ করিলেন, অনেককে অনেক পরামর্শ জানাইলেন, অনেককে আজিকার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। রঙ্গিলাকে সকলে রাণী বলিয়া সম্ভাষণ করিল; গো-শালা ও অশ্ব-শালা পর্য্যবেক্ষণ করা হইল। কতকগুলি অশ্ব শম্ভুরামের অতিশয়

প্রিয় ; তাহাদিগের পৃষ্ঠে পর্য্যাণ স্থাপন করিয়া আদেশমাত্র যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। লাল নামে শম্ভুরামের প্রিয় অশ্ব বিশেষ আদর পাইল ; কিন্তু লালের পরিচয় পরে প্রদত্ত হইবে ; এক্ষণে সে কথার আর প্রয়োজন নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রঙ্গিলা আরতি দেখিতে ইচ্ছা করিলেন।

তখন শম্ভুরাম ও রঙ্গিলা পূর্ব্বকথিত দেবস্থান উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যেই রাঘবের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন রাঘব সস-ম্ভ্রমে শম্ভুরামকে প্রণাম করিলেন। শম্ভুরাম তাঁহাকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিলেন।

রঙ্গিলা নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "এই যে দাদা! তুমি ঔষধ খুলিয়া ফেলিয়াছ? দেখি, তোমার কিরূপ আঘাত লাগিয়াছিল?"

অতীব আগ্রহের সহিত রঙ্গিলা রাঘবের হস্ত ধারণ করিলেন। আশ্চর্য্য ঔষধের আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় স্বল্পকালমধ্যে রাঘবের ক্ষত-সমূহ কেবল চিহ্নমাত্রে পরিণত হইয়াছে ; নবজাত চর্ম্ম ও মাংসের অঙ্কুর সুস্পষ্টরূপে উত্থিত হইতেছে। রঙ্গিলার করস্পর্শে রাঘব বিচলিত হইলেন ; তিনি তত্রত্য বৃক্ষবিশেষে মস্তক ন্যস্ত করিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইলেন। রঙ্গিলা বলিলেন, "এ কি দাদা! তোমার হাতে কি ভয়ানক বেদনা আছে? তুমি শিহরিলে কেন? ঘা তো পূরিয়া গিয়াছে ; দেখিতেছি, বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল ; কে ঔষধ খুলিয়া দিয়াছে দাদা?"

রাঘব বলিলেন, "আপনি খুলিয়াছি, বেদনা সারিয়া গিয়াছে। হঠাৎ মাথাটা ঘুরিয়া উঠিয়াছে, কোন ভয় নাই।"

রঙ্গিলা বলিলেন, "ঔষধ খুলিবার সময় আমাকে স্মরণ কর নাই কেন?

দাদার কষ্টের সময় ভগ্নী যদি সাহায্য না করে, তাহা হইলে সেরূপ ভগ্নী থাকায় লাভ কি? ঘা ধুইয়া দিতে আমাকে আজি ডাক নাই কেন দাদা?"

রাঘব বলিলেন, "কোন দরকার হয় নাই। সামান্য বিষয়ের জন্য তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি নাই।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "হঠাৎ তোমার মাথা ঘূরিয়া উঠিল কেন? বোধ হয়, অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ে শরীর দুর্ব্বল হইয়াছে। রাত্রিতে তোমার অনেক ভয়ানক প্রয়োজন ঘটিতে পারে। এরূপ সময়ে শারীরিক দুর্ব্বলতা বড়ই চিন্তার কথা।"

রাঘব বলিলেন, "কোনই চিন্তার কারণ নাই; আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনার চরণ-কৃপায় একাকী শত যোদ্ধার সম্মুখীন হইতে পারি। ক্ষতস্থানে একটা চামড়া জড়াইয়া রাখিলেই কোন অসুবিধা হইবে না।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তবে আইস, মায়ের আরতি দেখিতে যাই।"

শম্ভুরামের সহিত অনেক পরামর্শ করিতে করিতে দেবস্থানের উদ্দেশে রাঘব অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রঙ্গিলা তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ক্ষতস্থান-সমূহ রাঘব মৃগচর্ম্ম দ্বারা আবৃত করিয়াছেন। ধনুর্ব্বাণ, চন্দ্রহাস ও অসি তাঁহার শরীরের যথাযথস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। এক অতি বলশালী অশ্ব তাঁহার নিমিত্ত অশ্বশালার বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। গভীর রাত্রিতে রাঘব সেই অশ্বশালার সমীপদেশে একাকী দণ্ডায়মান। বহু-লোকাধিকৃত এই ধর্ম্মকানন তখন নিস্তব্ধ, তন্মধ্যে কুত্রাপি যে মনুষ্য বিদ্যমান আছে, ইহা বুঝিবার সম্ভাবনা নাই।

তখন জ্যোৎস্নালোকে সমগ্র ধর্ম্ম-কানন আলোকিত। শীতল দক্ষিণানিল ধীরে ধীরে প্রবাহিত। তখন স্বর্ণবর্ণ-রঞ্জিত দৃশ্যাবলী অতি রমণীয়। কেবল পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর ঝর্ ঝর্ শব্দ এবং মারুতহিল্লোল-চালিত বৃক্ষপত্রের সন্ সন্ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শ্রুত হইতেছে না।

রাঘব উৎকর্ণ ও আগ্রহান্বিত হইয়া সকল শব্দ শ্রবণ করিতেছেন, বৃক্ষাদির সকল গতি লক্ষ্য করিতেছেন; কিন্তু কুত্রাপি সন্দেহের বা আশঙ্কার কোনই কারণ তাঁহার মনে হইতেছে না।

একাকী এই রমণীয় ক্ষেত্রে বহুক্ষণ অবস্থান করার পর রাঘব আপন মনে শিহরিয়া উঠিলেন;—ভাবিলেন, কি লজ্জা, কি ভয়ানক অকৃতজ্ঞতা, কি ঘৃণাজনক অধোগতি! রঙ্গিলার করস্পর্শে আমি শিহরিয়াছিলাম! ছি ছি, হৃদয়ের কি নিন্দনীয় দুর্ব্বলতা! এ দুর্ব্বলতা পরিহার করিব—নিশ্চয়ই হৃদয়কে বলীয়ান্ করিব; অবশ্যই এ অধঃপতন অপনোদিত করিব। না পারি, হৃদয়কে ছিন্ন করিয়া ফেলিব, আপন হস্তে ছুরিকা দ্বারা বক্ষোবিদার করিব।

বাস্তবিকই রাঘবের অধঃপতন হইয়াছে। বাস্তবিকই সেই দেশভক্ত, প্রভুভক্ত, কর্ত্তব্যভক্ত মহাবীর আপনার অন্তরে বিষের বীজ রোপিত করিয়াছেন। সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাঘব আবার ভাবিলেন, "কি রূপ! রঙ্গিলা কি ভুবন-মোহিনী! এমন নবোদিত দিবাকর সদৃশ মধুরোজ্জ্বল বর্ণ মনুষ্যের কখন হয় না, এমন অরুণ-করোদ্ভাসিত ফুল্লনলিনীর ন্যায় শোভা আর কাহারও নাই, এমন আলেখ্য-লিখিত দেবী-প্রতিকৃতির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মাধুর্য্য আর কখন কেহ দেখে নাই। এত সরলতা, এত মিষ্টতা, এত মধুর ভাষা, এত পরদুঃখ-কাতরতা, এত সহৃদয়তা মনুষ্যের হয় না। যে রঙ্গিলাকে আপনার বলিয়া পাইয়াছে, এ জগতে সেই ধন্য! শম্ভুরাম সত্য সত্যই দেবতা; দেবতার সহিত দেববালার সম্মিলন হইয়াছে। আমি অধম শৃগাল; সে দেবভোগ্য পদার্থের প্রতি পাপনয়নে দৃষ্টিপাত করিলে আমাকে নরকস্থ হইতে হইবে।"

অনেকক্ষণ রাঘব অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। মনে হইল, তাঁহার এই পাপ-চিন্তা ভগবান্ দেখিতে পাইতেছেন। আবার মনে মনে বলিলেন, "রঙ্গিলা আমার ভগিনী, আমাকে দাদা বলিয়া ডাকে। কেবল মৌখিক আপ্যায়িতের সম্পর্ক নহে, বাস্তবিকই সে আমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া জ্ঞান করে। তাহার করুণার সীমা নাই; আন্তরিক ভালবাসার পরিমাণ নাই; ইহাই তো যথেষ্ট। সেই গুণবতী দেবীর সহিত এরূপ আত্মীয়তা অপরিসীম সৌভাগ্যের লক্ষণ। তাহাতেই আমি কেন পরিতৃপ্ত হইতে পারি না? ধিক্ আমাকে! ভবানি! আমাকে শক্তি দাও; মা! এই দুষ্প্রবৃত্তি ছিন্ন করিয়া পদদলিত করিতে আমাকে সক্ষম কর!"

ধীরে ধীরে রাঘব অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাঁহার চরণযুগল তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে দেবস্থানে আনয়ন করিল। তখন দেবসেবক ব্রাহ্মণ তথায় নাই। কাষ্ঠরচিত কঠিন বেড়ার দ্বারা তখন দেবীমূর্ত্তির চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত। ব্রাহ্মণ সান্ধ্যারতি-সমাপ্তির কিয়ৎকাল পরে দেবীমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে এই সুদৃঢ় কাঠের বেড়া দিয়া প্রস্থান করেন, আবার মঙ্গল-আরতির পূর্ব্বে আসিয়া তৎসমস্ত দূরে অপসারিত করিয়া থাকেন। দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া রাঘব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; দেখিলেন, বক্রভাবে চন্দ্রকিরণ-সম্পাতে দেবীর সমস্ত কলেবর সমুদ্ভাসিত। রাঘবের বোধ হইল, যেন সেই চিরপরিচিত দেবীমূর্ত্তি আজি ভয়ানক আকার পরিগ্রহ করিয়াছেন; যেন চামুণ্ডা অদ্য সংহারকারিণীরূপে নৃত্য করিতেছেন; যেন সেই বিশ্বেশ্বরী অদ্য বিশ্ব বিনাশ করিবার নিমিত্ত অট্টহাস্য করিতেছেন; তাঁহার করধৃত নৃমুণ্ড, কণ্ঠস্থিত মুণ্ডমালা যেন ভয়ানক আন্দোলিত হইতেছে; তাঁহার মুকুট যেন ক্রোধভরে দুলিতে দুলিতে উন্নত হইতেছে। যেন ডাকিনী ও প্রেতিনীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে করতালি দিতে দিতে নাচিতেছে; যেন দিগম্বরী বিশাল খড়্গ লইয়া জীবকুলকে রসাতলে পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছেন; যেন তাঁহার লেলিহমান রসনা রুধিরপানের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, যেন ভৈরবীর নয়ন হইতে অগ্নিরাশি বিকীর্ণ হইতেছে। নির্ভীক রাঘবের হৃদয় ভয়ে অবসন্ন হইল।

সেই নিস্তব্ধতা-পূর্ণ—সেই মনুষ্যান্তরবিরহিত রমণীয় দৃশ্য যেন তখন ভয়ানকের একশেষ বলিয়া রাঘবের মনে হইল। সেই সর্ব্বশঙ্কাপরিশূন্য জাগ্রত দেবস্থান যেন তখন রাঘবের নয়নে নিতান্ত বিপদ্-সঙ্কুল ভয়ঙ্কর

ক্ষেত্ররূপে অনুভূত হইল। তখন রাঘব ভীতভাবে উভয় হস্তে আপনার মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। অনেকক্ষণ পরে হৃদয়কে অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ করিয়া রাঘব পুনরায় দেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ;—দেখিলেন, পূর্ব্ববৎ উগ্রচণ্ডা-মূর্ত্তি।

বিকলহৃদয় রাঘব তখন অধোমুখে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "বুঝিয়াছি জননি! সন্তান পাপচিন্তায় অপবিত্র হইয়াছে, তাই মা, সে আজি তোমার কৃপায় বঞ্চিত হইয়াছে। দেবি! দয়াময়ি! এ পাপ-চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়া দাও। অধম সন্তানকে রক্ষা কর। নতুবা জগদম্বে। ধর্ম্ম যাইবে, বিশ্বাস যাইবে, দেশহিত-ব্রত যাইবে, সংসার নরক হইবে। মহামায়ে! আমি দীন, তোমার চরণের অধম ন-গণ্য সেবক, আমার প্রতি করুণা কর মা!"

অনেকক্ষণ রাঘব অধোমুখে তদবস্থায় থাকিয়া রোদন করিলেন। আবার তিনি ভক্তি-পরিপ্লুত-হৃদয়ে দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ; দেখিলেন, দেবী যেন দুলিতেছেন ; দেখিলেন, দেবী যেন তাঁহাকে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হইতেছেন ; দেখিলেন, দেবী যেন হস্তান্দোলন করিয়া তাঁহাকে দূরে চলিয়া যাইতে আদেশ করিতেছেন। কাতরভাবে রাঘব বলিলেন, "ছিন্ন কর মা ভগবতি! এ হৃদয় অসির আঘাতে শতভাগে বিভক্ত করিয়া দাও। আমি চলিয়া যাইব না, স্বহস্তে এই অসির আঘাতে তোমার চরণে আপনাকে আত্মবলি দিব। এ পাপ কলুষিত জীবন আর আমি রাখিব না। যিনি আমার গুরু, যিনি সম্প্রদায়ভুক্ত তাবতের গুরু, যিনি ধার্ম্মিক-চূড়ামণি, যিনি দেশের রক্ষক, যিনি অত্যাচারের নিবারক, যিনি ধর্ম্মের নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগী, যিনি মনুষ্য-

রূপে দেবতা, আমি সেই পরমারাধ্য শম্ভুরামের অপরিমিত বিশ্বাসের অপব্যবহার করিতেছি; আমি সেই দেবতার চরণরেণুর অনুপযুক্ত হইয়াও মনে মনে তাঁহার পরমধন হরণ করিবার কল্পনা করিয়াছি। আমি সেই মহামহিমময় মহাপুরুষের দাসানুদাস হইয়াও তাঁহার স্থান অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। জীবনে ও মরণে অনন্তকাল আমাকে এই পাপাগ্নিতে জ্বলিতে হইবে। শান্তিময়ি! কৃপাময়ি! কৃপা করিয়া আমাকে শান্তি দাও, অকৃতজ্ঞ নরাধমের হৃদয়ে পাপান্ধকার দূর করিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আলোক প্রতিষ্ঠিত কর।"

বক্ষে করাঘাত করিয়া রাঘব সেই স্থানে পুনরায় অধোমুখে নিপতিত হইলেন। কতক্ষণ এইরূপ ভাবে অতিবাহিত হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিল, তখন সহসা রাঘবের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত-স্থাপন করিয়াছে। সভয়ে রাঘব উঠিয়া বসিলেন এবং নয়ন পরিষ্কার করিয়া চাহিয়া দেখিলেন;—দেখিলেন, সম্মুখে শম্ভুরাম, পশ্চাতে দেবীর সেবক ব্রাহ্মণ।

রাঘব উঠিয়া সসম্ভ্রমে শম্ভুরামকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "আমার অন্যায় হইয়াছে। চারিদিকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সাবধানতার সহিত অনুসন্ধান করিয়াছি; কোথাও কোন আশঙ্কার কারণ না দেখিয়া দেবীর সম্মুখে বসিয়াছিলাম। জানি না, কেন আমার নিদ্রা আসিয়াছিল। এরূপ অপরাধ আমার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই। আপাততঃ কোন প্রয়োজনীয় আদেশ আছে কি?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "কিছুই দেখিতেছি না। অপরাধ হইয়াছে বলিয়া দুঃখিত হইতেছ কেন ভাই? বৈকালে তোমার মাথা ঘুরিতেছিল, তাহার পর তোমার মত নিদ্রাবিজয়ী বীরকেও নিদ্রাগত হইতে হইয়াছিল। আমার আশঙ্কা হইতেছে, তোমার শরীর হয় তো বড়ই দুর্ব্বল হইয়াছে। আমি এ জন্য বড়ই চিন্তাকুল হইয়াছি।"

পরে সেবক ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শম্ভুরাম বলিলেন, "আপনি ভগবতীর সিদ্ধ সেবক। আপনার প্রার্থনা দেবী কখনই অগ্রাহ্য করেন না। আমরা প্রাণের কথা দেবীকে জানাইতে হইলে আপনারই শরণাগত হই। আপনি কৃপা করিয়া আজ ভগবতীর নিকট আমার জীবনস্বরূপ রাঘবের স্বাস্থ্য কামনা করিবেন। রাঘব আমার একান্ত বিশ্বাসভাজন, প্রাণের ন্যায় প্রিয় ব্যক্তি, এ কথা ভবানী নিশ্চয়ই জানেন। রাঘবের ভরসাতে আমি অসাধ্যসাধন করি। দেবী দয়া করিয়া এই রাঘবরূপ মহাত্মাকে আমার পার্শ্বে স্থাপিত করিয়াছেন। রাঘব অসুস্থ হইলে আমার সকল আয়াস বৃথা হইবে।"

সেবক ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্রাদিবিহীন, গৃহাদি-পরিশূন্য। শম্ভুরাম ও তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত তাবতে এই মহাত্মাকে দেবতাজ্ঞান করেন। ভবানীর অভিপ্রায় জানিবার প্রয়োজন হইলে সকলে এই ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থী হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যাহা বলেন, তাহাই ভবানীর প্রত্যক্ষ আদেশবোধে সকলেই অবিচলিতচিত্তে শিরোধার্য্য করেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কাত্যায়নীকে আমি সকল কথা জানাইব। রাঘব তো এতক্ষণ অনেক জানাইয়াছেন। দেবীর আদেশ আপনারা সময়মত শুনিতে পাইবেন।"

রাঘব একটু উৎকণ্ঠিতভাবে এই সিদ্ধ মহাপুরুষের মুখের দিকে চাহিলেন। শম্ভুরাম বলিলেন, "আইস রাঘব, তোমাকে সেই বন্দীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

তাহার পর উভয়ে দেবীকে প্রণাম করিয়া ঘনারণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

বন্দী যুবা একাকী এক বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন। বহুদূরে চতুর্দ্দিকে কণ্টকীলতা বেষ্টিত। সেই কণ্টকী গুল্মাদি অতিক্রম করিয়া অন্যদিকে যাতায়াত করা অসম্ভব। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার এক সূক্ষ্ম পথ আছে। সেই সূক্ষ্মপথে উন্মুক্ত অসি-হস্তে চারি ব্যক্তি সর্ব্বদা দণ্ডায়মান। ইহাই এই ধর্ম্ম-কাননের কারাগার। বন্দী এই কারামধ্যে অকাতরে উপবিষ্ট। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, চক্ষু রক্তবর্ণ, কেশরাশি বিশৃঙ্খল, বদন কালিমাযুক্ত, পরিচ্ছদ ধূলি-ধূসরিত। তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ নাই, চরণে পাদুকা নাই। এইরূপ কদর্য্যভাবে উপবিষ্ট বন্দীকে দেখিলে স্বতই মনে হয় যে, তিনি মহদ্‌বংশসম্ভূত, তাঁহার বয়স পঞ্চবিংশ বর্ষ অতিক্রম করে নাই। তিনি রূপবান্। এখনই তাঁহার জীবন-প্রদীপ নিবিয়া যাইতে পারে, শম্ভুরাম আদেশ করিলে এখনই তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত হইতে পারে। তথাপি তাঁহার কোন চিন্তা নাই, কোন অবসন্নতা নাই।

যুবক ভাবিতেছেন, "শম্ভুরাম ডাকাইত, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া, কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। দেশ-মধ্যে শম্ভুরামের অতিশয় প্রতিপত্তি, তাঁহাকে বিনষ্ট করা অনেকের বাঞ্ছনীয়; কিন্তু এখানে আমি দেখিতেছি, শম্ভুরাম দরিদ্র, শম্ভুরাম

সর্ব্বত্যাগী। নিরন্তর দেশলুণ্ঠন করিয়াও যে সম্পত্তি সংগ্রহ করে না, যে আপনার বিলাসের বা সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, নিশ্চয়ই তাহার হৃদয়ে বিশেষ বল আছে।”

বন্দী যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় রাঘব তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র অস্ত্রধারী রক্ষিচতুষ্টয় সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল। ধর্ম্মকাননে রাঘব প্রায় শম্ভুরামের সমান সম্মানিত। শম্ভু-রামের আদেশে সম্প্রদায়ের তাবতে রাঘবকে নেতার সমকক্ষ বলিয়া জ্ঞান করে। রাঘব বন্দীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “বোধ হয়, আপনার এই স্থলে রাত্রিবাস করিতে বিশেষ কষ্ট বোধ হইয়াছে। আপনি রাজপুত্র, পরম সুখী পুরুষ। এ দরিদ্র সর্ব্বত্যাগী অন্নবস্ত্রবিহীন অধমদিগের আশ্রমে আপনার বিশেষ কষ্ট হইবারই কথা। কিন্তু আপনি বীর, দৈহিক কোন কষ্টই বীরপুরুষকে অভিভূত করিতে পারে না।”

বন্দী বলিলেন, “আমি বিশেষ কষ্ট অনুভব করি নাই। গত কল্য শম্ভুরামের সহিত কথাবার্ত্তার সময় বোধ হইয়াছিল, আপনি একজন বিশ্বাসী পুরুষ। আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতে আপনারা মনস্থ করিয়াছেন? এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাবে জড়পদার্থের ন্যায় একস্থানে বসিয়া থাকা আমার বড়ই কষ্টকর হইয়াছে। আপনারা আমার প্রাণদণ্ড করিলে আমি দুঃখিত হইব না, কিন্তু এরূপ অনর্থক আমাকে অপেক্ষা করিতে হইলে আমি পাগল হইয়া যাইব।”

রাঘব এ কথার সার্থকতা অনুভব করিলেন; বলিলেন,—“আপনার সম্বন্ধে আপনার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিতে আমি গুরুর আদেশ পাইয়াছি।”

বন্দী জিজ্ঞাসিলেন, "গুরু কে?"

রাঘব উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "শম্ভুরাম। আমরা সকলেই তাঁহাকে গুরু বলি। তিনি দেবতা, সমস্ত মনুষ্য-জাতিরই গুরু হইবার উপযুক্ত।"

বন্দী একটু চিন্তা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আমার সম্বন্ধে আপনাদিগের গুরু কি আদেশ করিয়াছেন?"

রাঘব বলিলেন, "আপনার ইচ্ছার উপর ব্যবস্থা নির্ভর করিতেছে। আপনি কি ভাবে কার্য্য করিবেন, জানিতে পারিলে গুরুর আদেশ ব্যক্ত করিব।"

বন্দী বলিলেন, "কোন্ বিষয়ে আমাকে কি ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমি এখনও জানি না।"

রাঘব বলিলেন, "মনে করুন, আপনি এখনই মুক্তি পাইবেন। তাহার পর আপনি আমাদিগের এই সম্প্রদায়ের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না কি?"

বন্দী বলিলেন, "বোধ হয়, কোন অনিষ্ট করিতে আমার প্রবৃত্তি হইবে না। শম্ভুরাম ডাকাইত নামে প্রসিদ্ধ। আমি তাঁহাকে ডাকাইত বলিয়া জানিতাম; কিন্তু তাঁহার সহিত কথা কহিয়া, দিবারাত্রি এখানে অতিবাহিত করিয়া, এখানকার অনেক লোকের সহিত আলাপ করিয়া আমি বুঝিয়াছি, শম্ভুরাম ডাকাইত হইলেও মহদ্ব্যক্তি। মহদ্ব্যক্তির অনিষ্টাচরণ করিতে আমার বাসনা নাই।"

রাঘব বলিলেন, "কিন্তু আপনার পিতা গুরুর শত্রু। গুরুদেব আপনার পিতৃকৃত অনেক কার্য্যেরই প্রতিকূল।"

বন্দী বলিলেন, "এ কথা স্বীকার করিতে হইলে আমার পরিচয় স্বীকার করিতে হয়। আপনারা কিরূপে আমার পরিচয় জানিলেন?"

রাঘব বলিলেন, "গুরুর অজ্ঞাত কিছুই নাই। তিনি জানেন, আপনি মানভূমরাজের প্রথম পুত্র বলেন্দ্র সিংহ। তিনি আরও জানেন, আপনি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী এবং মহাত্মা। আপনার সম্বন্ধে আরও অনেক সংবাদ গুরু শ্রুত আছেন।"

বন্দী জিজ্ঞাসিলেন, "আর কি জানেন?"

রাঘব বলিলেন, "তাহা বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আপনি জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, সুতরাং বলিতে হইবে। আর জানেন, আপনি পুরগ্রামের এক দরিদ্র ক্ষত্রিয়-কন্যার প্রেমাসক্ত।"

বন্দী একটু বিচলিত হইলেন। রাঘব বলিতে লাগিলেন, "জাতি, কুল প্রভৃতি বিষয়ে কোন বাধা না থাকিলেও আপনার পিতৃদেব সেই নারীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আপনাকে বদ্ধ করিতে কখনই সম্মত হন নাই। কিন্তু আপনি সত্যবাদী, যথার্থ প্রেমিক এবং পরম ধার্ম্মিক। আপনি ইচ্ছা করিলে বিবাহ না করিয়াও সেই সুন্দরীকে হস্তগত করিতে পারিতেন, তাহা আপনি করেন নাই। সত্যবন্ধনের কথা স্মরণ করিয়া, প্রেমের পবিত্রতার মান রাখিয়া, ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সকলের অমতে, সকলের অজ্ঞাতসারে সপ্তাহ পূর্ব্বে আপনি সেই সুন্দরীকে যথা-শাস্ত্র বিবাহ করিয়াছেন।"

বন্দী সবিস্ময়ে রাঘবের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। রাঘব বলিতে লাগিলেন, "আপনি গভীর নিশিতে সেই প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। রাত্রি অবসান হইবার পূর্ব্বেই রাজধানীতে

প্রত্যাগত হইতে আপনার সঙ্কল্প ছিল। আপনি বিবাহের পর হইতে এইরূপ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কল্য রাজধানীর দিকে না গিয়া আপনি রাত্রিশেষে এই বনের দিকে অশ্ব চালাইয়াছিলেন; তাহা গুরু জানেন না। আমরা শত্রু-ভ্রমে আপনাকে অবরুদ্ধ করিয়াছি।”

বন্দী বলিলেন, “আমি শত্রুরূপে আপনাদিগের অধিকৃত এই কাননে প্রবেশ করি নাই। আপনারা যখন এত সংবাদ জানেন, তখন আর একটু আপনাদিগকে জানাইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বড়ই হিংস্র। এই বিবাহের সংবাদ পিতার নিকট প্রমাণিত করিতে পারিলে আমি তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত হইব। এই অভিপ্রায়ে অলক্ষ্যে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গত রাত্রিতে আমার অনুসরণ করিয়াছিল। আমি অনেকবার অনুসরণকারীকে বহুদূরে লক্ষ্য করিয়াছিলাম; মধ্যে মধ্যে দেখিতেও পাই নাই। শেষে সুস্পষ্টরূপে অশ্বপৃষ্ঠে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিয়াছিলাম। তখন গন্তব্য দিকে অগ্রসর না হইয়া আমি এই অরণ্যের দিকে বেগে অশ্ব চালাইয়াছিলাম।”

রাঘব বলিলেন, “আপনার এই বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইলাম। ইহার মধ্যে অবিশ্বাসের কথা কিছুই নাই। আপনার গুণে আমাদিগের গুরু অন্তরে আপনার প্রতি আসক্ত। তিনি সমাদর পূর্ব্বক আপনাকে মুক্তি দিতে আদেশ দিয়াছেন। কেবল তিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, আপনি আমাদিগের শত্রুতা করিবেন কি না।”

বন্দী বলিলেন, “যদি বলি করিব?”

রাঘব বলিলেন, “তাহা হইলেও আপনি মুক্ত হইবেন। কিন্তু আমরা আপনার নয়ন নিরুদ্ধ করিয়া এরূপ কৌশলে আপনাকে বাহিরে

লইয়া যাইব যে, ভবিষ্যতে আমাদিগের এই স্থান অবধারণ করা আপনার পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর হইবে।”

বন্দী জিজ্ঞাসিলেন, “যদি বলি করিব না?”

“তাহা হইলে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত আমরা সঙ্গে করিয়া আপনাকে বিদায় দিব।”

বন্দী জিজ্ঞাসিলেন, “আমি শত্রুতা করিব না বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন কেন?”

রাঘব হাসিয়া বলিলেন, “আমরা পূর্ণ বিশ্বাস করিব। যাঁহার চরিত্র সকল বিষয়েই অত্যুন্নত, তিনি ইতর ডাকাইতদিগের সহিত প্রতারণা করিবেন, এ কথা আমরা মনেও স্থান দিই না।”

বলেন্দ্র সিংহ বলিলেন, “আপনারা রাজকার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করেন, সে সম্বন্ধে আমি প্রতিবাদ করিতে বাধ্য।”

রাঘব বলিলেন, “আমরা রাজকার্য্যের বা রাজশক্তির অবমাননা করিতে চাহি না। কিন্তু যেখানে প্রজার প্রতি অকারণ উৎপীড়ন, যেখানে দরিদ্রের প্রতি নিষ্কারণ অত্যাচার, যেখানে ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, সেই স্থলে শত প্রতিকূল ঘটনা অতিক্রম করিয়াও গুরু উপস্থিত হন। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিবেচনা করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, এরূপ কার্য্য রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আমরা স্বার্থের জন্য কোন কার্য্য করি না, অতএব আমরা ভগবানের নিকট অপরাধী নহি। আপনার ন্যায় ধার্ম্মিকের নিকট কেন অপরাধী হইব?”

বলেন্দ্র সিংহ কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন; বলিলেন, “এরূপ ঘটনা

রাজকর্ম্মচারীদিগের দোষে হয়। তথাপি সে জন্য সমুচিত দৃষ্টি না রাখায় রাজার কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি হয় বটে। এরূপ স্থলে আপনাদের স্বয়ং কোন কার্য্য না করিয়া অত্যাচারের কথা রাজার গোচর করা উচিত।”

রাঘব বলিলেন, “তাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনা কিছুই নাই।”

বন্দী বলিলেন, “অতঃপর এইরূপ বিষয় আমার গোচর করিবেন, আপনাদিগের উদ্দেশ্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।”

রাঘব বলিলেন, “উত্তম কথা। আপনি এক্ষণে মুক্ত। গুরু আপনার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।”

পরম সমাদরে বলেন্দ্র সিংহের হস্ত ধারণ করিয়া রাঘব প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বীরভূমের সদর ষ্টেসন শূরি আমাদিগের উপন্যাস-বর্ণিত কালে একটি সামান্য পল্লীগ্রাম ছিল। তথায় প্রবল-পরাক্রান্ত কোন লোকের বাস ছিল না; কিন্তু সঙ্গতিশালী অনেক গৃহস্থ সেখানে বাস করিতেন। সকলেরই মাটীর ঘর, সকলেই কৃষি-জীবী এবং প্রায় সকলেই অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ-বিহীন। নগরের রাজারা তখন শূরি গ্রামের অধীশ্বর এবং তাঁহাদের প্রবল শাসনে এই গ্রামের তাবৎ লোক অবসন্ন।

গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাস; আজি তাঁহার বাটীতে বড় বিপদ্। সংবৎসর রামচন্দ্র নানা প্রকার রোগে শয্যাগত; তাঁহার দুইটি অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র। কৃষিকার্য্যের কোন তত্ত্বাবধান তাহাদিগের দ্বারা সম্ভব নহে। বিধবা কন্যা চম্পকলতা দুইটি অপগণ্ড শিশু সহ রামচন্দ্রের গৃহে বাস করে। গৃহিণী রুগ্নপতির সেবায় সতত ব্যস্ত। দুই সন হইতে অজন্মা চলিতেছে, তাহার উপর রামচন্দ্রের পীড়ার জন্য কৃষিকার্য্যের কোন আয়োজন করা ঘটে নাই। অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। মজুৎ ধান্য বসিয়া খাইতে খাইতে ফুরাইয়াছে। চিকিৎসার ব্যয়ে নগদ টাকা নিঃশেষ হইয়াছে; এখন আর দিন চলে না, কর্ত্তার পীড়াও ভয়ানক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। সকলেই বুঝিয়াছেন যে, অতি অল্পকালমধ্যেই তাঁহার জীবলীলা শেষ হইবে। কিন্তু এ বিপদের উপরও অন্য ভয়ানক বিপদ্ বাটীর সকলকে চিন্তাকুল করিয়াছে।

রামচন্দ্রের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদ্বয়, কন্যা চম্পকলতা এবং গৃহিণী, সকলেরই মুখ দারুণ চিন্তায় কালিমাচ্ছন্ন।

দুই বৎসর হইতে রামচন্দ্রের রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে। তাহার জন্য জুলুম ও তাগাদা যথেষ্ট চলিতেছিল, শেষ রামচন্দ্রের জাতি নাশ করিবার প্রস্তাবও হইয়াছে। নিরুপায় হইয়া অন্তিম-শয্যাশায়ী রামচন্দ্র কয়েক দিনের জন্য সময় লইয়াছেন। আজি সেই নির্দ্ধারিত সময়ের শেষ দিন আজি আর তাঁহাদের রক্ষা নাই।

টাকার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে। অনেক বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-কুটুম্বের নিকট বৃদ্ধ রামচন্দ্র সমস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই টাকা দিতে সম্মত হন নাই। তখন সরকার আইন অনুসারে কাহারও সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিতে হইলে রাজার অনুমতি লইতে হইত, সে বড় কঠিন ব্যাপার; অনেক উৎকোচ দিয়া অনেক দিন হাঁটাহাঁটি করিতে পারিলে, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমতি পাওয়া যাইত। কিন্তু উত্তমর্ণ সে ক্লেশ স্বীকার করিতে কখনই প্রস্তুত হইত না; অধমর্ণকেই আয়োজন করিয়া ঋণগ্রহণের অনুমতি বাহির করিতে হইত। মরণাপন্ন রামচন্দ্রের যাতায়াত করিবার কোন সাধ্য ছিল না; সুতরাং ঋণ মিলিল না।

আজি যে তাঁহাদের কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে; সকলেই বিপদের গুরুতা কল্পনা করিয়া আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ। বৃদ্ধ, রোগ-জীর্ণ, মরণাপন্ন রামচন্দ্রের এক পার্শ্বে কন্যা, অপর পার্শ্বে পত্নী উপবিষ্টা উভয়েই নতবদনা এবং উভয়েই চিন্তা-পীড়িতা, সম্মুখস্থ এই জী-

[illegible] নিভিয়া যাইবে। তাহার পর যে কি

তাহা চিন্তা করিতে কাহারও অবসর নাই। মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাদিগের যে কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহাই চিন্তা করিয়া সকলে আকুল। রামচন্দ্রেরও এখন রোগ-যন্ত্রণা মনে নাই, আসন্ন-মৃত্যুর কথাও স্মরণ নাই, পরকালে কি হইবে, তাহারও ভাবনা নাই। এখনই যমোপম রাজ-দূতেরা আসিয়া কি অত্যাচার ঘটাইবে, তাহারই চিন্তায় তিনি অবসন্ন। প্রাতঃকাল হইতে তিনি পথ্য পান নাই ; বাটীর কোন ব্যক্তিরই আহার হয় নাই। খাদ্যসামগ্রীর একান্ত অভাব, প্রতি-বাসিগণের নিকট চাহিয়া চাহিয়া অনেক দিন চলিতেছে, আর চাহিতে পারা যায় না ; চাহিলেও আর লোকে দেয় না। শিশুরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বালক দুইটি বাটীতে নাই।

সহসা রামচন্দ্র ক্ষীণ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন "মা চম্পক! ছেলে দুইটিকে লইয়া তুমি কোন প্রতিবাসীর বাটীতে চলিয়া যাও।"

চম্পক বলিল, "মা এ কথা অনেককে বলিয়াছেন ; কিন্তু বাটীতে স্থান দিতে চাহে না।"

রামচন্দ্র আবার বলিলেন, "তবে গ্রামের উত্তরে যে ভা... আছে, তাহারই মধ্যে গিয়া বসিয়া থাক।"

গৃহিণী বলিলেন, "ফল সমানই হইবে বা আরও ভয়ানক সেখানে ডাকাইত, মন্দলোক অনেক। এই সুন্দরী কন্যা সে... বার পূর্ব্বে পথেই ধর্ম্ম হারাইবে।"

রামচন্দ্র নীরব রহিলেন। গৃহিণী আবার বলিলেন, "দেশ... দস্যুরা নির্ভয়ে গ্রাম লুটিতেছে ; মন্দলোকেরা হাসিতে হাসি... সর্ব্বনাশ করিতেছে ; কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া একটু ভয় ক...

মুসলমানেরা তাহাও করে না। রাজা কোন বিষয়ের সংবাদ রাখেন না। কর্ম্মচারীরা নিষ্ঠুরতায় অতুলনীয়; এরূপ অবস্থায় কোন দিকেই রক্ষার আশা নাই। এ দেশে ভদ্রের বাস সম্ভব নহে।”

রামচন্দ্র বলিলেন, “শুনিতেছি, দয়ার অবতার শম্ভুরাম দুঃখীর দুঃখ-মোচনের জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন। শুনিয়াছি, তিনি ভগবানের অবতার; তাঁহার নিকট আমাদিগের দুঃখ জানাইবার উপায় হইলে হয় তো মঙ্গল হইতে পারিত।”

চম্পক বলিল, “সকল লোকের মুখেই তাঁহার নাম শুনা যায়; কিন্তু তিনি থাকেন কোথায়, তাহা তো কেহ বলিতে পারে না।”

গৃহিণী বলিলেন, “ঠিকানা জানিলে আমি নিজেই তাঁহার নিকট যাইতাম। দেবতার নিকট অভিমান নাই, লজ্জা নাই।”

রামচন্দ্র বলিলেন, “হায়! সেই দেবতাকে লোকে ডাকাইত বলে আর এই নির্দ্দয় রাজাকে লোকে দেবতার অংশ বলে!”

তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। যে নিদারুণ বিপদের আশঙ্কায় সকলেই অবসন্ন, তাহার কোন লক্ষণই এখনও দেখা গেল না। কোথাও একটি শব্দ হইলে, কেহ কাহাকে উচ্চ-শব্দে ডাকিলে, দূরে বা নিকটে কুক্কুর চীৎকার করিয়া উঠিলে, তাঁহারা তিনজনেই চমকিতে লাগিলেন। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, মৃত্যুর ভীতি নাই, কেবল অত্যাচারের ভয়ে, কেবল মানহানির ভয়ে সকলেই আকুল। যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটুক, বিধাতার মনে যে বিষয়ের যে ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই হউক; এই রূপ ভাবিয়া কাল-সমুদ্রে ও কর্ম্ম-সমুদ্রে গা ভাসাইতে পারিলে মনুষ্য অনেক অপ্রতিবিধেয় চিন্তার দায় হইতে নিষ্কৃতি

লাভ করিতে পারে; কিন্তু এ সকলই উপদেশের কথা, সকলই শাস্ত্রীয় বিধি। মনুষ্য সুদীর্ঘকাল অনুশীলন ব্যতীত মনকে এই ভাবে গঠিত করিতে পারে না। সুতরাং অমঙ্গলের সূচনা হইলে মানবকে নিয়তই চিন্তাকুল থাকিতে হয়। সংসার অমঙ্গল-পূর্ণ; প্রথম জন্মদিন হইতে যে দিন শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করে, তৎকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যকে নিয়ত দুঃখের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকিতে হয়। কদাচিৎ সুখ-সূর্য্যের মধুর আলোক সেই কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া মানবকে আনন্দে বিহ্বল করে। জীব সেই ক্ষণিক আমোদে পরিতৃপ্ত হইয়া এই জীবনকে পরম সুখের নিকেতন বলিয়া জ্ঞান করে এবং নিরন্তর মায়া-মোহ-পরিবৃত হইয়া সুখ-ভ্রমে দুঃখকে আলিঙ্গন করিতে থাকে। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে জগৎ এই ভাবে চলিতেছে এবং বোধ হয়, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত এই ভাবে চলিবে।

যখন অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টাশঙ্কা মুখব্যাদান করিয়া মনুষ্যকে গ্রাস করিতে আইসে, তখন তাহারা হতাশ, নিশ্চেষ্ট ও জড়প্রায় হইয়া পড়ে। যখন নিরীহ ভেককে ভুজঙ্গম পশ্চাদ্দিক্ হইতে গ্রাস করিতে আইসে, তখন আসন্ন-মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া ভেক পলায়ন-চেষ্টা ত্যাগ করে। যখন রাজবিচারে মনুষ্যের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়, তখন সে হতাশ হইয়া উদাসীনভাবে সেই শেষ-সময়ের প্রতীক্ষা করে। যখন তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে ঝটিকাবর্ত্তে নৌকা ডুবিতে থাকে, তখন আরোহীরা সকল চেষ্টা বিফল হইল বলিয়া সলিল-সমাধির প্রতীক্ষা করে।

অদ্য যে অপ্রতিবিধেয় বিপৎপাত ঘটিতেছে, রামচন্দ্র এবং তাঁহার স্ত্রী-কন্যা তাহার নিমিত্ত ধীর ও নির্ব্বাকভাবে অপেক্ষা করিতেছেন। আর কথা কহিতে তাঁহাদিগের সাহস নাই। কি কথাই বা আর কহিবেন?

সকলে একসঙ্গে চমকিয়া উঠিলেন। সহসা সম্মুখে বজ্রপাত হইলে অথবা অতি নিকটে হলাহলধারী ফণাবিস্তারী কাল-সর্প দর্শন করিলে, কিংবা সম্মুখে ভয়ানক ব্যাদিতবদন শার্দ্দূল দেখিলে মনুষ্য যেরূপ চমকিত হয়, তাঁহারা সকলেই সেইরূপ চমকিত হইলেন। তাঁহাদিগের বাটীর বহির্দ্বারে প্রচণ্ড করাঘাত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভীমরবে চীৎকার উঠিল, "চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, বাহিরে আইস।"

চক্রবর্ত্তী শক্তিহীন, তাঁহার স্ত্রী-কন্যা নীরব। জীবন থাকিতেও শবের ন্যায় বিবর্ণ ও নিশ্চল, কাহারও মুখ হইতে কোন উত্তর বাহিরিল না। আবার কর্কশস্বরে আদেশকারী বলিল, "কথা শুনিতেছ না, দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিব?"

তখন অতি ক্ষীণস্বরে চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আমার উঠিবার শক্তি নাই, তুমি কে?"

স্বর বাহিরে পৌঁছিল না; দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হইতে লাগিল। তখন সাহসে ভর করিয়া গৃহিণী বাহিরে আসিলেন;—বলিলেন, "দ্বার ভাঙ্গিতে হইবে না, খুলিয়া দিতেছি।"

দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল; বাহিরে যমদূতের ন্যায় চারি ব্যক্তি দণ্ডায়মান। তাহাদিগের সঙ্গে একটি ভদ্রবেশধারী পুরুষ। সেই ব্যক্তি গোমস্তা; এই গোমস্তা তিলিজাতীয় এবং সর্ব্বপ্রকার সহৃদয়তা-বিবর্জ্জিত। গোমস্তা বিকটস্বরে বলিল, "যে মাগী দরজা খুলিয়া দিল, সেই বোধ হয় চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী; তাহাকে ছাড়িও না।"

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং পাইকেরা চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্ববৎ বিকটস্বরে গোমস্তা বলিল,

"আজি খাজানা মিটাইয়া দিবার কথা; এখনই দিবে কি না বল? কোন বাজে কথা আমি শুনিতে চাহি না।"

চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী অধোমুখে দণ্ডায়মানা। তিনি প্রৌঢ়বয়স্কা। অনেক পুরুষের সহিত সতত তাঁহাকে কথাবার্ত্তা কহিতে হয়। বিশেষতঃ বিপদ্‌কালে মানুষের লজ্জা-ভয় থাকে না। ভীতস্বরে বলিলেন, "কোন উপায় হয় নাই।"

তখন গোমস্তা অতি উগ্রভাবে বলিল, "আর কথায় কাজ নাই; এই চক্রবর্ত্তীর হাড়ে হাড়ে বদ্‌মাইসি; এ বাটীর টিকটিকি পর্য্যন্ত বদ্‌মায়েস। সহজ কথায় এখানে কাজ হইবে না। ইহার একটা সুন্দরী মেয়ে আছে, তাহাকে টানিয়া আন। মা আর ঝিকে একসঙ্গে উলঙ্গ করিয়া বে-ইজ্জৎ কর। আর সেই চক্রবর্ত্তী বুড়ার রোগ কেবল একটা ছল মাত্র। ইহাদের সমক্ষে তাহাকে দাঁড় করাইয়া রাখ।"

সকল কথাই চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার কন্যার কর্ণে প্রবেশ করিল। চম্পকলতা তখন যেন পাষাণ-পুত্তলি। এ অবস্থায় ভগবান্ রক্ষা না করিলে, তাঁহাদের আর উপায় নাই। কিন্তু বিপন্ন-বান্ধব ভগবান্‌কেও ডাকিতে তিনি তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দুইজন পাইক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দেবীর ন্যায় শোভাময়ী চক্রবর্ত্তী-দুহিতাকে দেখিয়া বলিল, "বা! এ যে বেশ জিনিস!"

তৎক্ষণাৎ একজন অগ্রসর হইয়া চম্পকের হস্ত ধারণ করিল। তখন সুন্দরী বায়ুতাড়িত বল্লরীর ন্যায় কাঁপিয়া উঠিলেন এবং যন্ত্রচালিত পুত্তলির ন্যায় আকর্ষণকারীর সহিত বাহিরে আসিলেন।

তাঁহাকে দর্শনমাত্র গোমস্তা বলিল, "খাজানা যেরূপে হউক আদায়

হইবে। আপাততঃ আমাদের মজুরি পোষাইয়া যাইবে। দাঁড়াইয়া দেখিতেছিস্ কি? ইহাদের দুইজনকে উলঙ্গ করিতে হইবে।"

তখন চম্পক বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা; আপনি শূদ্র। আমার উপর আপনি কোন অত্যাচার করিলে, আমি তাহা নিবারণ করিতে পারিব না; কিন্তু মাথার উপর ভগবান্ আছেন। তাঁহার কোপ-নয়নে পড়িয়া আপনার সর্ব্বনাশ হইবে।"

গোমস্তা বলিল, "তোমার তত্ত্ব-উপদেশ শুনিবার আমার আবশ্যক নাই। অনেক ব্রাহ্মণ-কন্যাকে আমি নরকের পথে পাঠাইয়াছি, অনেক ব্রাহ্মণের মাথা আমি ফাটাইয়াছি, ভগবান্ আমার ভালই করিয়া আসিতেছেন। খাজানার উপায় করিতে পার কি?"

চম্পকলতা বলিলেন, "কোন উপায় নাই।"

গোমস্তা বলিল, "তবে তোমার নিষ্কৃতিরও কোন উপায় নাই। খাজানা পাইলেও আমি তোমাকে ছাড়িতে পারিতাম না; তুমি যেরূপ রূপসী, তাহাতে তোমার সহিত ভোগের আশা ছাড়িতে আমার সাধ্য নাই। তবে তোমার কথা শুনিয়া, তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার প্রতি বিশেষ কোন অত্যাচার করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু কি করিব, তোমাদের সকলেই দুষ্ট লোক। সরকারী কার্য্য চালাইতে হইলে দুষ্টের দমন করিতে হয়। যে যেমন, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার না করিলে, কার্য্য চলে না। তোরা দেখিতেছিস্ কি? ইহার কাপড় খুলিয়া নে। তার পর যাহা করিতে হয়, তাহা আমি পরে বলিতেছি।"

তৎক্ষণাৎ দুইজন লোক জননীকে এবং অপর দুইজন কন্যাকে বিবস্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইল। জননী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগি-

লেন, কিন্তু কন্যা নীরব। তিনি এখন একাগ্রচিত্তে শ্রীভগবানের পাদ-পদ্ম চিন্তা করিতেছেন। দৈহিক পবিত্রতা, সাংসারিক ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল বিষয়ের ভাবনাই তখন তাঁহার অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়াছে। দুর্বৃত্তেরা সত্য সত্যই তাঁহাদের বস্ত্র ধারণ করিল। জননী জানিতেন, কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া চীৎকার করিলে এবং হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে জগৎ প্রকম্পিত করিলেও প্রতিবাসী বা কোন পথ-প্রবাহী লোক সাহায্য করিতে আসিবে না। রাজার ভয়ে রাজকর্ম্মচারিদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের বিরোধিতা করা দূরে থাকুক, মৃদুভাবে বাক্যেও তাহার প্রতিবাদ করিতে কাহারও সাহস হইত না। কন্যা তখন বলিয়া উঠিলেন, “ভব-ভয়হারী, লজ্জা-নিবারণ নারায়ণ! তুমি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। তুমি সভামধ্যে নিঃসহায়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছ, তুমি পতিব্রতা তুলসীকে দেবত্ব দিয়াছ, তুমি বিপন্নের বান্ধব, আর্ত্তের সহায়। যদি সতী ব্রাহ্মণ-তনয়ার লজ্জা-নিবারণ করিতে তোমার অভি-লাষ হয়, তাহা হইলেই আমরা রক্ষা পাইতে পারি; নতুবা দয়াময় তোমার সম্মুখে আজ নারীর সর্ব্বস্ব ধ্বংস হয়।”

গোমস্তা বলিল, “এইরূপ অনেক চীৎকার আমি শুনিয়া আসি-তেছি; কখনও কোন ভগবান্ আমার হাত হইতে কাহাকেও রক্ষা করেন নাই। তোরা ভয় পাইতেছিস্?”

তখন গোমস্তা স্বয়ং অগ্রসর হইল; সবলে যুবতীর বস্ত্রাকর্ষণ করিল। দেহের ঊর্দ্ধভাগ উলঙ্গ হইল। সুন্দরী উভয় হস্তে বক্ষোদেশ আবরণ করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে বসিয়া পড়িলেন, মরণাপন্ন চক্রবর্ত্তী শিশুর ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া বাহিরে আসিলেন এবং শ্বাসাতিশয্য হেতু ক্ষুব্ধস্বরে

বলিলেন, "গোমস্তা মহাশয়! আমি প্রবীণ ব্রাহ্মণ; আমার আর সময় নাই। এই শেষসময়ে আমাকে দারুণ মনস্তাপ দিবেন না। আপনার পায়ে ধরিতেছি, আজিকার দিন আমাকে ক্ষমা করুন।"

গোমস্তা বলিল, "তোমার বিটলামী অনেক শুনিয়াছি; তুমি যমের মুখে যাইতে বসিয়াছ, নইলে আমার হাতে আজি বিলক্ষণ শিক্ষা পাইতে।"

তাহার পর গোমস্তা পুনরায় চম্পকের বস্ত্র আকর্ষণ করিল; তিনি তখন সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া 'নারায়ণ রক্ষা কর' বলিতে বলিতে অধোমুখে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। জননীরও তখন প্রায় সেইরূপ অবস্থা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মনুষ্য-হৃদয় এক অত্যাশ্চর্য্য ক্ষেত্রস্বরূপ। যখন তাহাতে পাপের কণ্টকীলতা জন্মিতে থাকে, তখন ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সমস্ত ক্ষেত্র অধিকার করিয়া ফেলে। ন্যায়পরতা ও সহৃদয়তার শোভন লতিকা কণ্টকের আক্রমণে নির্জ্জীব হইয়া পড়ে এবং সমস্ত ক্ষেত্র অচিরকালমধ্যে কণ্টকময় হয়। যাহা প্রবল, তাহা দুর্ব্বলকে ধ্বংস করে। নিরন্তর পর-পীড়ন ও পাপাচরণে গোমস্তা ও তাহার অনুচরগণের হৃদয় হইতে কোমল-প্রবৃত্তি এককালে তিরোহিত হইয়াছে। সুতরাং তাহারা ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়াছে, জগতে যে পুণ্য থাকিতে পারে, তাহাও ভুলিয়াছে এবং ধর্ম্মের মাহাত্ম্য যে অপরিসীম, এরূপ সংস্কারও ত্যাগ করিয়াছে।

মরণাপন্ন ব্যক্তির মিনতি, সতী কুলকামিনীর করুণ ক্রন্দন, সেই ধর্ম্মহীন বর্ব্বরদিগের হৃদয়ে কোনই অশ্রুপাত করিল না। তাহারা নিঃসঙ্কোচে কোনরূপ বাধার আশঙ্কা না করিয়া হাসিতে হাসিতে সর্ব্বনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইল।

তখন বায়ুর ন্যায় বেগে, গন্ধের ন্যায় অলক্ষিতভাবে সহসা দ্বারদেশে এক বিশালকায় পুরুষ-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। আগন্তুক ক্রোধকম্পিত-স্বরে কহিলেন, "ছাড়িয়া দাও। সরিয়া আইস।"

সকলেরই দৃষ্টি সেই আগন্তুক পুরুষের প্রতি সঞ্চালিত হইল। সকলে ক্ষণকালেরলেই নিমিত্ত স্ব স্ব কার্য্য বিস্মৃত হইল। গোমস্তা বলিল,

"তুমি এখানে মরিতে আসিয়াছ কে হে? রাজকার্য্যের বিরুদ্ধে, রাজ-কর্ম্মচারীর কার্য্যে বাধা দিলে মরিতে হয়, তাহা কি তুমি জান না? তুমি কোন্ দেশের লোক?"

আগন্তুক বলিলেন, "যে রাজা প্রজার দুঃখ দেখিতে জানে না, যে রাজা নারীর ধর্ম্ম রাখিতে চাহে না, যে রাজা কর্ত্তব্যের মাহাত্ম্য বুঝে না, সে পিশাচ। সেই পিশাচকে পদদলিত করিতে সকলেরই অধিকার আছে।"

গোমস্তা অবাক্ হইল। এরূপ সাহসের কথা সে কখনও কাহারও মুখে শুনে নাই। অবিলম্বে এই দাম্ভিক ব্যক্তিকে শাসন করা আবশ্যক বলিয়া সে বুঝিল। তখন আগন্তুককে ধরিবার নিমিত্ত পাইকদিগের প্রতি আদেশ করিল। সকলে অবলম্বিত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আগন্তুকের নিকট আসিল। নারীরা ভগবানের চরণে প্রণাম করিতে করিতে দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, "নিকটে আসিও না, তোমাদিগের ন্যায় ঘৃণিত জীবকে স্পর্শ করিয়া দেহ কলঙ্কিত করিতে চাহি না। তোমাদের ন্যায় অধম কীটের রক্তে ধরণী অপবিত্র করিতে ইচ্ছা করি না। দূরে চলিয়া যাও। প্রাণ লইয়া পলায়ন কর।"

ক্রোধে গোমস্তা কাঁপিতে লাগিল; সে পাইকদিগকে ঠেলিয়া অগ্র-সর হইল;—বলিল, "তুমি যেই হও, তোমার মৃত্যু উপস্থিত।"

তখন আগন্তুক সেই গোমস্তাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া একটা পাক দিলেন; তাহার পর বহুদূরে তাহাকে ছুড়িয়া ফেলিলেন। বালক যেমন অনায়াসে ক্রীড়া-পুত্তলি দূরে নিক্ষেপ করে, হস্তী যেমন অবলীলাক্রমে বৃক্ষশাখা ঘূরাইতে ঘূরাইতে ফেলিয়া

দেয়, আগন্তুক তদ্রূপভাবে এই হৃদয়হীন গোমস্তাকে সুদূরে প্রক্ষেপ করিলেন। গোমস্তা বিশেষ আঘাত পাইল। কিন্তু সে অতিশয় বলশালী লোক, এজন্য সংজ্ঞাহীন হইল না। পাইকেরা এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হইল; বুঝিল, যে ব্যক্তি এরূপ ব্যাপারসাধনে সক্ষম, তাহার শরীরে মত্তহস্তীর বল আছে।

চম্পকলতা ও তাহার জননী বুঝিলেন যে, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছেন। বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মনে করিলেন, শম্ভুরাম ব্যতীত আর কোন মনুষ্যের এরূপ দৈহিক বলের কথা শুনা যায় নাই। হয় এ ব্যক্তি শম্ভুরাম, না হয় স্বর্গের দেবতা।

গোমস্তা অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া কাতর ও বক্রভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল; কষ্টে বলিল, "একটা মানুষ রাজকার্য্যের বিরোধিতা করিতে আসিয়াছে, উহাকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে আমাদের গৌরব হইবে। আমরা পাচটা মানুষ যদি এই রাজবিদ্রোহী লোকটার কোন অনিষ্ট করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের কলঙ্ক হইবে, চাকরি যাইবে, বোধ হয়, গর্দ্দানা লইয়া টানাটানি হইবে। হতভাগা পাইকগুলা কোন কর্ম্মের নয়—কেবল ঝাঁকড়া চুল, লম্বা লম্বা পাকা লাঠি! যদি চারিজনে এই লোকটার মাথা ফাটাইতে না পারিস্, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবি, তোদের মাথা কাটা যাইবে। নগরে এ কথা প্রচার হইলে তোদের যে যেখানে আছে, সকলকেই রাজা এক গর্ত্তে পুতিবে।"

পাইকেরা এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া অনুভব করিল। দুই জন আগন্তুকের সম্মুখে এবং দুই জন পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পশ্চাতের দুই ব্যক্তি একসঙ্গে আগন্তুকের মাথা ফাটাইবার নিমিত্ত লাঠি তুলিল।

তৎক্ষণাৎ আগন্তুক দুই পা সরিয়া দাঁড়াইলেন। আঘাতকারিগণের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। আগন্তুক বলিলেন, "রক্তপাতে ইচ্ছা নাই, কাহাকেও মারিয়া ফেলিতে বাসনা করি না। তোমরা আমাকে উত্যক্ত করিও না। নির্ব্বোধ গোমস্তাকে মারিয়া ফেলিতে পারিতাম, কিন্তু মশা মারিয়া হাতে দাগ করিতে ঘৃণা বোধ করি।"

তাঁহার কথা কেহ শুনিল না। চারিজন তাঁহাকে প্রহার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন উন্মত্ত সিংহের ন্যায় আগন্তুক লাফাইয়া উঠিলেন; বিদ্যুতের ন্যায় এক ব্যক্তির হস্ত হইতে লাঠি কাড়িয়া লইলেন, চক্ষুর নিমিষে সেই লাঠির আঘাতে একজনের পা ভাঙ্গিয়া দিলেন। সে 'বাবা গো' শব্দে সেই স্থানে পড়িয়া গেল। অবশিষ্ট তিন জন মস্তকে আঘাত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত আগন্তুক বামহস্তে একজনের লাঠি চাপিয়া ধরিলেন আর আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত লাঠির আঘাতে একজনের হাত ভাঙ্গিয়া দিলেন; সে বিষম যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিয়া দূরে বসিয়া পড়িল; অবশিষ্ট দুই জনের কেশ আগন্তুক উভয়হস্তে ধারণ করিলেন;—বলিলেন, "তোরা কি কহিস্? একসঙ্গে দুই জনকে আছাড়িয়া মারিতে পারি, গলা টিপিয়া উভয়কেই শেষ করিয়া দিতে পারি, পা ধরিয়া চিরিয়া ফেলিতে পারি আর কীচকের মত হাত, পা, মুণ্ড, পেটের মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে পারি।"

একজন বলিল, "মাপ করুন, বুঝিতে পারি নাই, আপনি মনে করিলে সবই করিতে পারেন, তাহার ভুল নাই। শুনিয়াছি, ডাকাইত শম্ভুরাম ছাড়া মানুষের এরূপ শক্তি নাই। আপনি কে?"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি ডাকাইত শম্ভুরাম।"

তিনি পাইকদ্বয়ের কেশ ছাড়িয়া দিয়া লাঠি কাড়িয়া লইলেন তাহারা শম্ভুরমের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁপিতে লাগিল; নারীদ্বয় বুঝিলেন, সত্যই তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী বুঝিলেন, তাঁহার অনুমান সফল হইয়াছে।

ভীত, কম্পান্বিত, ব্যথিত গোমস্তা ধীরে ধীরে বিপরীত দিকে পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল, বজ্রগম্ভীরস্বরে শম্ভুরাম বলিলেন, "পিশাচের দাস, কোথায় যাইতেছিস্? এই চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের দাখিলা না দিয়া কোথায় যাইতেছিস্?"

গোমস্তা কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, দাখিলা লেখা আছে; অনেক লোকের অনেক দাখিলা এই দপ্তরে পড়িয়া আছে, আমি কিছুই লইয়া যাইতেছি না।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তাহা যেন হইল, তোর অপরাধের কোন দণ্ড হয় নাই। তুই ব্রাহ্মণীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়াছিস্। তুই ব্রাহ্মণকে কটুবাক্য বলিয়াছিস্, তুই আমার বধ্য। পলাইয়া নিস্তার পাইবি না। আমি তোর রাজার ভয়ে ভীত নহি। আজি সমস্ত দিন আমি এই গ্রামেই থাকিব; তোর রাজা সকল ফৌজ লইয়া আমাকে ধরিতে আসিলেও আমি ভয়ে পলাইব না। এক্ষণে আয় তুই হতভাগা, আমি এই ব্রাহ্মণদিগের সমক্ষে তোর পাপ-কলেবর চূর্ণ করিব।"

জড়-পুত্তলির ন্যায় গোমস্তা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল; তখন শম্ভুরাম তাহার পাইক দুইজনকে বলিলেন, "এই হিন্দু-কুল-কলঙ্ক নরাধমকে আমার নিকট ধরিয়া আন্।"

তখন অবাধে পাইকেরা আপনাদের প্রভুকে চাপিয়া ধরিল এবং টানিয়া আনিয়া শম্ভুরামের নিকট উপস্থিত করিল। তখন নিরুপায় গোমস্তা সজল-নয়নে শম্ভুরামের চরণ ধারণ করিল। শম্ভুরাম বলিলেন, "তোর প্রতি দয়া করিলে পাপ হইবে। আমি জানি, তুই এখন মুক্তি-লাভ করিয়া, যেমন জঘন্য জীব তুই চিরকাল আছিস্, পুনরায় তাহাই হইবি। তোর মত কীটকে টিপিয়া মারাই উচিত।"

গোমস্তা বলিল, "আর না—আপনার চরণের ধূলা গায়ে লাগায় আমার প্রাণে এক আশ্চর্য্য ভাব হইয়াছে; আমি নূতন চক্ষুতে সংসার দেখিতেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা না করুন, তাহাতে আর দুঃখ নাই। আমি যেরূপ জঘন্যভাবে জীবন কাটাইয়া আসিয়াছি, তাহাতে আপনার হাতে মরাই আমার সৌভাগ্য। বুঝিয়াছি. ডাকাইত শম্ভুরাম নর-দেবতা। দয়াময় দেব! দয়া করিয়া এ অধমকে ক্ষমা কর।"

মর্ম্মভেদী অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টিতে শম্ভুরাম কিয়ৎকাল গোমস্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, "উঠ, ঐ দেবীগণের ঐ বৃদ্ধ ভূদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

গোমস্তা কাঁপিতে কাঁপিতে সেই ব্রাহ্মণীদিগের নিকট আছড়াইয়া বলিল, "মা! ভগিনী! কন্যা! আপনারা অধম সন্তানবোধে, পিতা-বোধে এই দুরাচারকে ক্ষমা করুন। ঈশ্বর আমাকে না। কিন্তু আপনারা দয়ার সাগর, আর আমি কি বলিব? ঠাকুর মহাশয়, কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইয়াছেন; আমি যাব-করিয়া আপনাকে প্রসন্ন করিবার উপায় করিতে পারিতাম; তাহার আর সময় নাই। কিন্তু আমি আপনার চরণ স্পর্শ

করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যত দিন এ নরাধমের পাপ-দেহে জীবন থাকিবে, তত দিন আমি কায়মনোবাক্যে আপনার সন্তান-সন্ততির হিত-চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিব।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তোমার কল্যাণ হউক। প্রভুর কার্য্যে, প্রভুর আদেশে তুমি অনেক অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার প্রভুই অপরাধী। আমরা অকপট-চিত্তে তোমাকে ক্ষমা করিতেছি।"

গোমস্তা বলিল, "এত দিন প্রেতের দাসত্ব করিয়াছি, এখন দেবসেবা করিব। যাঁহাকে ডাকাইত বলিয়া আমরা প্রচার করি, তিনি প্রত্যক্ষ ভগবান্। আমি অতঃপর ভগবানের আদেশমত কার্য্য করিব।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "আইস, তুমি দয়াময় দেবতাদিগের ক্ষমা লাভ করিয়াছ; তাঁহাদের চরণে পুনরায় প্রণাম করিয়া এই দিকে আইস, দেখ, তোমার সঙ্গের এই দুইটী লোক কিরূপ আঘাত পাইয়াছে। যদি ইহারা অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাদিগকে ডুলি করিয়া বাটীতে পাঠাইয়া দাও, ইহাদের শুশ্রূষার নিমিত্ত পাঁচ পাঁচ টাকা দাও। কাহারও অনিষ্ট করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; নিরুপায় হইয়াই ইহাদিগকে আঘাত করিয়াছি। ভাই সব! তোমরা আমার দ্বারা বিশেষ যন্ত্রণা পাইয়াছ, এজন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করিবে।"

তৎক্ষণাৎ শম্ভুরাম আপনার বস্ত্রমধ্য হইতে ২০৲ টাকা বাহির করিলেন; দশ টাকা গোমস্তার হস্তে প্রদান করিয়া বাকী দশ টাকা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চরণ-সমীপে স্থাপন করিলেন;—বলিলেন, "আপনার পথ্য হয় নাই। বাটীর কাহারও আহার হয় নাই। মা, ভগিনি! আপনারা

বাটীর মধ্যে যান। সম্প্রতি আর কোন চিন্তার কারণ নাই। রোগীর শুশ্রূষায় এক্ষণে মনঃসংযোগ করুন।”

চক্রবর্তীর দুহিতা ও পত্নীর নয়নে তখন জল। চক্রবর্তী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না; কিন্তু কাহারও কোন কথা শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া শম্ভুরাম সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, পশ্চাতে সুস্থ পাইক দুই জন তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। জিজ্ঞাসিলেন, “তোমরা আমার সঙ্গে কেন?”

একজন পাইক উত্তর দিল, “তবে কোথায় যাইব?”

সেই সময় গোমস্তাও বেগে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, “লোক দুইটার আঘাত গুরুতর হয় নাই। কয়েক দিন শুশ্রূষা হইলে ইহারা সুস্থ হইবে। ইহাদিগকে এখনই বাটী পাঠাইয়া দিতেছি, তাহার পর আমি কোথায় আপনার সহিত মিলিব?”

শম্ভুরাম বলিলেন, “যদি তোমরা সত্য সত্যই আমার সহিত থাকিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে সন্ধ্যার পর বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রে আমার নিকট যাইও। আমি সমস্ত রাত্রি সেই স্থানে থাকিব।”

পাইকদ্বয় এবং গোমস্তা শম্ভুরামকে প্রণাম করিল। শম্ভুরাম বেগে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কি রমণীয় স্থান! বক্রেশ্বর পুণ্যতীর্থ, পরম রমণীয় ক্ষেত্র। এই স্থানে ইতিহাস-নির্দ্দিষ্ট কালের বহুকাল পূর্ব্বে যোগশাস্ত্রের আদি-গুরু-স্বরূপ মহর্ষি অষ্টাবক্র সাধনাবলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সেই মহা-পুরুষ বক্রেশ্বর নামে মহাদেব-মূর্ত্তি এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই দেবমূর্ত্তির নামানুসারে এই স্থান বক্রেশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছে। বক্রেশ্বর-দেবের মন্দির পূর্ব্বমুখী। কিংবদন্তী ঘোষণা করিতেছে, তাহা বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত। মন্দিরের বামপার্শ্বে শ্বেতগঙ্গা, দক্ষিণে পাপহরা ও বৈতরণী। মন্দির ও পুণ্যতোয়া পাপহরার মধ্যে কয়েকটি কুণ্ড, এই দেবনদী ও কুণ্ড সমূহে ভোগবতীর পবিত্র সলিল নিয়ত উত্থিত হইতেছে। কোন কোনটির জল নিরতিশয় উষ্ণ, কোন কোনটির জল নাত্যুষ্ণ এবং কোন কোনটির জল নিতান্ত শীতল। এই ক্ষেত্রে ইন্দ্র-চন্দ্রাদি দেবগণ বিভিন্ন সময়ে স্ব স্ব পাপক্ষয়ের নিমিত্ত তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। দেব-গণের সেই পবিত্রানুষ্ঠানের নিদর্শনস্বরূপে কুণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই দেবখাত-সমূহের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস সন্নিবিষ্ট আছে। এই স্থানে পতি-নিন্দা-শ্রবণে বিগতজীব শিব-সীমন্তিনীর সুদর্শন-চক্র-বিভক্ত পূত-দেহের অংশবিশেষ নিপতিত হইয়াছিল। সেই স্থানে ভগবতী আদ্যাশক্তির এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্থানে যোগগুরু দত্তাত্রেয়ের চরণচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতের যে চারি পবিত্র স্থানে অক্ষয়বট বিদ্যমান আছে বলিয়া শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত, বক্রেশ্বর তাহার

অন্যতম। এখনও সেই পবিত্র পাদপ এই স্থলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বক্রেশ্বর মহাদেব-মন্দির বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাপ্রকার শিবমন্দির। দেখিলেই মনে হয়, যেন ইহা কৈলাসপতির রম্য নিকেতন, যেন মঙ্গল-বিধাতা মহেশ্বর সর্ব্বত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত। শ্রীভগবান্-চৈতন্য-প্রেমপুলকিত অদ্বৈত এই ক্ষেত্রে হরিসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অক্ষয়বট-সমীপে তাঁহার চরণচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বক্রেশ্বর মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে শ্বেতগঙ্গার অপর-পারে ভৈরবনাথের যোগস্থান। তথায় এক বিশাল মহীরুহ বিদ্যমান। শুনিতে পাওয়া যায় মূলবৃক্ষ বহুদিন ধ্বংস হইয়াছে; অধুনা তাহার এক শাখামাত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিধি প্রায় দশ হস্ত হইবে। বৃক্ষ শূন্যগর্ভ অথচ পরম রমণীয় ও সতেজ। এই বৃক্ষের অনুরূপ বৃক্ষ নিকটবর্ত্তী কোথাও নাই। ইহা শাল্মলী বৃক্ষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই পাপহরা ও বৈতরণীর কূলে শ্মশানভূমি; সন্নিহিত জনপদের শব-সমূহ এই স্থলে [illegible] ভস্মে পরিণত হয়। প্রতিদিন বহুসংখ্যক চিতা এই স্থলে [illegible]র শরীর বিকটহাস্য ও বিদ্রূপসহকারে নিঃশেষ করিতেছে। এই শ্মশান[illegible]নির অনতিদূরে দক্ষিণমুখে শ্মশান-কালিকার মন্দির। তন্মধ্যে [illegible] ভয়ঙ্করী দিগম্বরী মূর্ত্তি। মূর্ত্তি সার্দ্ধহস্ত-পরিমিত। এই [illegible] পুণ্যক্ষেত্র অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পরিবেষ্টন করিয়া রজতসূত্রবৎ স্বচ্ছ-[illegible] বক্রেশ্বর নদ প্রবাহিত। সমস্ত কুণ্ডের এবং পাপহরা প্রভৃতির [illegible] জলসমূহ এই নদে পতিত হইতেছে। যখন নিদারুণ তাপে [illegible] হইতে থাকে, তখন বক্রেশ্বর-গর্ভে অতি সূক্ষ্ম-ধারায় [illegible] প্রবাহিত হয়, কিন্তু প্রাবৃট্‌কালের কোন কোন দিন নদীর

বারি-রাশি তীর অতিক্রম করিয়া অতি খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর দিন রাত্রি ১০টার সময় বক্রেশ্বরের ভৈরবনাথের বিশ্রামপাদপমূল হইতে সহসা একটা উৎকট বংশীধ্বনি উঠিল। তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বদিকের এক জীর্ণ শিবমন্দির হইতে উল্লিখিত বংশীধ্বনির অনুরূপ এক প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হইল। এক ব্যক্তি নিশার অন্ধকারে আচ্ছন্নকায় হইয়া বৃক্ষতল হইতে শব্দ সমুৎপাদন করিয়াছিল, সে এক্ষণে অনুরূপ শব্দ শ্রবণে তদভিমুখে অগ্রসর হইল। অসংখ্যপ্রায় শিবমন্দিরের মধ্যে এক জীর্ণ দেবালয়-সমীপে উপস্থিত হইয়া সে জিজ্ঞাসিল, "গুরুদেব কি এখানে?"

মন্দির হইতে উত্তর হইল, "হাঁ, ভিতরে আইস।"

বলা বাহুল্য, উত্তরকারী পুরুষ শম্ভুরাম। লোক ভিতরে প্রবেশ করিয়া এক পুরুষকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "ঠিক হইয়াছে। ত্রিশ জন অস্ত্রধারী পুরুষের সহিত এক গাড়ী টাকা চালান হইতেছে। এতক্ষণে চন্দ্রপুর ছাড়াইল।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "উত্তম। আর বিলম্বে কাজ নাই, আমাদের কয়জন লোক সঙ্গে আছে?"

দূত উত্তর দিল, "দশজন মাত্র।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তাহাই যথেষ্ট। আমি স্বয়ং সঙ্গে থাকিব।"

দূত বলিল, "তাহা হইলে সহস্র লোক বিপক্ষে থাকিলেও ভয় কি?"

শম্ভুরাম আবার জিজ্ঞাসিলেন, "ঘোড়া আছে ত?"

দূত উত্তর দিল, "প্রত্যেকেরই ঘোড়া আছে।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তবে চল।"

তখন সেই ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া শম্ভুরাম ও দূত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথের সকল দিকে সকল বৃক্ষের তলে, সকল প্রান্তরে, নর-নারী, শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই মুখে এক কথা। সকলেই বলিতেছে, "আজি শম্ভুরামের দেখা পাওয়া যাইবে, আজি দুঃখ দূর হইবে।"

পথে শম্ভুরাম ও দূতকে অনেকে জিজ্ঞাসিতে লাগিল, "তোমরা চলিয়া যাইতেছ কেন? শম্ভুরামের সাক্ষাৎ অদ্যই পাইবে; যদি দুঃখ জানাইতে আসিয়া থাক, তাহা হইলে চলিয়া যাইও না; অপেক্ষা কর, বাসনা মিটিবে।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "মা সব! ভাই সব! আমরা কোথাও যাইতেছি না। শম্ভুরাম এখনও আইসেন নাই। তাই একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছি।"

প্রার্থীদিগের মধ্যে একজন বলিল, "তাঁহার কথা ত অন্যথা হইবে না। আজি চারিদিকে ঘোষণা হইয়াছে, তিনি এই স্থানে বসিয়া সকলের প্রার্থনা শুনিবেন, তাই নিকটের ও দূরের কত লোকই তাঁহার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত আসিয়াছে। কেহ বৃদ্ধ, কেহ অক্ষম, কেহ গর্ভিণী, কেহ বা শিশুর জননী।"

শম্ভুরাম আবার বলিলেন, "যাহারা যে কামনায় আসিয়াছে, তাহাদের সে কামনা অবশ্য সফল হইবে। শম্ভুরাম নিশ্চয়ই আসিবে।"

চন্দ্রপুর ছাড়াইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে বন্যপথ দিয়া বাস্তবিকই একখানি গরুর গাড়ী চলিতেছিল। শকটের উপর বস্তায় বস্তায় এক গ

টাকা। শকটের সম্মুখে উলঙ্গ অসিধারী ছয় জন বীর-পুরুষ। শকটের উভয় পার্শ্বে পাঁচ পাঁচ জন এবং পশ্চাতে ছয় জন যোদ্ধা। যে ব্যক্তি শকট চালাইতেছে, সেও সশস্ত্র বীর। শকটের উপরেও চারিজন যোদ্ধা। সকলের পুরোভাগে অশ্বপৃষ্ঠে বিশাল বলশালী এক নির্ভীক যোদ্ধা এবং পশ্চাতে দুই জন অশ্বারোহী বীর। এতদ্ভিন্ন সম্মুখে ও পশ্চাতে কয়েকজন আলোকধারী লোক চলিতেছে। সকলের পশ্চাতে আর একখানি গো-যানে এই সকল লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও বস্ত্রাদি সঙ্গে যাইতেছে।

গাড়ীতে নগররাজের অর্থ চলিতেছে। রাজার আজ্ঞায় সংগৃহীত সমস্ত অর্থ রাজকর্ম্মচারিগণ স্থরি হইতে নগরে পাঠাইতেছেন। তখন দেশমধ্যে দস্যুভয় অতি প্রবল ছিল; কিন্তু নগররাজের অর্থে হস্তক্ষেপ করিতে কাহারও সাধ্য ছিল না। রাজার যেরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও প্রবল শাসন, তাহাতে তাঁহার অর্থ বিনা রক্ষীতে প্রেরিত হইলেও কোন আশঙ্কা ছিল না। তথাপি সাবধানতার অনুরোধে, বিশেষতঃ অর্থের পরিমাণাধিক্য হেতু রাজ-কর্ম্মচারিগণ সঙ্গে আবশ্যকাধিক সশস্ত্র রক্ষী নিযুক্ত করিয়াছেন।

রাজার ধন,পরিজন বা বিষয়-সম্পত্তির বিরুদ্ধে ভ্রমেও কোন দুষ্ট লোক কোন প্রকার অত্যাচার করিত না; সুতরাং রাজ-ভাণ্ডার সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ্ ছিল। রাজার আত্মীয়-স্বজনগণ সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিঘ্নে ছিলেন। অতএব রাজা প্রজার কিরূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা ভাবিবার বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিবিধান করিবার কোনই আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। রাজস্ব-সংগ্রহের নিমিত্ত সুকঠিন ব্যবস্থা ও স্বকীয় ভোগ-

বিলাসের সকল প্রকার আয়োজন করিয়া রাজা নিশ্চিন্ত ছিলেন। প্রজার আপদ্-বিপদের কথা, সুখ-দুঃখের কথা শুনিয়া তিনি সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেন না, তাহা শুনিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও তাঁহার মনে হইত না।

গাড়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। রক্ষিগণ ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতেছে। সম্মুখের তিন জন রক্ষী উৎকট-শব্দে একটা অশ্লীল গান ধরিয়াছে। পশ্চাতের তিন জন সেই গানের দোহারকি করিতেছে। কেহ কেহ সেই সরস সঙ্গীতের আনন্দ উপভোগ করিয়া হাস্য করিতেছে। কেহ কেহ করতালির দ্বারা গানের তাল দিতেছে। কেহ কেহ উচ্চ-শব্দে গায়কের প্রশংসা করিতেছে। বড়ই আনন্দের সহিত এই সম্প্রদায় নৈশ-পর্য্যটন সম্পাদন করিতেছে।

সহসা গভীর রাত্রির শান্তি বিধ্বংস করিয়া, দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রকম্পিত করিয়া, চতুর্দ্দিকের সুপ্ত বা অর্দ্ধ-সুপ্ত জীবের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার করিয়া, 'হো হো' শব্দে তুমুল চীৎকার উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভঞ্জনের ন্যায় বেগে বহু অশ্বারোহী আসিয়া সেই সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিল। রক্ষকেরা সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই কাহারও হাত ভাঙ্গিল, কাহারও পা ভাঙ্গিল, কাহারও মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল, কেহ বুকে আঘাত পাইয়া বসিয়া পড়িল, কেহ বা অজ্ঞান হইল। এত অল্পসময়ের মধ্যে এই অচিন্তিতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইল যে, রক্ষিগণ কেহই সাবধানতার সময় পাইল না; কেহই শত্রুনিপাতের ব্যবস্থা করিতে পারিল না; সকলকেই সাধ্যমতে কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত থাকিতে হইল। সহসা যেন শার্দ্দূল আসিয়া হরিণী-পালকে বিত্রস্ত করিল; যেন প্রবল ঝটিকা আসিয়া পত্র-পুষ্প উড়াইয়া দিল।

শকট অধিকৃত হইল। আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শকটস্থিত চালক মূর্চ্ছিত হইল এবং শকটোপরিস্থিত রক্ষিগণ ভূপতিত হইল। তখনও পঞ্চদশ জন রক্ষী সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম। তিন জন অশ্বারোহী পূর্ব্বেই অচৈতন্য অবস্থায় ভূপতিত হইয়াছিল, ভৃত্য এবং আলোকধারী লোকেরা পলায়ন করিল। পশ্চাতের গাড়ী ফেলিয়া চালক বনমধ্যে লুকাইল। সেই পঞ্চদশ রক্ষী সম্মিলিত হইয়া দস্যুদলকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ করিল। একজন বলিল, "জানিস্ তোরা, এ কাহার টাকা? বুঝিয়াছিস্ তোরা, কাহার গায়ে আঘাত করিয়াছিস্? এ টাকা কোন গৃহস্থের নহে, কোন জমিদারের নহে, ইহা মহামান্য রাজার টাকা, তোরা কোন্ সাহসে লইতে আসিয়াছিস্? তোরা যদি পর্ব্বতের গুহায়, গভীর জলে লুকাইয়া থাকিস্, তাহা হইলেও ধরা পড়িবি! তোদের টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিবে। স্ত্রী, কন্যা, মা, ভগ্নী, বে-ইজ্জত হইবে, বাড়ী-ঘর ছাই হইয়া যাইবে। তোদের সর্ব্বনাশ হইবে। নির্ব্বোধ ডাকাইত, এখনও সরিয়া যা!"

আক্রমণকারী এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিল, "তোমার তত্ত্বোপদেশ শিরোধার্য্য; কিন্তু তুমি বড়ই ভুল বুঝিয়াছ। আমি শম্ভুরাম; আমাকে ডাকাইত বলিলে তোমার যদি সন্তোষ হয়, তুমি বলিতে পার। আমি ইহা নগরের রাজার টাকা জানিয়াই, আমার ন্যায্য প্রাপ্যবোধে গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। কোন গৃহস্থের টাকা হইলে, কোন ধার্ম্মিকের টাকা হইলে আমি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতাম না। বরং ইহা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে যথাস্থানে পৌছে, তাহার সুব্যবস্থা করিতাম।"

যে রক্ষী কথা কহিয়াছিল, সে আবার বলিল, "তু—তু—আপনি—শম্ভুরাম! রাজার অর্থ-গ্রহণে আপনার অধিকার নাই; বিপদ্ ভয়ানক হইবে।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তোমার রাজার দ্বারা আমার কোনই বিপদ্ ঘটিতে পারে না। যে দুরাত্মা ধর্ম্মের সম্মান রাখিতে জানে না, তাহার কোন সামর্থ্য থাকা অসম্ভব। অধিকারের কথা বলিতেছ? আমি ভবানীর দাস, ভবানীর আদেশে অত্যাচারীকে দমন করিয়া সাধুজনের সাহায্য করিতে আমি নিযুক্ত। ইহা ব্যতীত আর কোন অধিকারের কথা আমি জানি না; জানিতে যেন আমার মতিও না হয়। তোমরা দুর্ব্বল, তোমাদিগকে হত্যা করিতে আমার ইচ্ছা নাই। কাহারও রক্তপাত করিতে, কাহারও জীবন নাশ করিতে আমি সদা অনিচ্ছুক। নিতান্ত দায়গ্রস্ত না হইলে নরহত্যায় লিপ্ত হইতে আমি চাহি না। তোমাদিগের সহিত আমার শত্রুতা নাই। যদি প্রাণের মমতা থাকে, যদি অঙ্গহানি ঘটাইতে বাসনা না থাকে, তাহা হইলে আমি উপদেশ দিতেছি, তোমরা পলায়ন কর।"

রক্ষিগণ কিয়ৎকাল চিন্তা করিল। শম্ভুরাম আবার বলিলেন, "আমি তস্কর বা দস্যুর ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকিব না, তোমরা ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের পিশাচ প্রভুকে সকল সংবাদ জানাইতে পার। আমি সম্প্রতি বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রে অপেক্ষা করিব। তোমাদের রাজা যদি সাহস করেন, যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সে স্থানে আসিয়া অনায়াসে আমাকে দেখিতে পাইবেন, এক্ষণে আমার সময় নাই। আমি অনর্থক কালব্যাজ করিতে পারিব না। হয় তোমরা আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হও, নচেৎ পলায়ন কর।"

রক্ষিগণ আবার চিন্তা করিল, আবার তাহারা কি পরামর্শ করিল, তাহার পর বলিল, "আপনার সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত

নহে। দেখিতেছি, আপনার সঙ্গে অনেক লোক নাই, তথাপি বুঝিতেছি, ইচ্ছা করিলে আপনি একাই আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারেন; অতএব বৃথা যুদ্ধ অনাবশ্যক। আমরা প্রস্থান করাই উচিত বলিয়া স্থির করিতেছি।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "উত্তম। আমি তোমাদিগের নরাধম প্রভুর নিকট দশ হাজার টাকা চাহিয়াছিলাম,সে তাহা পাঠায় নাই। এ জন্য বল-পূর্ব্বক তাহার টাকা আমি গ্রহণ করিতেছি। এরূপ সুযোগ না ঘটিলে আমি তাহার রাজকোষ ভাঙ্গিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রহণ করিতাম। লুকাইয়া ডাকাইতের ন্যায় আমি এ কার্য্য করিতে আসি নাই। তোমরা পলায়ন করিবার সঙ্কল্প করিয়া ভালই করিয়াছ। কিন্তু তোমরা তোমাদিগের নিষ্ঠুর প্রভুর ন্যায় হৃদয়হীন ব্যবহার করিও না। এই আহত ব্যক্তিদিগকে গাড়ীতে করিয়া সঙ্গে লইয়া যাও। তোমাদিগের সকলের অস্ত্র-শস্ত্র আমি গ্রহণ করিব, টাকা আমরা প্রত্যেকেই ভাগ করিয়া অশ্বের উপর উঠাইয়া লইব।"

রক্ষিগণ নীরব। শম্ভুরাম আবার বলিলেন, "যদি তোমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক অস্ত্রত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমাকে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে।"

তখন শম্ভুরামের আদেশে দুই জন অনুচর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ভূপতিত আহত ব্যক্তিগণের অসি, বর্শা প্রভৃতি সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ করিল; তাহার পর নির্ভীকভাবে তাহারা সেই পঞ্চদশ ব্যক্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তখন সেই রক্ষিগণ বৃথা প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন বোধে অবাধে স্ব স্ব অস্ত্র দেহ হইতে মুক্ত করিয়া প্রক্ষেপ করিল। শম্ভুরামের লোকেরা

তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া সরিয়া আসিল। শম্ভুরাম উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তোমরা নিষ্কৃতি পাইলে, প্রস্থান কর।"

তখন শম্ভুরামের আদেশে শকটের সমস্ত অর্থ প্রত্যেক অশ্বারোহী সম্ভবমত ভাগে বণ্টন করিয়া লইল এবং পশ্চাতে বা পার্শ্বে কোন দৃষ্টিপাত না করিয়া বেগে অশ্ব চালাইয়া দিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে বক্রেশ্বর-দেবমন্দিরের পূর্ব্বভাগস্থিত প্রান্তরে অত্যদ্ভুত দানকাণ্ড আরব্ধ হইল। একে একে বহু প্রার্থী শম্ভুরামের সম্মুখে আনীত হইতে লাগিল। কেহ গৃহশূন্য, কেহ অন্নহীন, কেহ রোগ-পীড়িত, কেহ প্রবল অত্যাচারীর উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত, কেহ রাজকীয় শাসনে প্রপীড়িত, কেহ পীড়িত স্বজনের ঔষধ-পথ্যাভাবে চিন্তাক্লিষ্ট। সকলেই সম্ভবমত—প্রয়োজনমত সাহায্য প্রাপ্ত হইল। যাহাদিগকে অর্থ-সাহায্যের অতিরিক্ত অন্যপ্রকার সহায়তা করিবার আবশ্যক, শম্ভুরাম তাহাদিগকে তদ্বৎপ্রাপ্তির উপায় করিয়া দিলেন। যাহাদিগের জন্য অন্যকে শাসন করিবার আবশ্যক অথবা প্রবলকে খর্ব্বীকৃত করিবার প্রয়োজন, শম্ভুরাম তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। সেই নৈশ গগন বিদীর্ণ করিয়া অগণ্য কণ্ঠ হইতে ডাকাইত শম্ভুরামের জয়-ঘোষণা হইল। সেই পবিত্র পুণ্যতীর্থে অসংখ্য মানব হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে শম্ভুরামকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সেই জাগ্রত-দেবাধিষ্ঠিত যোগ-প্রদীপ্ত শ্মশান-ক্ষেত্রে বিগতজীব সংখ্যাতীত শবমণ্ডলীও যেন চিতাভস্মরাশি হইতে উত্থিত হইয়া দেবকলেবর ধারণ পূর্ব্বক মহোল্লাসে সেই দেবোপম শম্ভুরামের কল্যাণকামনা করিতে লাগিল। তখন যেন সেই অগণ্য মন্দিরে, অগণ্য দেবতা সশরীরে আবির্ভূত হইয়া তারস্বরে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল কম্পিত

করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "পরার্থে যে কার্য্য করিতে শিখিয়াছে, স্বার্থ-বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর পরহিতে যে আত্ম-নিয়োজন করিয়াছে, দুর্ব্বলের রক্ষার নিমিত্ত যে প্রবলকে পরাভূত করিতে অভ্যাস করিয়াছে, সেই মহাত্মাই দেবতা। সেই দেবতার স্তুতিগান করিয়া দেবত্ব লাভ কর!"

সমস্ত রাত্রি দান-ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইল। অক্লান্ত, অবিচলিত ভাবে শম্ভুরাম প্রার্থীর আবেদন শ্রবণ ও তাহাদিগের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নিশার অন্ধকার নাশ করিয়া পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে নবোদিত ভাস্করের আরক্তিম জ্যোতি প্রকটিত হইল। তখনও শম্ভুরামের এই পরহিতব্রত সমান চলিতেছে। তখনও সকল প্রান্তর, সকল রাজপথ দিয়া সাহায্যপ্রার্থী নর-নারী, কেহ বা ধীরে ধীরে, কেহ বা ব্যস্ততা সহ গৃহে ফিরিতেছে। সর্ব্বত্রই শম্ভুরামের এই অনৈসর্গিক দানকীর্ত্তির সংঘোষণা বিঘোষিত হইল। ব্রাহ্মণ-পুত্রের যথাকালে উপনয়ন হইতেছে না, কন্যার বিবাহাভাবে দরিদ্রের জাতি-কুল যাইতেছে, অর্থাভাবে পরলোকগত পিতৃপুরুষের পিণ্ডপ্রাপ্তির উপায় হইতেছে না, নিতান্ত দরিদ্রতা হেতু পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবসেবার ব্যাঘাত ঘটিতেছে, ইত্যাকার প্রার্থিগণও প্রভূত সাহায্য পাইল। সকলেই মনোরথ-সিদ্ধি-জনিত প্রফুল্লতা সহ প্রস্থান করিল। দশ ক্রোশের অধিক দূরবর্ত্তী লোকও এই দান ব্যাপারে ভিক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হইয়াছিল। শম্ভুরামের বিধিক্রমে দূরাগত ব্যক্তিরা অগ্রে সাহায্য লাভ করিয়া প্রস্থান করিল; অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী লোকেরা পরে সাহায্য পাইল। বেলা দেড় প্রহরের সময় দান ব্যাপার শেষ হইল। তখন শম্ভুরামের লুণ্ঠিত অর্থের মধ্যে শত-মুদ্রা মাত্র

অবশিষ্ট রহিল না। সেই শত মুদ্রা হস্তে লইয়া শম্ভুরাম একজন অনুচরকে বলিলেন, "এ মুদ্রায় আমার কোন অধিকার নাই। ইহা কি করিবে, স্থির করিতেছ?"

অনুচর উত্তর দিল, "পরোপকারের জন্য ইহা আপাততঃ [illegible] থাকুক।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শম্ভুরাম গাত্রোত্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ, বিবিধ শারীরিক ক্লেশ প্রভৃতি কারণে শম্ভুরামের লৌহ-নির্ম্মিত কঠিন কলেবর কিঞ্চিন্মাত্রও ক্লান্ত হইল না। সমস্ত রাত্রির অনাহারেও বিন্দুমাত্র ক্ষুৎ-পিপাসা তাঁহাকে প্রপীড়িত করিল না। আপাততঃ এখানকার কর্ত্তব্য সমস্ত সম্পন্ন হইয়াছে বুঝিয়া, তিনি অনুচরকে ইঙ্গিতে অশ্ব আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

তৎক্ষণাৎ এক ক্ষীণ, কৃষ্ণকায়, দীর্ঘদেহ, নর্ত্তনশীল অশ্ব তাঁহার নিকট আনীত হইল। সঙ্গী দশজন স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ করিয়া উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। শম্ভুরামের প্রিয় অশ্ব 'লাল' নামে পরিচিত। এই 'লাল' বহুদিন বহু বিপদ্ হইতে অক্লান্ত-শরীরে শম্ভুরামকে রক্ষা করিয়াছে। এই 'লাল' সগর্ব্বে শম্ভুরামকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া বহুদিন বহু বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। এই 'লাল' সানন্দে অবহেলে প্রভুকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফ দিয়াছে; দুরতিক্রম্যা বেগবতী স্রোতস্বিনী অতিক্রম করিয়াছে। বহু শার্দ্দূল ও ভল্লুকাদির সম্মুখে সে অবিকৃত-চিত্তে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং অনায়াসে আপনার জীবন শত-সহস্রবার বিপন্ন করিয়াও প্রভুকে উদ্ধার করিয়াছে।

শম্ভুরাম লালের নিকটস্থ হইয়া পরম স্নেহে তাহার কণ্ঠে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন। অশ্ব বারংবার মস্তক আন্দোলন করিয়া আনন্দ প্রকাশ ও প্রভুকে সম্মান জ্ঞাপন করিতে লাগিল। শম্ভুরাম অশ্বারোহণে

উদ্যত হইতেছেন, এমন সময় আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত সেই গোমস্তা ও দুই জন পাইক দূর হইতে শম্ভুরামকে প্রণাম করিল।

তাহারা গত রাত্রিতে বক্রেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি তাহারা এই অলৌকিক দেবলীলার অভিনয় দর্শন করিয়াছে; এক-বারও তাহারা শম্ভুরামের নিকটস্থ হইতে সুযোগ পায় নাই।

তাহাদিগকে দর্শনমাত্র শম্ভুরাম বলিলেন, "এই যে তোমরা আসিয়াছ। আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমরা রাজার নিকট গিয়া আমার সংবাদ জানাইবে; আমাকে ধরাইয়া দিয়া প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করিবে।"

করযোড়ে গোমস্তা বলিল,"আমরা যেরূপ অধম,আমরা যেরূপ দুরাচার, তাহাতে এ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হয় নাই। কিন্তু দেবতার চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার নয়নে নয়ন মিলাইয়া আমরা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অধীন হইয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের প্রতি আপনি যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহা ভিন্ন আমরা আর কিছুই করিব না, আমরা স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছি।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "উত্তম; আপাততঃ তোমাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় আছে?"

গোমস্তা বলিল, "উপায় ছিল, কিন্তু আর থাকিবে না। আমাদিগকে অদ্যই হউক বা কল্যই হউক, ঘোর নির্যাতনের অধীন হইতে হইবে। আমাদের জীবন আর আমাদের স্ত্রী-পুত্রাদির জীবন থাকিবে কি না সন্দেহ।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তবে কি উপায় স্থির করিয়াছ?"

গোমস্তা বলিল, "উপায় অনুপায় সকলই আপনি।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "সকলকে লইয়া তোমরা পলায়ন কর। আগামী অমাবস্যার দিন দুবরাজপুরের পাহাড়ে উপস্থিত থাকিও, তাহার পর যাহা আবশ্যক, তাহার ব্যবস্থা আমি করিব। আপাততঃ আমার হস্তে প্রায় একশত টাকা আছে, ইহা আমি তোমাকে দিতেছি। নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইলে এই অর্থ তোমরা তিন জনে ব্যয় করিবে।"

যে অনুচরের নিকট টাকা ছিল, শম্ভুরামের ইঙ্গিতে সে তাহা গোমস্তার নিকট ফেলিয়া দিল। গোমস্তা ও পাইকেরা শম্ভুরামকে পুনরায় ভক্তি সহকারে প্রণাম করিল। তখন প্রসন্নবদন নির্ভীক শম্ভুরাম অশ্বারোহণ করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দুই পদও অগ্রসর হইতে হইল না। তিনি দেখিতে পাইলেন, পার্শ্বস্থ প্রান্তরে শতাধিক অশ্বারোহী সৈন্য 'মার্ মার্' শব্দে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই আক্রমণকারীরা রাজার সৈন্য। শম্ভুরামের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রাজার কর্ণগোচর হইয়াছে। গোমস্তা রাজকার্য্যসাধনে যেরূপে গত কল্য স্থূরি গ্রামে ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, যেরূপে রাজা অপমানিত হইয়াছেন, তাহার প্রত্যেক সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে। তাহার পর গত রাত্রিতে যেরূপে তাঁহার প্রভূত অর্থ শম্ভুরাম কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে শম্ভুরাম যে সকল দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করিয়াছে, তাহাও রাজার অবিদিত নাই। তিনি ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়াছেন। শম্ভুরামের অনেক রাজ-দ্রোহিতার সংবাদ এ কাল পর্য্যন্ত তিনি শুনিয়া আসিতেছেন। ক্রমেই শম্ভুরামের ব্যবহার অসহনীয় বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে। অবশেষে এই দুর্দ্দান্ত দস্যুর ব্যবহার তিনি নিতান্ত বিরক্তিকর বোধে অবিলম্বে

তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যে ব্যক্তি ডাকাইত শম্ভুরামের ছিন্ন-মস্তক রাজ-সমীপে লইয়া যাইতে পারিবে অথবা তাহাকে সজীবাবস্থায় আবদ্ধ করিয়া রাজার সমীপে উপস্থিত করতে পারিবে, সে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইবে। শতাধিক নির্ব্বাচিত রাজসৈন্য এই দুষ্কর কার্য্যসাধনের নিমিত্ত প্রধাবিত হইয়াছে।

রাজার প্রেরিত এই আক্রমণকারিগণের মধ্যে একজন নায়ক ছিলেন। চীৎকার করিয়া সেই সেনানায়ক বলিয়া উঠিলেন, "যে ঐ ঘোড়ায় উঠিতেছে, সেই শম্ভুরাম। চারিদিকে ঘেরিয়া ফেল, যেন পলাইতে না পায়।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "শম্ভুরাম কখনও পলাইতে জানে না, যদি শম্ভুরাম চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে কেহই পারে না। প্রাতঃকালে এই পবিত্রক্ষেত্রে নরহত্যা করিতে না মানুষের রক্তপাত করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তোমরা কি চাও?"

নায়ক বলিলেন, "তোমার মুণ্ড।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "যে দিন ভগবানের ইচ্ছা হইবে, যে দিন আমার সম্প্রদায়ে পাপ প্রবেশ করিবে, যে দিন আমি বা আমার কোন লোক নিজের সুখের জন্য কর্ত্তব্য ভুলিবে, সেই দিন—সেই দণ্ডে আমার মুণ্ড দেহচ্যুত হইবে। পুত্রঘাতি! ছি! তোমরা যে রাজার লোক, সে অতি দুরাচার হইলেও তাহাকে বা তাহার কোন লোককে বধ করিতে আমি ইচ্ছা করি না।"

নায়ক বলিলেন, "তুমি বড়ই স্পর্দ্ধিত দস্যু। তুমি কাহাকেও বধ কর বা না কর, তোমাকে বধ করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তবে আইস।"

তৎক্ষণাৎ ধনুকে শর যোজনা করিয়া শম্ভুরাম সন্ধান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেনা-নায়কের দক্ষিণ বাহুমূল বিদ্ধ হইয়া গেল। তিনি যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিতে করিতে সরিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার অনুচরগণ অতি ক্রোধে চতুর্দ্দিক্ হইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন নায়কের সহিত যে সমস্ত লোক আসিয়াছিল, তাহারা শম্ভুরামের অগ্রে ও পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হস্তস্থিত প্রকাণ্ড লাঠি ঘুরাইতে লাগিল। লাঠিখেলায় তাহাদের অদ্ভুত নিপুণতা দেখিয়া শম্ভুরামও বিস্মিত হইলেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ দুই জনকে নিপাত না করিতে পারিলে বিপক্ষগণের একদিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইল। শম্ভুরামের বামে ও দক্ষিণে সমভাগে যে দশ জন বীর অশ্বপৃষ্ঠে ছিল, তাহারা 'জয় মা ভবানী' শব্দে চীৎকার করিয়া বিপক্ষগণের মধ্যে গিয়া পড়িল। বিপক্ষগণ শম্ভুরামকে আয়ত্ত করিবার অভিপ্রায়ে ব্যস্ত ছিল এবং একস্থানে বদ্ধ না থাকিয়া চারিদিকে ঘেরাও করিয়াছিল। সহসা উভয়দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইল। শম্ভুরামের লোকেরা নিকটস্থ হইয়া বর্শা ও অসির আঘাত করিতে লাগিল; দুই একটা অশ্ব মুণ্ডহীন হইল; আরোহী পড়িয়া গেল অথবা অশ্ব দ্বারা পেষিত হইল। দুই একটা অশ্ব বিষম আঘাত পাইয়া অবাধ্য হইল এবং স্থান ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া পড়িল। শম্ভুরাম অনবরত অতিশয় দক্ষতার সহিত শরত্যাগ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক শর কোন না কোন ব্যক্তিকে অক্ষম করিতে থাকিল, কিন্তু প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষম বিপক্ষগণ ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল। তখন শম্ভুরামের দেহ লক্ষ্য করিয়া তাহারা বর্শা প্রক্ষেপ করিতে

লাগিল। শম্ভুরামের সুশিক্ষিত অশ্ব এই সময়ে অত্যদ্ভুত শিক্ষা-নৈপুণ্য দেখাইতে লাগিল, সে চক্ষুর নিমিষে কখনও বা ভূপৃষ্ঠে শুইয়া পড়িতে লাগিল, কখনও বা আরোহী সহ পাঁচ সাত হাত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল; শম্ভুরামের পক্ষীয় বীরগণ অক্লান্তভাবে বিপক্ষগণকে নির্জ্জিত করিতে লাগিলেন। কাহারও বাহু খসিল, কাহারও বা চরণ গেল, কেহ বা বক্ষে বিষম আঘাত পাইল, কাহারও বা পৃষ্ঠদেশে ক্ষত হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বিপক্ষগণের সংখ্যা অর্দ্ধেক হইয়া পড়িল, আপরার্দ্ধ অকর্ম্মণ্য হইল। তখন শম্ভুরাম চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি পলাইলে এখনই পলাইতে পারি, কিন্তু তোমাদের প্রত্যেককে পরাজিত না করিয়া এক পাও আমার সরিয়া যাইতে ইচ্ছা নাই; অনেককে জীবনের মত অকর্ম্মণ্য করা হইয়াছে, আর বাকী সকলেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটাইবার পূর্ব্বে আমি উপদেশ দিতেছি, তোমরা পলায়ন কর।"

কেহই পলায়নের চেষ্টা করিতেছে না দেখিয়া শম্ভুরাম স্বয়ং বিপক্ষগণের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইঙ্গিতমাত্র 'লাল' বিপক্ষের শ্রেণী ভেদ করিয়া তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইল। তখন পূর্ব্বোক্ত গোমস্তার সহচর দুইজন লাঠিয়াল উভয়পার্শ্ব হইতে লাঠি চালাইতে লাগিল। আশ্চর্য্য শক্তি! আশ্চর্য্য শিক্ষা! প্রত্যেক আঘাতেই হয় অশ্বমুণ্ড চূর্ণ হইতে লাগিল, না হয় আরোহীর কোন না কোন অঙ্গ বিচূর্ণ হইতে থাকিল।

সেই গোমস্তা একজন পতিত বীরের অসি ও চর্ম্ম কাড়িয়া লইয়াছিল। শম্ভুরাম যখন বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগকে পাতিত করিতেছিলেন, তখন একজন চতুর

বিপক্ষ তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে অসির আঘাত করিতে চেষ্টা করিতেছিল; বারংবার এইরূপ করিয়াও তাহার চেষ্টা বিফল হইল। কিন্তু শেষ সে ব্যক্তি যথাস্থানে আসিয়া অসি উত্তোলন করিল। গোমস্তা যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ছিল না; কিন্তু তখনকার কালের সকল মনুষ্যই অল্পাধিক পরিমাণে আত্মরক্ষার উপায় জানিত। যে বিপক্ষ অসির আঘাতে শম্ভুরামের মস্তক ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা গোমস্তা সভয়ে প্রত্যক্ষ করিতেছিল। যখন গোমস্তা দেখিল, এবার বিপক্ষবীর যে স্থানে আসিয়াছে, সে স্থান হইতে আঘাত করিলে মুণ্ড নিশ্চয়ই ছিঁড়িয়া যাইবে, তখন গোমস্তা উভয় হস্তে নিজ হস্তস্থিত অসির দ্বারা প্রচণ্ডবেগে আক্রমণকারীর বাহুতে আঘাত করিল। অসি সহ তাহার হস্ত ছিন্ন হইল। সে ভূপতিত হইবার সময় বলিল, "তুমি না হরির গোমস্তা?—রাজার কর্ম্মচারী?"

গোমস্তা বলিল, "আমি রাক্ষসের দাস ছিলাম, এক্ষণে আমি দেবতার চরণাশ্রিত।"

পতিত ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসিল, "এই দুই জন লাঠিয়ালকেও যেন চিনিতেছি।"

গোমস্তা বলিল, "হাঁ, উহারাও প্রেতের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছে।"

পতিত ব্যক্তি আবার বলিল, "এই শম্ভুরাম দেখিতেছি বাস্তবিকই অদ্ভুত ডাকাইত।"

গোমস্তা বলিল, "সাবধানে কথা কও। আর এক আঘাতে তোমাকে যমালয়ে পাঠাইব। মরণকালে দেবনিন্দা করিও না।"

আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল। তখন কুড়িজন বিপক্ষ রণক্ষেত্রে

দণ্ডায়মান। শম্ভুরামের পক্ষে দুই ব্যক্তি বিশেষ আঘাত পাইয়াছে; কিন্তু তাহাদিগের কোন অঙ্গহানি হয় নাই। তখন শম্ভুরাম আবার বলিলেন, "এখনও ইচ্ছা করিলে তোমরা অক্ষত-শরীরে জীবন লইয়া পলাইতে পার।"

বিপক্ষের বিশ্বাস হইল না। তাহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি প্রকাণ্ড একটা বর্শা লইয়া শম্ভুরামকে বিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইল। তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একজন লাঠিয়াল পাইক তাহার অশ্বের চরণে এমন লাঠি মারিল যে, বিকট আর্ত্তনাদ সহ সেই অশ্ব সেই স্থানে পড়িয়া গেল। আরোহী অশ্বতল হইতে চরণ মুক্ত করিল। তখন অপর একজন পাইক তাহার অঙ্গে বিষম আঘাত করিল, সে ব্যক্তি ধরাশায়ী হইল। অতি অল্পক্ষণ পরেই বিপক্ষগণ বুঝিল, এ শম্ভুরাম দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সত্যই এ ব্যক্তি দেবীর বরপুত্র। তখন তাহাদের কর্ম্মক্ষম লোকের সংখ্যা দশজন মাত্র। তাহারা প্রাণ লইয়া পলায়ন করাই আবশ্যক বলিয়া মনে করিল।

তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া শম্ভুরাম বলিলেন, "এরূপে পলাইতে পাইবে না। পরাজয় স্বীকার করিয়া তোমাদের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র আমাকে দিতে হইবে, অশ্বগুলি আমাকে দিতে হইবে, আর তোমাদের পক্ষের যতগুলি বীর ভূপতিত হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা দেখিতে হইবে, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কাহারও মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পাপহরার পার্শ্বে তাহাদের সৎকার করিতে হইবে, আর যে যে অশ্ব মরিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে এই পবিত্র স্থান হইতে

দূরে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। এই সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলে তোমরা বিদায় পাইবে।”

শম্ভুরামের ইঙ্গিতে তাঁহার পক্ষের তের জন লোক অস্ত্র-হস্তে বিপক্ষ-গণকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তখন বিপক্ষগণের এক জন বলিল, “আমরা সকল প্রস্তাবেই সম্মত।”

শম্ভুরাম বলিলেন, “তবে অস্ত্র ত্যাগ কর।”

তখন সেই দশ জন অস্ত্র ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল, শম্ভুরাম একবার সেই ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রের অবস্থা-পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হই-লেন। যখন শম্ভুরাম এইরূপ অসাবধান এবং যখন তাঁহার সঙ্গিগণ গুরুর দেহ-রক্ষা বিষয়ে নিশ্চেষ্ট, তখন সহসা সেই দশ জনের মধ্যে এক ব্যক্তি অতীব ক্ষিপ্রকারিতার সহিত শম্ভুরামের পৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া বর্শা ত্যাগ করিল। বর্শা শম্ভুরামের দক্ষিণ-বাহুমূলে বিদ্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার পক্ষীয় সকলে সেই কপট বীরকে আক্রমণ করিল। শম্ভুরাম সেদিকে ফিরিয়া দেখিতে না দেখিতে তাহাকে অনেকে মিলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তখন শম্ভুরামের পক্ষীয় লোকগণ নিকটস্থ হইয়া বর্শা উন্মোচন করিল। ক্ষতস্থান হইতে রুধিরস্রোত বহিতে লাগিল। গুরুর সেই পবিত্র শোণিত সন্দর্শনে অনুচরগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তাহারা “বধ করিব, প্রত্যেককেই বধ করিব” শব্দে সেই নয় জন বিপক্ষ-বীরকে আক্রমণ করিল।

শম্ভুরাম ক্ষতস্থান বামহস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন এবং ‘না না’ শব্দে নিষেধ করিতে করিতে বিপক্ষগণের নিকটস্থ হইলেন। তখন অনিচ্ছায় তাঁহার পক্ষীয়গণ ক্ষান্ত হইল। আঘাতকারী নিহত হইয়াছে দেখিয়া

শম্ভুরাম সঙ্গিগণের প্রতি রুষ্ট-নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন বিপক্ষেরা বিনীতভাবে স্ব স্ব অস্ত্র পরিহার করিল।

শম্ভুরামের একজন অনুচর বেগে নদীর অপর পারে অশ্ব চালাইয়া দিল। কিয়ৎকাল পরে সে একটা প্রকাণ্ড লতা লইয়া ফিরিয়া আসিল; একটা প্রস্তরের উপর বর্শার স্থূলভাগ দিয়া সেই লতা পিষিয়া ফেলিল এবং তাহা আনিয়া শম্ভুরামের ক্ষতস্থানে যথেষ্ট পরিমাণে লাগাইয়া দিল; তাহার পর সেই লতিকার কয়েকটি পাতা তাহার উপর স্থাপন করিয়া একখানি বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া দিল।

তিন ব্যক্তি হত হইয়াছে। বিপক্ষগণের কয়েক ব্যক্তি সেই হত-গণকে বৈতরণীতীরে চিতায় আরোপণ করিল। অকারণ এই মনুষ্য-হত্যা, অপিচ অনেকগুলিকে যাবজ্জীবনের মত অকর্ম্মণ্য করাতে শম্ভুরাম দুঃখ প্রকাশ করিলেন,—বলিলেন, "ভাই সব! তোমাদের এই সঙ্গিগণ হতাহত হওয়ায় আমার অন্তর অতিশয় কাতর হইয়াছে। এ জগতে কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। লোকের ইষ্টসাধন করিতে আমি দেবীর দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছি। অনেকের ইষ্ট-সাধন করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অনিচ্ছায় আমাকে ব্যক্তিবিশেষের অনিষ্ট করিতে হয়। তোমাদের রাজা পাপমূর্ত্তি না হইলে আমি তাহার কোনই বিরোধিতা করিতাম না। তোমরা গিয়া তোমাদের রাজাকে বলিও যে, যদি সে অতঃপর আপনার কর্ত্তব্যে মনঃসংযোগ করে, তাহা হইলে শম্ভুরাম তাহার সাহায্য করিবে; আর যদি সে এই ভাবেই চলে, তাহা হইলে তাহাকে নিরন্তর আমার হস্তে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

সমস্ত অস্ত্র সংগৃহীত হইল। কর্ম্মক্ষম অশ্ব সমূহ বাঁধিয়া লওয়া হইল।

আহত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত গো-যান আসিল। শম্ভুরাম তখন আহত-গণের নিকট আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। একজন সঙ্গী আসিয়া তাঁহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিল, "একখানি পাল্-কীর ব্যবস্থা করিতে চাহি। ঘোড়ায় যাইতে আপনার কষ্ট হইতে পারে।"

শম্ভুরাম হাসিয়া বলিলেন, "পিপীলিকা দংশন করিলে মনুষ্য অকর্ম্মণ্য হয় না।"

অগ্রে শম্ভুরাম, পশ্চাতে অনুচরগণ বেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন। গোমস্তা ও পাইক দুইজন তিনটী অশ্বে আরোহণ করিল। তদ্ব্যতীত আরও নূতন অশ্ব দশটী সঙ্গে চলিল। অনেক অস্ত্রের ভার সেই সকল অশ্বের পৃষ্ঠে ভাগ করিয়া লওয়া হইল। অনেকক্ষণ পরে সেই বন-প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চকোট পর্ব্বতের দক্ষিণপশ্চিমে ক্ষুদ্র মোহনপুর গ্রাম। গ্রামে ভদ্রাভদ্র সাকুল্যে দশ ঘরের অধিক লোকের বাস নাই। সকলেই অবস্থাপন্ন। তাহারই মধ্যে এক প্রান্তে একখানি সামান্য জীর্ণ ঘরের মধ্যে গভীর নিশিতে অহল্যা সুন্দরী একাকিনী বসিয়া আছেন। ঘরের এক কোণে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। অপরদিকে একটী শয্যা রচিত রহিয়াছে। দুই একটী সামান্য দ্রব্য ভিন্ন ঘরে আর কিছুই নাই।

অহল্যার বেশ-ভূষা বাঙ্গালীর ন্যায় নহে। অযোধ্যা-সন্নিহিত প্রদেশের নারীরা যেরূপ পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া থাকেন, অহল্যার বেশ-ভূষা তাহারই অনুরূপ। গৃহের অবস্থা, ঘরের সাজ সজ্জা প্রভৃতির সহিত তুলনা করিলে অহল্যার বস্ত্রালঙ্কারাদি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। তাঁহার দেহের নানা স্থানে হীরকাদি-খচিত অলঙ্কার; পৃষ্ঠে মুক্তামালা-জড়িত মোহিনী বেণী; পরিধানে স্বর্ণসূত্র-সমন্বিত অপূর্ব্ব ঘাগ্‌রা। দেহের ঊর্দ্ধে বিবিধ কারুকার্য্য-সংযুক্ত কাঁচলি; তদুপরি অতি সূক্ষ্ম অতি সুদৃশ্য ওড়না।

অহল্যার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ। যে বয়সে নারীর দেহ শোভা ও সৌন্দর্য্য-সম্পদে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যে বয়সে নারীর জীবন প্রাবৃটের স্রোতস্বিনীর ন্যায় কূল প্লাবিত করিতে করিতে আপন মনে ধাবিত হয়, যে বয়সে নারীর দেহ প্রফুল্ল কুসুমের ন্যায় শাখায় দুলিতে দুলিতে হাসিতে

হাসিতে বিশ্বকে পুলকিত করে, অহল্যার এখন সেই সময়। অহল্যা শোভাময়ী সুন্দরী।

এই নবীনা রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে সেই জীর্ণ-ভবনের কক্ষে বসিয়া বড়ই চিন্তা করিতেছেন। চিন্তার স্বাভাবিক শক্তি রমণীর মুখমণ্ডলকে আয়ত্ত করিয়া তত্রত্য অনেক শোভা অপহরণ করিয়াছে। কিন্তু সেই সুন্দর অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণ-বর্ণ চিন্তাজনিত ম্লানতা হেতু যেন অধিকতর রমণীয় হই য়াছে। আয়ত ইন্দীবরলোচন চিন্তায় মুকুলিত হইয়া যেন অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছে। চিন্তাজনিত অসাবধানতায় বেণী-বিনির্ম্মুক্ত কুঞ্চিত অলকদাম কপোলে, অংসে ও কর্ণে স্বাধীনভাবে ক্রীড়া করিতে করিতে বড়ই শোভা বিলাইতেছে। ঈষৎ বক্র-ভঙ্গী, ঈষৎ কুঞ্চিত ললাট, ঈষৎ কাতরতা-পূর্ণ আবেশ, ঈষৎ শিথিলতা সকলই সেই ভুবনমোহ-নীর শোভার কারণ হইয়াছে। শিল্পী তদবস্থায় সেই সুন্দরী শিরো-মণিকে দেখিলে মোহিত হইত; চিত্রকর চিন্তাশীলা নায়িকার অবস্থা আলিখিত করিবার অপূর্ব্ব আদর্শ দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইত। অহল্যা যেন পাষাণগঠিতা, যেন নিস্পন্দ নিশ্চল দেবী-মূর্ত্তি।

সহসা দূরে যেন কাহার পদশব্দ হইল। অহল্যার চমক ভাঙ্গিল। ত্রস্তে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি দ্বার-সমীপে দাঁড়াইলেন। "কৈ—না, কাহারও পদশব্দ হইতেছে না তো?" অহল্যা উভয় হস্ত দ্বারা আপনার বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিলেন; আবার উৎকর্ণ হইয়া দ্বার-সমীপে দাঁড়াই-লেন। 'না—ভুল—সকলই ভুল।'

তাহার পর ক্ষীণ প্রদীপ একটু উজ্জ্বল করিয়া অহল্যা পুনরায় পূর্ব্ব-আসনে উপবেশন করিলেন; ভাবিতে লাগিলেন, "কি হইবে, হয়

তো তিনি বিপদে পড়িয়াছেন। কালি অতি গোপনে ভয়ে ভয়ে একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; বলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কঠিন চক্রান্ত হইতেছে। পিতার মন ভাঙ্গিয়াছে; হয় তো ভয়ানক বিপদ্ হইবে। আজি আর কোন সংবাদ পাইলাম না, তিনি আর আসিলেন না; বোধ হয়, আসিবার সুযোগ হইল না। না আসিলে যদি তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে আসিয়া কাজ নাই। কিন্তু সংবাদটা না পাইলে দাসী বাঁচিবে কেন?"

আবার মনুষ্যের পদশব্দ। আবার অহল্যা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; আবার ভীতমনে দ্বারের নিকটস্থ হইলেন। কিন্তু না, কোথাও কোন শব্দ বুঝা যায় না। অহল্যা সেই দ্বার-সমীপে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "কেন তিনি আমাকে চরণে স্থান দিলেন? পিতার অমতে, আত্মীয়-স্বজনের অনিচ্ছায় কেন তিনি এ দরিদ্র-কন্যাকে, ভিক্ষুকের দুহিতাকে স্বর্গের সিংহাসনে বসাইলেন? আমি ইহাকে মনের মন্দিরে পূজা করিতাম, দীনার হৃদয় তাঁহার অজ্ঞাতসারে নিরন্তর তাঁহার চরণসেবা করিত; এইরূপেই আমি জীবন কাটাইতাম। আমাকে বিবাহ করিয়া আশাতীত সুখের সাগরে কেন তিনি ভাসাইলেন? শত শত রাজদুহিতা, অগণ্যগুণবতী সুন্দরী তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল, তাহাদের গ্রহণ না করিয়া আমাকে কেন তিনি গোপনে পত্নীরূপে চরণে স্থান দিলেন?"

আবার তাঁহার মনে হইল, "কি অনুগ্রহ! যে অভাগিনী অরণ্যমধ্যস্থ কুসুমের ন্যায় আপনি ফুটিয়া আপনি ঝরিয়া পড়িত, যে দুঃখিনী অলক্ষ্যে আপনার গান আপনি শুনিতে শুনিতে কাল কাটাইত, তাহাকে

এ নন্দনের দেববাঞ্ছিত আনন্দ তুমি দিয়াছ। কতই আদর, কতই সোহাগ, কতই ভালবাসা; কিন্তু আমিই তোমার বিপদের মূল। আমাকে বিবাহ না করিলে পিতা ক্রুদ্ধ হইতেন না, আত্মীয়গণ বিরূপ হইতেন না।”

অহল্যার মনে হইল, “এবার নিশ্চয়ই কোন মনুষ্য তাঁহার কুটীর-দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।” ব্যাকুলা অহল্যা ধীরে ধীরে দ্বারের অর্গল মুক্ত করিলেন; ধীরে ধীরে একটু দ্বার খুলিলেন;—ভয়ে ভয়ে মুখ বাহির করিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, দূরে সম্মুখে বৃক্ষমূলে একটা শ্বেত-পরিচ্ছদের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। ভাবিলেন, ‘তিনিই কি? তবে ওখানে অপেক্ষা করিয়া কেন? আর কেহ সঙ্গে আছে কি? বিপদের ভয়ে রক্ষী লইয়া আসিয়াছেন কি?’ অহল্যা সম্পূর্ণরূপে দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ চারিজন অসিধারী পুরুষ কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল, আর চারিজন বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

অস্ত্রধারী পুরুষগণের মধ্যে একজন বলিল, “চীৎকার করিও না, তাহা হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। তোমার কোন অনিষ্ট করিতে আমরা আসি নাই। তোমাকে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে।”

অহল্যা বুঝিয়া দেখিলেন, এ সময়ে নীরব থাকিলে অনেক সর্ব্বনাশ হইতে পারে। অপরিচিত পুরুষগণের আগমন দর্শনে তিনি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়াছিলেন। অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, “কেন?”

অপরিচিত পুরুষ উত্তর দিলেন, “তুমি প্রস্থান না করিলে বলেন্দ্র সিংহের জীবন থাকিবে না।”

অহল্যা চমকিয়া উঠিলেন। অপরিচিত পুরুষ বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে বিবাহ করায় মহারাজা কুপিত হইয়াছেন। তিনি পুত্রকে তোমার সহিত সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যুবরাজ সেই আজ্ঞা পালন করিবেন বলিয়া পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন; কিন্তু তিনি সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারেন নাই। গত কল্যও তিনি তোমার নিকট আসিয়াছিলেন। মহারাজা বিরক্ত হইয়া এই অবাধ্য পুত্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।"

অহল্যা প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিয়া দেখিলেন, এ সকলই সম্ভব কথা। মহারাজের ঘোর বিরক্তির সংবাদ বলেন্দ্র সিংহ বার বার নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে মহারাজ নিষেধ করিয়াছেন। অহল্যা স্বামীর মুখে আরও শুনিয়াছেন যে, বলেন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে অনেক চক্রান্ত হইতেছে। সুতরাং অধুনা এই লোকেরা যাহা বলিতেছে, তাহার মধ্যে অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কে?"

অপরিচিত পুরুষ উত্তর দিলেন, "আমিই বলেন্দ্র সিংহের হিতৈষী বন্ধু।"

অহল্যা আবার জিজ্ঞাসিলেন, "তবে আপনি আমাকে কাটিয়া ফেলিবার কথা বলিতেছিলেন কেন?"

অপরিচিত পুরুষ বলিলেন, "বন্ধুর হিতার্থে তোমাকে দূরে পাঠাইয়া দিতে না পারিলে বলেন্দ্র সিংহের নিস্তার নাই। তুমি কোথায় আছ জানিতে পারিলে, বলেন্দ্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। পিতার রোষ, নিজের বিপদ্ কিছুতেই

সে ভীত হইয়া তোমার সহিত মিলনে ক্ষান্ত হইবে না। এরূপ অবস্থায় যদি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে না চাও, তাহা হইলে আমাকে বন্ধুর হিতার্থে নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে হইবে।”

অহল্যা আবার জিজ্ঞাসিলেন, “কিরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন, স্থির করিয়াছেন ?”

অপরিচিত পুরুষ উত্তর দিলেন, তোমাকে বলপূর্ব্বক স্থানান্তরে পাঠাইব। তুমি তাহাতে সম্মত না হইলে অথবা বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিলে, তোমার ঐ সুন্দর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিব।”

অহল্যা আবার বলিলেন, “যাঁহার হিতার্থে আপনি আমার প্রতি এই কঠোর ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি ইহার কোন সংবাদ জানেন কি ?”

আগন্তুক বলিলেন, “না। বলেন্দ্র কোন সন্ধান জানেন না, কিন্তু আমরা বুঝিয়াছি, এইরূপ ব্যবস্থা না হইলে তাঁহার রক্ষা নাই। তিনি জানিতে পারিলে নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিয়াও তোমার জন্য ব্যাকুল হইতেন। কাজেই তাঁহার মঙ্গলের জন্য, মহারাজের ক্রোধশান্তির জন্য আমরা গোপনে এই ব্যবস্থা করিয়াছি।”

অহল্যা বলিলেন, “তাঁহার হিতার্থে আমি এখনই হাসিতে হাসিতে জীবন ত্যাগ করিতে পারি। যদি এই দুঃখিনী দূরে চলিয়া গেলে তাঁহার বিপদ কাটিয়া যায়, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডে একাকিনী এ দেশ ত্যাগ করিব। আপনাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে কত দিন এরূপ ভাবে থাকিতে হইবে ?”

অজ্ঞাত পুরুষ উত্তর দিলেন, "ঠিক জানি না। যত দিন বলেন্দ্র সিংহ পিতাকে প্রসন্ন করিয়া সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা না করিবেন, তত দিন তোমাকে অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। কিন্তু তুমি একাকিনী যাইতে পাইবে না। তোমার ন্যায় সুন্দরীর একাকিনী স্থানান্তরে গমনে অনেক বিপদ্ ঘটিতে পারে। আমার সঙ্গে শিবিকা আছে, আমার লোকেরা সঙ্গে করিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে।"

অহল্যা বলিলেন, "নারীর যে বিপদের জন্য সতত আশঙ্কিত থাকা উচিত, আমার সে বিপদ্ জীবন থাকিতে ঘটিবে না। সুতরাং সে জন্য আমি একটুও ভীত নহি। অতএব ঐ সাবধানতা অনাবশ্যক।"

আগন্তুক আবার বলিলেন, "তুমি রাজপুত্র-বধূ, তোমাকে এরূপ ভাবে পাঠাইলে ভবিষ্যতে কলঙ্ক উঠিতে পারে, আর বলেন্দ্র সিংহও অতিশয় বিরক্ত হইতে পারেন। অতএব আমি যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছি, তোমাকে তাহাই শুনিতে হইবে।"

অহল্যা বলিলেন, "বুঝিতেছি আপনার আদেশ মান্য করা ব্যতীত আমার আর উপায় নাই। ভাল, তাহাই হইবে। আমি জনক-জননীর নিকট বিদায় লইয়া আসি।"

অজ্ঞাত পুরুষ বলিলেন, "না। তুমি আর এক মুহূর্ত্তও স্থানান্তরে যাইতে পাইবে না। আমি আর কালবিলম্ব করিতে পারিব না। এখনই নির্ব্বিবাদে আমার সঙ্গে আসিয়া তোমাকে শিবিকারোহণ করিতে হইবে।"

অহল্যার চক্ষুতে জল আসিল। পিতা-মাতাকেও একটা কথা না বলিয়া গৃহত্যাগ করা নিতান্ত অবৈধ বলিয়া তাঁহার মনে হইল। কিন্তু

কোন উপায় নাই। এই কঠোর-হৃদয় ব্যক্তির আদেশ অবনত-মস্তকে পালন করা ব্যতীত আর গতি নাই। বলেন্দ্র সিংহের মঙ্গল হইবে। বাস্তবিক দাসী স্থানান্তরে গমন না করিলে, তিনি কদাচ আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবেন না। কি প্রগাঢ় প্রণয়! নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়াও চরণাশ্রিতা সেবিকার প্রতি কি অপরিসীম করুণা! তাঁহার এই দয়ার কোন প্রতিশোধ দিতে দাসীর কিছুমাত্র সাধ্য নাই। যদি তাঁহার বিপন্মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে হয়, তাহাও আমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে কেন আমি ইতস্ততঃ করিব? অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। অহল্যা এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনি কে, তাহা জানি না; কিন্তু আপনি আমার পরমদেবতার হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার মঙ্গলের জন্য যে ব্যবস্থা আপনি করিতেছেন, অতি দুষ্কর হইলেও তাহা প্রতিপালন করিতে আমি বাধ্য। চলুন, কোথায় যাইতে হইবে, আমি যাইতেছি।"

তখন সেই অপরিচিত পুরুষের সঙ্কেতক্রমে একজন সঙ্গী নিঃশব্দে কয়েকজন বাহক সহ শিবিকা আনাইয়া দ্বার-সমীপে স্থাপন করাইল। আগন্তুক পুরুষ বলিল, "এই শিবিকায় তুমি আরোহণ কর।"

নয়নের জল মুছিতে মুছিতে অহল্যা সুন্দরী বিনা আপত্তিতে শিবিকা-রোহণ করিলেন। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ হইল, শিবিকার উভয় পার্শ্বে উলঙ্গ-অসিহস্তে দুই জন বীর দণ্ডায়মান হইল; সম্মুখে দুই এবং পশ্চাতেও দুই জন রক্ষী দাঁড়াইল। অচিরে সকলেই প্রস্থান করিল এবং নিঃশব্দে বনমধ্যস্থ পথ বাহিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সকল ব্যাপারের শেষ হইল; কেহই এ সংবাদ জানিতে পাইল না।

এই ঘটনার অতি অল্পকাল পরে অতি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর এক বীর-পুরুষ সেই ক্ষুদ্র ভবনদ্বারে উপস্থিত হইয়া ব্যস্ততা সহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সেই প্রিয়দর্শন যুবা বলেন্দ্র সিংহ। সবিস্ময়ে বলেন্দ্র দেখিলেন, অহল্যার গৃহদ্বার মুক্ত; ঘরে ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। উৎকণ্ঠার সহিত তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু কোথাও অহল্যা নাই! গৃহের অন্যান্য অংশে প্রবেশ করিবার যে পথ আছে, তাহা অহল্যার গৃহের দিক্ হইতে রুদ্ধ; সুতরাং অহল্যা সে দিকে যান নাই। বলেন্দ্রের মনে বড়ই চিন্তার আবির্ভাব হইল। তিনি গৃহের বাহিরে আসিয়া চারিদিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, মৃদুস্বরে "অহল্যা অহল্যা" বলিয়া ডাকিলেন; কোনই উত্তর পাইলেন না। পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি অহল্যার জনক-জননীকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা অহল্যার কোন সংবাদ জানেন না। সন্ধ্যার পর হইতে অহল্যা নিজ গৃহেই আছেন, ইহাই তাঁহারা জানিতেন। তাহার পর অহল্যার কি হইল, তাহা তাঁহারা কিছুই বলিতে পারেন না। চারিদিকে উৎকণ্ঠার আবির্ভাব হইল। জনক-জননী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বলেন্দ্র নীরবে দণ্ডায়মান। সহসা তিনি প্রদীপে মোটা করিয়া সলিতা দিতে বলিলেন। প্রদীপ সমুজ্জ্বল হইলে তিনি তাহা হস্তে লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং আলোক-সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ দর্শন করিতে লাগিলেন। অনেক পুরুষের পদচিহ্ন দৃষ্ট হইল; শিবিকার পায়ার চারিটী দাগও তিনি বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে। নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট লোক কোন প্রকার কৌশল

অহল্যাকে লইয়া গিয়াছে। আপনারা চিন্তা করিবেন না, আমি এখনই সন্ধানার্থ যাইতেছি।"

বলেন্দ্র সিংহ উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং নত হইয়া চরণ-চিহ্নের অনুসরণক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন বহুদূর অগ্রসর হওয়ার পর এক স্থানে তিনি ভয়ানক কাণ্ড দেখিতে পাইলেন। একটা পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর বারিহীন গর্ভে বহু লোকের চরণ-চিহ্ন;—কেহ বা পদস্খলিত হইয়াছে, কেহ বা চরণের একদেশমাত্র ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়াছে, কেহ বা অতিক্রত চরণ-স্থাপনের জন্য অস্পষ্ট অঙ্কপাত করিয়াছে। যে সকল পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া তিনি আসিতেছিলেন, এ স্থানের পদচিহ্ন তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। সেই স্থানে ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ভূপৃষ্ঠে বলেন্দ্র সিংহ অনেক শোণিত-চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তবে কি দস্যুরা এই নিভৃত স্থানে অহল্যাকে আনিয়া হত্যা করিয়াছে? তবে কি অহল্যা আর এ ইহজগতে নাই? এরূপ ঘৃণিত কাজ এ দেশে আজি কালি নিরন্তর হইতেছে। তখন বলেন্দ্রের মনে বড়ই আক্ষেপ হইল অহল্যার সকল প্রকার সুব্যবস্থা না করিয়া তিনি তাহাকে অনেক মূল্যবান্ অলঙ্কারে সাজাইয়াছিলেন। যে দেহে উঠিয়া অলঙ্কারের জন্ম সার্থক হইয়াছে, সে দেহে অলঙ্কার দিয়া তিনি নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছেন সেই অলঙ্কারই আজি তাঁহার সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছে। কিন্তু এখন অহল্যার দশা কি হইল, তাহার সত্য সংবাদ না পাইলে কোন উপায়ই নাই?

আবার বলেন্দ্র সিংহ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,"দেশের সমস্ত দস্যু

নির্ম্মূল করিব। নিকটে শম্ভুরামের বাস। কিন্তু এরূপ দুষ্কর্ম্ম তাঁহার দ্বারা সম্ভব নহে। আমি যতদূর জানি, তাহাতে বুঝিয়াছি, গর্হিত কার্য্যের প্রতিরোধ করাই শম্ভুরামের ব্রত। এ অবস্থায় আমি কাহার সহায়তা গ্রহণ করিব ?"

রাজপুত্র তত্রতা বালুকার উপর বসিয়া পড়িলেন। সহসা দূর হইতে কোন অলক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "যুবরাজ! নমস্কার করি।"

রাজপুত্র চমকিয়া উঠিলেন;—বলিলেন, "কে তুমি এই গভীর রাত্রিকালে এখানে বেড়াইতেছ? আমার জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান তুমি বলিতে পার কি ?"

অলক্ষিত ব্যক্তি নিকটস্থ হইয়া বলিল, "সকল সন্ধানই বলিতে পারি। আপনি স্থির হউন।"

যুবরাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সাগ্রহে সেই আগন্তুকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, সে ব্যক্তি রাঘব।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে বেলা এক প্রহরের সময় মানভূমের রাজবাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এক প্রমোদ-কাননে কুমার বীরেন্দ্র সিংহ উপবিষ্ট। কুমারের বয়স দ্বাবিংশ বর্ষ। শরীর পরিণত ও শোভাময়; কিন্তু কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিলে তাহা যেমন অসার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, কুমার বীরেন্দ্র সিংহের দেহ, অসময়ে অত্যধিক ভোগবিলাসাতিশয্য হেতু কালিমা-যুক্ত, বিবর্ণ ও হতশ্রী হইয়াছে। কুমার মানসিক শিক্ষা বা দৈহিক উন্নতির দিকে কখনই লক্ষ্য করেন নাই। শৈশবের সীমা অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিবার অনতিকাল পরেই বীরেন্দ্র সিংহ ইন্দ্রিয়সেবারূপ সুখে প্রমত্ত হইয়া কুসঙ্গী-পরিবেষ্টিত হইয়া কালপাত করিতেছেন। বিবিধ ভোগোপকরণ তাঁহার নিমিত্ত সতত সংগৃহীত হইতেছে।

বীরেন্দ্র সিংহ মানভূম-মহারাজার দ্বিতীয় ও শেষ পুত্র। কোলের ছেলে অনেক স্থলে অপরিণামদর্শী পিতামাতার বড়ই আদরের বস্তু হইয়া থাকে। বীরেন্দ্র সিংহ যাহাতে পরিতুষ্ট, যে পথে চলিতে তাঁহার আসক্তি, পিতামাতা উল্লাস সহকারে তাহারই আয়োজন করিয়া সেই পথেরই বিঘ্ন-বাধা দূর করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং বল্গাহীন অশ্বের ন্যায় বীরেন্দ্র সিংহ বড়ই স্বাধীন ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে কাল কাটাইয়া আসিতেছেন। অনেক বারনারী তাঁহার নিত্য-সঙ্গিনী;

অনেক ভদ্রমহিলা তাঁহার অত্যাচারে ধর্ম্মহীনা হইয়াছেন; অনেক গৃহস্থকুমারেরা তাঁহার সঙ্গদোষে অদম্য ইন্দ্রিয়-স্পৃহানলে চিরদিনের জন্য স্ব স্ব সুখশান্তি আহুতি দিয়াছে। কোন কোন উৎপীড়িত প্রজা অসমসাহসে নির্ভর করিয়া মহারাজের নিকট আবেদন করিয়াছে, কিন্তু কোনই প্রতীকার হয় নাই; বরং স্থলবিশেষে আবেদনকারী সেই অসম-সাহসিকতার জন্য দণ্ডভোগ করিয়াছে। কাজেই পুত্রের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

তৎকালে প্রতাপান্বিত ধনী সন্তানের, বিশেষতঃ রাজপুত্রের এবংবিধ ভোগবিলাসানুরাগিতা বিশেষ দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হইত না; বরং ইহার বিপরীত-ভাব রাজপুত্রের পক্ষে অসঙ্গত বলিয়া অনেকে মনে করিত। যুবরাজ বলেন্দ্র সিংহ কনিষ্ঠের বিপরীত-স্বভাব ছিলেন। কোনরূপে প্রজার মনঃপীড়া-প্রদান নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম বলিয়া তিনি জ্ঞান করিতেন। বিদ্যানুরাগ ও বিদ্বান লোকের সহিত সাহচর্য্য তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। দৈহিক বল-বিক্রমের উন্নতিসাধন এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতালাভ তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই কারণে উভয় ভ্রাতার মধ্যে বাল্যকাল হইতেই সতত মনোমালিন্য উপস্থিত হইত। বলেন্দ্র সিংহ অনেক সময়েই কনিষ্ঠের দুর্ব্ব্যবহার হেতু আন্তরিক আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন; অনেক সময়েই তিনি কনিষ্ঠকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন; অনেক সময়ে ঘৃণিত সংসর্গ হইতে কনিষ্ঠকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত তিনি বিবিধ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বিরক্ত, ক্রুদ্ধ কনিষ্ঠ বারংবার জ্যেষ্ঠকে অপমানসূচক বাক্য দ্বারা মর্ম্মপীড়িত করিতেন; কখন কখন পিতা-

মাতার নিকটে সাশ্রুনয়নে অতিরঞ্জিত করিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিতেন। জনক-জননী তজ্জন্য জ্যেষ্ঠকে তিরস্কার করিতেন এবং এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আদেশ দিতেন।

ভ্রাতৃদ্বয়ের আন্তরিক সদ্ভাব ক্রমেই নির্ম্মূল হইল। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান দুর্ব্যবহারের বিবরণ শ্রবণে অতিশয় ক্ষুন্ন হইয়া রহিলেন এবং ক্রমশঃ তাঁহাকে ঘৃণার পাত্র মনে করিয়া তাঁহার সহিত সকল প্রকার ঘনিষ্ঠতা পরিত্যাগ করিলেন। কনিষ্ঠ উদার-চরিত্র জ্যেষ্ঠকে পরম শত্রু জ্ঞান করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন। মনের এই ভাব উভয়পক্ষেই ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইল।

মানভূম-রাজবংশের নিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া থাকেন। অন্যান্য পুত্রেরা স্বচ্ছন্দভাবে জীবিকাপাতের উপযোগী বিষয়াদি লাভ করেন। কুমার বীরেন্দ্র সিংহের মনে জ্যেষ্ঠকে চিরদিনের নিমিত্ত ন্যায়তঃ প্রাপ্য রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার বাসনা জন্মিল। পিতামাতার অত্যাধিক স্নেহ তাঁহার বাসনা-সিদ্ধির অনুকূল হইল। তিনি নিরন্তর নানাপ্রকার চক্রান্তে পিতা-মাতাকে বলেন্দ্র সিংহের প্রতি বিরক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মিথ্যা আরোপিত অপবাদ সমূহ পিতা-মাতার চিত্তে কিয়ৎপরিমাণে অঙ্কপাত করিল। বলেন্দ্র সিংহ এই সকল সংবাদ জানিতে পারিলেন; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস যে, অলীক বাক্য ছিন্ন-সূত্র ঘুড়ীর ন্যায় আকাশে অসংযতভাবে দুলিতে দুলিতে আপনিই পড়িয়া যাইবে; এজন্য কোন প্রতীকার-চেষ্টা অনাবশ্যক। এইরূপ সময়ে তিনি গোপনে অহল্যা সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সর্ব্বনাশের

বীজ উপ্ত হইল। পিতা এই কথা শ্রবণে নিতান্ত কুপিত হইলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র স্বাধীনভাবে বিবাহ করিয়াছে জানিয়া জননীও অনেক দুঃখ করিলেন।

বলেন্দ্র সিংহ অতি পবিত্র চক্ষুতে অহল্যাকে দেখিয়াছিলেন। অহল্যার নম্র স্বভাব, কোমল ব্যবহার ও অতুলনীয় রূপরাশি বলেন্দ্রকে মোহিত করিয়াছিল। ভালবাসা উভয় পক্ষেই অতিশয় প্রগাঢ়ভাবে পরিণত হইয়াছিল। প্রতিদিন অনেকক্ষণ দর্শন ও আলাপ না করা উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় যুবতী নারীর সহিত পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ করা অবিধেয় বলিয়া মনে হইয়াছিল; সুতরাং বলেন্দ্র বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ না হওয়া দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। এই বিবাহ-সম্বন্ধের প্রস্তাব নানাপ্রকারে তিনি পিতামাতার গোচর করিয়াছিলেন; কিন্তু পাত্রীপক্ষের নিতান্ত দরিদ্রতা হেতু পিতামাতা বিবাহে সম্মত হন নাই। তথাপি বলেন্দ্র সিংহ গোপনে অহল্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বলেন্দ্র জানিতেন, এরূপ অবাধ্যতা অতিশয় গর্হিত; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কোন না কোন অনুকূল সময়ে তিনি পিতামাতার চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিবেন এবং অহল্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে তাঁহাদিগকে সম্মত করিবেন।

কুমার বীরেন্দ্র সিংহ জ্যেষ্ঠের এই বিবাহ-ব্যাপারের সংবাদ যথাসময়ে জানিতে পারিয়াছিলেন। একদিন গভীর রাত্রিতে বলেন্দ্র সিংহের অনুসরণক্রমে তিনি পাত্রীর বাসস্থানাদি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। পিতার নিকট যথাসময়ে বলেন্দ্র সিংহের এই গোপন পরিণয়-কাহিনী অতি ভয়ানকভাবে উত্থাপিত হইল। ক্রোধে স্থবির মহারাজা কম্পিত

হইলেন। সর্ব্বনাশ যে অতি নিকটবর্ত্তী, বলেন্দ্র তাহা জানিতে পারি-লেন, পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার আর ভরসা হইল না; পিতাও পুত্রকে আর আহ্বান করিলেন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বীরেন্দ্র সিংহ প্রমোদ-কাননে উপবিষ্ট। প্রমোদ-কানন বলিলে এখনকার দিনে যে সকল শোভন-পদার্থের সমাবেশ অপরিহার্য্য বলিয়া মনে হয়, তাহার ন্যায় কিছুই সেখানে ছিল না; সেখানে সার্সি-খড়খড়ি-যুক্ত শোভাময় সৌধ ছিল না। তন্মধ্যে চেয়ার, কৌচ, সেল্‌ফ, ঘড়ী, আলমারি, ব্রাকেট, টী-পট, কিছুই ছিল না। ইষ্টকচূর্ণ, রক্তবর্ণ প্রশস্ত পাথর, উভয়পার্শ্বে পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত মনোহর লতাবল্লরী, গুল্ম ও কুঞ্জ—ইহার কিছুই ছিল না। তথায় উদ্যান বেষ্টিত করিয়া প্রাচীর বা লোহার রেলিং এবং তন্মধ্যে প্রকাণ্ড গেটও ছিল না। তথায় একটী প্রকাণ্ড খড়ের ঘর ছিল; তাহার মধ্যস্থল দক্ষিণ-দিকের দেয়াল-শূন্য। উভয় পার্শ্বে দুইটী নাতিবৃহৎ কক্ষ; অদূরে কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর; তাহাতে রন্ধনাদি হইত এবং দাস-দাসী অবস্থান করিত। সম্মুখে বহুদূর-বিস্তৃত অঙ্গন, সেই অঙ্গনে নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুষ্পবৃক্ষ অতি বিশৃঙ্খলভাবে সংস্থাপিত। বৃক্ষতলে ঘাস এবং নানা স্থানে বিবিধ লতা-গুল্ম-জড়িত বন; ইতস্ততঃ আগাছাও অনেক। দূরে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। অপরপার্শ্বে মহুয়া ও কয়েকটা পলাশ-গাছ। এই উদ্যানে প্রবেশপথের সমীপে অনেকগুলি রক্ষী অব-স্থান করে; তাহাদের নিমিত্ত সেই স্থানে দুইখানি খড়ের ঘর আছে। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে বিবিধ কণ্টকী-বৃক্ষ ও লতা-জড়িত দুর্ভেদ্যপ্রায় বেড়া, বেড়ার বাহিরে স্বচ্ছ-সলিল সুদীর্ঘ সরোবর; সরোবরের কালো জল

বায়ুভরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা বক্ষে লইয়া হারাবলিশোভিতা সুন্দরী যুবতীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার চারিদিকে উচ্চ মৃত্তিকার স্তূপ। সেই মৃত্তিকারাশির উপরে উভয় পার্শ্বে অগণ্যপ্রায় তালগাছ যেন বাহু উত্তোলন করিয়া বিশ্ব-বিধাতার উদ্দেশে স্তব পাঠ করিতেছে। মারুত-হিল্লোল তাহাদের গগনস্পর্শী শাখা আন্দোলন করিয়া শন্ শন্ শব্দে সেই অস্ফুট স্তোত্র যেন জগতে ছড়াইয়া দিতেছে। সেই উদ্যানে বসিয়া বীরেন্দ্র সিংহ যে সকল কার্য্যের অনুশীলনে রত রহিয়াছেন, তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক। তাঁহাকে কোন কার্য্যের জন্য কখন লজ্জিত হইতে হইত না, বিশেষতঃ কোন কোন লোক সকল সময়েই তাঁহার নিকটস্থ হইতে পাইত। সেইরূপ একজন লোক এই সময়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কুমার তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "নূতন সংবাদ কি?"

আগন্তুক উত্তর দিল, "ঠিক হইয়াছে। আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন, যুবরাজও অনেকক্ষণ পূর্ব্বে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আদেশ পাইয়াছেন।"

তখন কুমার বীরেন্দ্র সিংহ ব্যস্ততা সহ আপনার সঙ্গিনীগণকে সরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। তাহার পর সত্বর পিতৃ-সমীপে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

বাস্তবিক বৃদ্ধ মহারাজা প্রাতে সভায় বসিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র বলেন্দ্র সিংহকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি সন্ধানে জানিয়াছিলেন, গত রাত্রিতে বলেন্দ্র বাটীতে ছিলেন না এবং বেলা অনেক হইলে, বিশেষ চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিতভাবে গৃহে আগমন করিয়াছেন। বলেন্দ্র সিংহ গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র পিতৃসমীপে উপস্থিত হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বর্ষীয়ান মহারাজার বয়ঃক্রম সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তান হয় নাই। পত্নী ও উপপত্নীতে তাঁহার অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। তাঁহার বয়স যখন ন্যূনাধিক পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ষ, তখন এক মহিষীর গর্ভে প্রথমে বলেন্দ্র, তাহার তিন বৎসর পরে বীরেন্দ্রের জন্ম হইয়াছে। আর কোন পত্নী বা উপপত্নীর গর্ভে মহারাজার কোনই সন্তান হয় নাই। একখানি মহামূল্য আস্তরণাবৃত সুখাসনের উপর মহারাজা উপবিষ্ট। তাঁহার মস্তক নত, বদন দন্তহীন; শরীর শীর্ণ, কিন্তু কেশ কৃষ্ণবর্ণ। মহারাজের উভয় পার্শ্বে দূরে পাত্রমিত্র ও সভাসদ্‌গণ আসীন। অতিশয় চিন্তিত ও কাতরভাবে ধীরে ধীরে বলেন্দ্র সিংহ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া ভূতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক মহারাজকে প্রণাম করিলেন এবং আপনার অসিকোষ মুক্ত করিয়া পিতার চরণে স্থাপন করিলেন।

মহারাজা পুত্রকে কোনরূপ আশীর্ব্বাদাদি না করিয়া বলিলেন, "তুমি অবাধ্য সন্তান, তুমি আমার উচ্চকুলে কালি দিয়াছ। তুমি আমার অমতে ভিক্ষুকের কন্যা বিবাহ করিয়াছ; অতএব তুমি আমার পরিত্যাজ্য।"

সভাস্থ সকলে বলেন্দ্র সিংহের বাক্য শুনিবার নিমিত্ত সাগ্রহে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু বলেন্দ্র নিরুত্তর। মহারাজা আবার বলিতে লাগিলেন, "আমি শুনিয়াছি, তুমি বড়ই দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়াছ, তুমি দেশের শত্রু ডাকাইত শম্ভুরামের সহিত মিলিয়া পিতৃহত্যা করিবার আয়োজন করিতেছ; সুতরাং তুমি আমার পরম শত্রু।"

এবার বলেন্দ্র সিংহ বলিলেন, "আপনি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা। আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আপনার নিকট কখন মিথ্যা কহিব না।

মহারাজ প্রথমে আমাকে যে অপরাধে অপরাধী করিতেছেন, আমি সর্ব্ব-সমক্ষে সে অপরাধ স্বীকার করিতেছি। আমি অধম সন্তান, আপনার চরণে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।”

মহারাজা বলিলেন, “ক্ষমা পাইবে না। অবাধ্য অপরাধীর প্রাণদণ্ড করাই রাজবিধি। তুমি সন্তান, এই জন্য প্রাণদণ্ড না করিয়া তোমাকে চিরদিনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতেছি। এ রাজ্যে তোমার আর অধিকার নাই; কোন সম্পত্তি তুমি পাইবে না। এখনই তোমাকে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে।”

বলেন্দ্র বলিলেন, “মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, মহারাজের প্রসন্নতাই আমি ভিক্ষা করিতেছি। রাজ্য বা ঐশ্বর্য্যে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমি ভবদীয় চরণে বার বার আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া চির-বিদায় গ্রহণ করিতেছি। যদি মহারাজ এই শেষ-বয়সে কোন বিপদে পড়েন, যদি এই বৃদ্ধকালে আপনাকে কোন কঠিন দুর্দ্দশায় পড়িতে হয়, তবে এই অধম সন্তান আপনার নিমিত্ত প্রাণপাত করিবে; নতুবা ইহজীবনে এই অবাধ্য পুত্র আপনাকে আর কোন প্রকারে বিরক্ত করিবে না।”

মহারাজা বলিলেন, “তোমার অহঙ্কৃত উত্তর শুনিয়াই বুঝিতেছি, তুমি রাজ্যের শত্রুগণের সহিত মিলিয়াছ আর সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছ।”

বলেন্দ্র বলিলেন, “যে দুষ্টেরা আপনাকে এইরূপ সংবাদ জানাইয়াছে, তাহারা ঘোর মিথ্যাবাদী। আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, শম্ভুরামের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে বটে, কিন্তু এই রাজ্যের হিতকর

পরামর্শ ব্যতীত কোন প্রকার কুমন্ত্রণা একবারও উপস্থিত হয় নাই। শম্ভুরাম ডাকাইত সত্য, কিন্তু বড় সাহসী ও ধার্ম্মিক। তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে আমার বাক্যে মহারাজের বিশ্বাস হইবে।"

মহারাজা বলিলেন, "তোমার এই বাক্য শুনিয়াই বুঝিতেছি যে, তুমি এই রাজ্যের এক প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছ। শম্ভুরাম ভয়ঙ্কর ডাকাইত, তাহার ভয়ে দেশ অস্থির, সে সমস্ত রাজ্য কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। অথচ তুমি তাহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রশংসা করিতেছ। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তুমি তাহার সহিত মিশিয়াছ; তাহার সহিত একযোগে দেশের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার আর কোন কথা আমি শুনিতে চাহি না। তুমি এই দণ্ডেই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাও।"

বলেন্দ্র সিংহ আর কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। তিনি দূর হইতে পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া নীরবে অধোমুখে প্রস্থান করিলেন। সভাস্থ সাবতেই ম্রিয়মাণ হইলেন।

বলেন্দ্র সিংহ প্রস্থান করার অব্যবহিত পরেই বীরেন্দ্র সিংহ অধোমুখে সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কোন কথাই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, যাহারা বুঝিতে পারে, তাহারা বুঝিল, হৃদয়ভাব প্রচ্ছন্ন করিবার নিমিত্ত কুমারের প্রযত্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার বদন আনন্দ-রেখায় প্রদীপ্ত।

মহারাজা বলিলেন, "কুমার বীরেন্দ্র সিংহ! অদ্য হইতে সপ্তাহ পরে তুমি এই রাজ্যের যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইবে। বলেন্দ্র সিংহ অশেষ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। সে নিজ মুখেই আপনার অপরাধ স্বীকার

করিয়াছে। অধিকন্তু সে অতিশয় অহঙ্কারের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহাকে চিরদিনের নিমিত্ত আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। তুমি এতদিন আমার মনোরঞ্জন করিয়া চলিয়া আসিতেছ, দেবতার নিকট প্রার্থনা করি তুমি এইরূপে গুরুজনের বাধ্য হইয়া চিরপ্রচলিত পদ্ধতির অনুসরণ করিবে।”

তখন বীরেন্দ্র সিংহ অশ্রুপূর্ণ-লোচনে উভয়হস্তে পিতার চরণ স্পর্শ করিলেন। মহারাজা বলিলেন, “তোমার কল্যাণ হউক। তুমি আমার সৎপুত্র, অদ্য সভার কার্য্য এই স্থানে শেষ হউক।”

পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া এবং তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিয়া মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ তাবৎ ব্যক্তি করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা পুত্রের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া পুরাভ্যন্তর প্রবেশ করিলেন। সভাস্থ সকলে বাহিরে আসিলেন। অনেকেরই বদন নিরানন্দ-কালিমায় আচ্ছন্ন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বলেন্দ্র সিংহ পিতৃ-পরিত্যক্ত হইয়া ভবন ত্যাগ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সন্ধান করিবার জন্য কোন লোকও প্রেরিত হইল না। বীরেন্দ্র সিংহ পূর্ণানন্দে মগ্ন হইলেন; মনের যাহা প্রধান আকিঞ্চন, ভগবানের কৃপায় তাহা অতি সহজেই সিদ্ধ হইল। কিন্তু মনের ভয় গেল না। বলেন্দ্র বিশেষ বলশালী বীর, আর শম্ভুরামের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, উভয়ের যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে বীরেন্দ্র সিংহকে পদচ্যুত করিয়া রাজ্যাধিকার করিতে পারে। পরন্তু একটা অনুকূল ঘটনা তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত করিয়া রাখিল, মহারাজের আদেশে শম্ভুরামকে ধৃত করিবার নিমিত্ত বহু লোক নিযুক্ত হইয়াছে, সেই দস্যুদলপতির আবাসস্থান এবং তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য অনেক চর প্রেরিত হইয়াছে। শম্ভুরাম যে অচিরে ধরা পড়িবে, সে সম্বন্ধে বীরেন্দ্র সিংহের কোনই সন্দেহ নাই।

একদিন রাত্রিকালে বীরেন্দ্র সিংহ জ্যেষ্ঠের অনুসরণক্রমে পঞ্চকোট পাহাড়ের পার্শ্বস্থ বনের নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বলেন্দ্র সিংহকে কয়েকজন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। আকারপ্রকার বিচার করিয়া তিনি তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; এরূপে অসমসাহসিক কার্য্য করিতে উদ্যত হওয়া শম্ভুরামের সম্প্রদায়ের

পক্ষে সম্ভব। আরও তিনি মনে করিয়াছিলেন, শম্ভুরাম নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে কালপাত করে। কারণ, সন্নিহিত প্রদেশে তাহার দৌরাত্ম্য বড় প্রবল। বীরেন্দ্র সিংহ ভীত পুরুষ। তিনি দূর হইতে জ্যেষ্ঠকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, শম্ভুরাম সম্প্রদায় সহ পাহাড়ের পার্শ্বস্থ এই ঘনারণ্যমধ্যে সুখে কাল অতিবাহিত করিতেছে।

পিতাকে বীরেন্দ্র সিংহ এই ব্যাপার জানাইয়াছিলেন; সুতরাং এই পুত্রের অনুসরণক্রমে শম্ভুরামের সন্ধান-বিষয়ে বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। অতিশয় চতুর ও সুদক্ষ লোকেরাই শম্ভুরামের সন্ধানে নিযুক্ত হইল। অতএব অবিলম্বে যে সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু ধরা পড়িবে, সে বিষয়ে বীরেন্দ্রের কোন সন্দেহ থাকিল না। ধরা পড়িবামাত্র শম্ভুরামের যে প্রাণদণ্ড হইবে, তাহাও স্থির। আশঙ্কার একটা প্রধান কারণ শীঘ্রই দূর হইবে।

এদিকে বলেন্দ্র সিংহ আশ্রয়হীন, সহায়হীন, অর্থহীন, বলেন্দ্র কি করিতে পারিবে? তাহার সকল সুখের আধার পরমানন্দের নিকেতন অহল্যাও আজিই আমার করতলগত হইবে। শুনিয়াছি, সে বড় সুন্দরী। সুন্দরী হউক বা না হউক, আমার বিলাসমন্দিরে তাহাকে আবদ্ধ থাকিতে হইবে; তখন বলেন্দ্র সিংহ হয় আত্মহত্যা করিবে, না হয় উন্মাদ হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিলাসোদ্যান-সংলগ্ন প্রকাণ্ড বটবৃক্ষমূলে সুপরিষ্কৃত বসনাচ্ছাদিত এক খট্টিকোপরি অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় বীরেন্দ্র সিংহ

এই সকল চিন্তায় ভাসিতেছেন। পার্শ্বে এক যুবতী ব্যজন হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে আন্দোলন করিতেছে, আর এক যুবতী তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অংস-নিপতিত কেশকলাপ সাবধানে আঁচড়াইয়া দিতেছে। তখন এক কৃষ্ণকায় যুবক হাসিতে হাসিতে আসিয়া দূর হইতে বীরেন্দ্র সিংহকে প্রণাম করিল;—বলিল, "যুবরাজের গাছতলায় স্থা। কেন?"

যুবরাজ উঠিয়া বসিলেন;—বলিলেন, "সকলই অনুকূল হইয়াছে, তথাপি মনে হয়, শেষ বুঝি গাছতলায়ই ভরসা হইবে। লছমন! কোন নূতন সংবাদ পাইয়াছ কি?"

লছমন পাঁড়ে নামক প্রায় পঞ্চত্রিংশদ্বর্ষীয় এক ব্যক্তি পূর্ব্বে রাজ-সরকারে অতি সামান্য কর্ম্ম করিত। কিন্তু সৌভাগ্যবলে বীরেন্দ্র সিংহ এই ব্যক্তির উপর বড়ই কৃপাবান্ হইয়াছিলেন। তদবধি পাঁড়েকে আর সামান্য কর্ম্ম করিতে হয় না। সে এখন রাজকুমারের নিতান্ত বিশ্বাস-ভাজন বয়স্য। যে যে শক্তি থাকিলে এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ যুবাকে বশতাপন্ন করিতে পারা যায়, সে সকল শক্তি লছমনের প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাহার সকল কথা বলিয়া গ্রন্থকলেবর কলঙ্কিত করিবার প্রয়োজন নাই। লছমন বলিল, "খবর বিশেষ কিছু নাই, তবে বলেন্দ্র সিংহের একটা খবর পাওয়া গিয়াছে।"

বীরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন, "কি খবর?"

লছমন বলিল, "মধ্যাহ্নকালে শ্যামরূপার মন্দিরে তাঁহাকে অধো-মুখে বসিয়া থাকিতে এক রাজদূত দেখিয়াছে।"

"তার পর?"

"তার পর দূতকে দেখিয়া রাজকুমার সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়া-

ছেন। কোথায় গিয়াছেন, তাহার কোন সংবাদই ত কিছুমাত্র বলিতে পারে না।"

বীরেন্দ্র সিংহ পাদচারণা করিতে করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইলেন ;—বলিলেন, "সেই সময় যদি দূত তাহাকে মারিয়া ফেলিত, তাহা হইলে গোল চুকিয়া যাইত। একাকী ছিল, মন্দিরের নিকট কোন লোক ছিল না ; মারিয়া ফেলিলে সকল গোল মিটিয়া যাইত। বড়ই সুন্দর সুযোগ হাতছাড়া হইয়াছে।"

লছমন বলিল, "আমি সে দিন যাহা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বলেন্দ্রকে মারিয়া ফেলাই হইয়াছে।"

বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন, "কোনরূপে বলেন্দ্র ঘুরিতে ঘুরিতে অহল্যার সন্ধান পাইবে না তো? তাহারা মিলিত হইয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইবে না তো?"

লছমন 'হা হা' শব্দে হাসিয়া বলিল, "কোন আশঙ্কা নাই। হুজুরের হুকুমে আমি সে হরিণীকে এমন বনে বাঁধিয়া রাখিয়াছি যে, আবার সে স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাকেই বেগ পাইতে হইবে। বন্দোবস্ত যাহা করিয়াছি, তাহাতেই আমি ছাড়া আর কেহ নিকটে ঘেঁসিতে গেলে গর্দ্দান রাখিয়া যাইতে হইবে। সকল দিকেই সুবিধা হইয়াছে। আমি এত দিন আয়োজন করিয়া যে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছি, তাহার সকলই ঠিক হইয়াছে। কিন্তু এ অধীন এখনও তুষ্ট হয় নাই।"

"কেন, আরও কি চাও?"

"আপনাকে মহারাজের তক্তে বসাইতে চাই। যে দিন যুবরাজ

নাম ঘুচিয়া আপনার মহারাজ নাম হইবে, সেই দিনই আমার সকল আয়োজন সার্থক হইবে।”

বীরেন্দ্র বলিলেন, “পিতা বৃদ্ধ, তাঁহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী ; সুতরাং তোমার এ আশা শীঘ্রই সফল হইবে।”

লছমন বলিল, “কে বলিতে পারে? মানুষের মনের গতি কে বুঝিতে পারে? যিনি চিরদিন যুবরাজ ছিলেন, তিনি গৃহ-বহিষ্কৃত হইয়াছেন, যিনি কেবল রাজকুমার ছিলেন, তিনি যুবরাজ হইয়াছেন। আবারও যে কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, তাহারই বা স্থির নিশ্চয়তা কি?”

বীরেন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন, “সকলই সম্ভব। বৃদ্ধ পিতার ক্ষণে ক্ষণে মনের গতি ফিরিতে পারে। তাহা হইলে সকল আয়োজনই বৃথা।”

লছমন বলিল, “একবার তক্তের উপর মহারাজা হইয়া বসিলে, একবার সকল সৈন্য-সেনাপতি হাত করিয়া লইলে, আর কোনই ভয়ের কারণ থাকে না।”

বীরেন্দ্র বলিলেন, “ঠিক কথা ; কিন্তু এখন তো তাহার কোন উপায় নাই?”

লছমন বলিল, “উপায় নিশ্চয়ই আছে। এত বয়সে মহারাজার আর বাঁচিয়া থাকায় প্রয়োজন কি? তাঁহার জীবনের সকল ভোগই অনেকদিন হইল শেষ হইয়াছে। এখন তাঁহার জীবন কেবল বিড়ম্বনা-ময়। এখন তিনি মরিয়া যাইলে তাঁহার পক্ষে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কিছুই নাই।”

বীরেন্দ্র বলিলেন, "কথা ঠিক। কিন্তু জোর করিয়া তাঁহাকে লোকান্তরে পাঠাইতে বড় ভয় হয়।"

লছমন ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিল, "ভয়ের কোন কারণ ত দেখি না। এ বয়সে রাজার মৃত্যু হইলে কোন দিকেই কোন সন্দেহ জন্মিবে না, অথচ আমাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে।"

বীরেন্দ্র বলিলেন, "তোমার বুদ্ধি বড়ই তীক্ষ্ণ। তুমি আমার পরম হিতৈষী। যদি সহজে কোন সদুপায় তুমি করিতে পার, তাহা হইলে বাস্তবিকই আমি নিশ্চিন্ত হই।"

লছমন বলিল, "ইহার উপায় আমি অতি শীঘ্রই করিব। আপনি এজন্য নিশ্চিন্ত থাকুন। রাত্রি হইয়া গেল, আপনি এখন 'বুলবুল' ধরিতে যাইবেন না? পক্ষিণী এখন বাসায় ঘুমাইতেছে, বড়ই সুসময়।"

বীরেন্দ্র বলিলেন, "ঠিক মনে করিয়াছ, আরও একটু আগে বাহির হইলেই ভাল হইত।"

তখন বীরেন্দ্র সিংহ বীরের ন্যায় বেশ-ভূষা করিলেন; কটিদেশে দীর্ঘ অসি ঝুলাইলেন; পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড ঢাল বাঁধিলেন। অন্য কোনও অস্ত্র-শস্ত্র তিনি গ্রহণ করিলেন না। লছমনও যুবরাজের অনুরূপ অস্ত্রাদি গ্রহণ করিল। উভয়ে অন্ধকার-রজনীতে সেই উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রবেশদ্বারের বাহিরে আসিয়া লছমন একজন দ্বারবান্‌কে অশ্বশালা হইতে দুইটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্ব সাজাইয়া আনিতে পাঠাইল, আর একজন সেনা-নিবাস হইতে পাঁচজন শরীররক্ষক ডাকিয়া আনিতে ছুটিল। সেই অন্ধকারে পাদচারণা করিতে করিতে অতি অস্ফুট-স্বরে দুইজনে অনেক পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে সজ্জিত অশ্ব ও অশ্বারোহী সৈনিক আসিল। তখন সেই অশ্বদ্বয়ে বীরেন্দ্র ও লছমন আরোহণ করিলেন। অশ্বদ্বয় তীরবেগে ধাবিত হইল। রক্ষিগণ অনুসরণ করিল।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বড়তোর গ্রামের দক্ষিণে এক বনমধ্যে অশ্বারোহিগণ প্রবেশ করিলেন। লছমন সর্ব্বাগ্রে পথপ্রদর্শকরূপে অশ্ব চালাইতে লাগিল। অতি অল্পদূর অগ্রসর হওয়ার পর এক অপরিচিত ব্যক্তি উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসিল, "কে অশ্বে?"

লছমন উত্তর দিল, "লছমন পাঁড়ে; সঙ্গে স্বয়ং যুবরাজ।"

সেই অপরিচিত স্বর বলিল, "দাসের বিনীত সম্মান গ্রহণ করুন।"

প্রায় ভূমিতল-সংলগ্ন একখানি পর্ণকুটীর-সমীপে লছমন ঘোড়া থামাইল। তখন যুবরাজ ও লছমন উভয়েই অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। কুটীরদ্বারে মৃদু আঘাত করিতে করিতে লছমন ডাকিল, "মতিয়া!"

ঘরের ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে উত্তর হইল, "আসিয়াছ ঠাকুর! আমাকে বাঁচাইয়াছ। এমন কষ্ট কি মানুষে দেখিতে পারে গা? কেবল কাঁদাকাটি, অনাহার, অনিদ্রা; এ যন্ত্রণা তো আর চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পারি না।"

লছমন বলিল, "ভয় নাই। যুবরাজ নিজে আসিয়াছেন; তুমি আলো ঠিক করিয়া দুয়ার খুলিয়া দাও। ঘরের মধ্যে তোমার আর এখন থাকিবার দরকার নাই, বাহিরে আইস।"

মতিয়া আদেশ পালন করিয়া বাহিরে আসিল। ঘরে এক খণ্ড পাষাণের উপর একটী ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছিল, আর অহল্যা সুন্দরী একখানি দাড়ির খাটিয়ার উপর বসিয়া অবিরলধারে কাঁদিতে কাঁদিতে দ্বারের

দিকে চাহিয়া ছিলেন; মনে বড়ই ভরসা—যুবরাজ; সুতরাং তাঁহার স্বামী বলেন্দ্র সিংহ আসিতেছেন। ভাগ্যে বিপদের পেষণে তিনি জীবন ধ্বংস করেন নাই, তাই তো আবার স্বামীর চরণ দেখিতে পাইতেছেন। অনেক লোক সঙ্গে, তাই অহল্যা স্বামীকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহিরে ছুটিয়া আসেন নাই।

দ্বারের মধ্য দিয়া এক যুবাপুরুষ সেই কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিবামাত্র অহল্যা অস্ফুটস্বরে হৃদয়ের ভিত্তি অবগুণ্ঠিত করিয়া বসনে মুখ ঢাকিলেন এবং দারুণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

কুটীরপ্রবেশকারী বীরেন্দ্র সিংহ মোহিত হইলেন। অনেক নারী তাঁহার বাসনানলে ধর্ম্ম-ধন বিসর্জ্জন দিয়াছে। অনেক যুবতী-পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি তারকা-মধ্যস্থ নিশানাথের ন্যায় সতত ভোগপরায়ণ। কিন্তু এমনটি—ঐ খট্টাসীনা, অশ্রুভারাবনতা অথবা প্রসন্নতাময়ী সুন্দরীর ন্যায় অতুলনীয়া নারী তিনি আর কখন দেখেন নাই। কেবল ভোগবাসনাই যাহার জীবনের পরম লক্ষ্য, কেবল পশুপ্রবৃত্তি যাহার একমাত্র অবলম্বনীয়, সে কাণ্ডজ্ঞান হারাইল;—বলিল, "অহল্যা! তোমার ন্যায় সুন্দরী বোধ করি কেহ কখন দেখে নাই। আমি তোমার রূপের প্রশংসা শুনিয়া এই নিশাকালে বহু সুন্দরীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তুমি কাঁপিতেছ কেন? যাঁহার চন্দ্রাননে নিরন্তর আনন্দ শোভা পায়, যাঁহার অধরে সতত হাসি বাসা বাঁধিয়া থাকিতে চাহে, যাঁহার নয়নের কটাক্ষ সংসারের সকল লোকের চিত্তকে উন্মাদ করিয়া দিতে পারে, তাঁহার চক্ষুতে জল কেন? আইস সুন্দরি! তোমার দুঃখের

দিন শেষ হইয়াছে, এই অরণ্যে এই জঘন্য স্থানে তোমার আর এক মুহূর্ত্ত থাকিতে হইবে না।”

কথাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বীরেন্দ্র সিংহ সুন্দরীর হস্ত ধারণ করিবার নিমিত্ত নিকটস্থ হইলেন, সর্পদষ্ট জীবের ন্যায় ক্লিষ্টভাবে সুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার মস্তক বিচলিত, দেহ প্রায় সংজ্ঞাহীন, মুখ বাক্যকথনে অশক্ত; তথাপি অতি কষ্টে অহল্যা জিজ্ঞাসিলেন, “মহাশয় আপনি কে?”

বীরেন্দ্র সিংহ বলিলেন, “আমি মানভূমের যুবরাজ। তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। হতভাগ্য বলেন্দ্র সিংহ তাড়িত হইয়াছে। সে এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে কি না সন্দেহ।”

আর কোন কথা বীরেন্দ্রকে বলিতে হইল না। কারণ, তৎক্ষণাৎ হৃদয়-ভেদী চীৎকার করিয়া অহল্যা সুন্দরীর বিগতচেতন কলেবর ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। ‘কি হইল? কি হইল?’ বলিয়া মতিয়া ছুটিয়া আসিল। লছমন প্রভৃতি সঙ্গিগণ দূরে সরিয়া গিয়াছিল। তীব্র আর্ত্তনাদ-শ্রবণে পাঁড়ে ঠাকুরও আসিয়া উপনীত হইল।

তখন বীরেন্দ্র সিংহ বলিলেন, “বোধ হয়, অহল্যা চৈতন্য হারাইয়াছে, কিন্তু সে জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। বলেন্দ্র সিংহের দুর্গতির কথা শুনিয়া সহসা এইরূপ মূর্চ্ছা হওয়া সম্ভব। গরীবের মেয়ে, বড়ই আশা করিয়াছিল, কালে রাজরাণী হইবে; সেই আশা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মাথা খারাপ হওয়া বিচিত্র নহে। দেখ মতিয়া, বাঁচিয়া আছে কি না? বাঁচিয়া থাকিলে, লছমন, যে কোন উপায়ে উহাকে এখনই রাজধানীতে লইয়া চল। যদি মরিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বাহিরে

টানিয়া ফেলিয়া দেও। বনের পশু-পক্ষী আমাদিগকে ধন্যবাদ দিবে।”

লছমন বলিল, “মরিয়া যাইবে কেন? কাছ করিতেছে; হুজুর যে যুবরাজ, তাহাও শুনিয়াছে, এখন কায়দা খেলিয়া আপনাকে মুঠার মধ্যে পূরিতে চাহে। অনেক ধূর্ত্ত স্ত্রীলোক বাল্যকাল হইতেই এ সকল কৌশল বেশ করিয়া শিখে।”

তখন মতিয়া কক্ষমধ্যস্থ মৃৎকলসী হইতে মৃৎভাণ্ডে জল ঢালিয়া লইল; তাহার পর সুন্দরীর কপালে, নয়নে ও মুখে ধীরে ধীরে জল দিতে লাগিল। অহল্যা নয়ন মেলিয়া চাহিলেন; চারিদিকে একবার সভয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া বীরেন্দ্রকে বলিলেন, “তুমি! তুমি মানভূমের যুবরাজ! সে দেবতা আর এ দেশে নাই! আমাকে মারিয়া ফেল। তোমার কটিতে তরবারি ঝুলিতেছে, দয়া করিয়া আমাকে দেও, আমি এ হৃদয় বিদ্ধ করিব।”

বীরেন্দ্র বিরক্তভাবে বলিলেন, “দেখিতেছি, তুমি বড়ই নির্ব্বোধ, আমি মানভূমের যুবরাজ, এ পরিচয় আমি তোমাকে জানাইয়াছি; আমি তোমার প্রণয়প্রার্থী, ইহাতে সৌভাগ্য জ্ঞান না করিয়া তুমি যখন দুঃখ প্রকাশ করিতেছ, তখন বাস্তবিকই তোমাকে বিশেষ শাস্তি পাইতে হইবে। আমার উপপত্নীরূপে তোমাকে গ্রহণ করিব। আর অন্যান্য উপপত্নীর দাসী হইয়া তোমাকে জীবন কাটাইতে হইবে। স্বয়ং ভগবান্‌ও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। লছমন! কি দেখিতেছ? এই দুষ্টার মুখ বাঁধিয়া ফেল; হাত-পা বাঁধিয়া একটা ঘোড়ার উপর চাপাইয়া দেও। এ যেমন অহঙ্কৃতা, আমি ইহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিব।”

অহল্যা বলিলেন, "সাবধান! কেহই আমার অঙ্গে হস্তার্পণ করিতে আসিও না। যিনি দারুণ দুর্দ্দৈবে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই সতী ভগবতী নিশ্চয়ই তোমাদিগকে বিপদে ফেলিবেন।—সাবধান!"

বীরেন্দ্র সিংহ হাস্য করিয়া বলিলেন, "দেখি, কোন্ ভগবতী তোমার সহায় হয়?"

তখন বীরেন্দ্র আবার সুন্দরীর নিকটস্থ হইলেন এবং অহল্যার সেই নবনীতকোমল কর-পল্লব ধারণ করিলেন। তখন বাস্তবিকই উন্মাদিনীভাবে অহল্যা লাফাইয়া উঠিলেন এবং দেহে যত শক্তি আছে, সমস্ত সঞ্চার করিয়া বীরেন্দ্রের বক্ষে প্রচণ্ড এক পদাঘাত করিলেন। এরূপ অত্যাচারের নিমিত্ত বীরেন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং তিনি সেই পদাঘাতে বিপরীত দিকে পড়িয়া গেলেন। ক্রোধ সীমাশূন্য হইয়া উঠিল। লছমন কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল।

তখন বীরেন্দ্র বলিলেন, "ইহাকে এই মুহূর্ত্তেই খণ্ড খণ্ড করিতাম; কিন্তু তাহা হইলে ইহার শাস্তি সম্পূর্ণ হইবে না। তোমরা যেমন করিয়া পার, ইহাকে বাঁধিয়া লও, অগ্রে ইহার ধর্ম্মনাশ, পরে ইহার প্রাণনাশ করিতে হইবে।"

তখন লছমন সুন্দরীর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিল, "কেন আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতেছ? বুঝিতেছ না, যুবরাজ যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন?"

অহল্যা বলিলেন, "তুমি পিশাচের সঙ্গী পিশাচ! তোমার যুবরাজ আমার কোনই অনিষ্ট করিতে পারে না। আমি তোমাকেও পদাঘাতে দূর করিব।"

লছমন বলিল, "তবে মর।" এই বলিয়া লছমন বল পূর্ব্বক অহল্যার কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিল। সুন্দরীর বাক্যকথনের শক্তি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিল, তিনি লছমনের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ক্ষুদ্র অবলার ক্ষীণ চেষ্টা সফল হইল না। তিনি নিরুপায় হইয়া শ্বাসাবরোধজনিত অস্পষ্ট-স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "ভবানি! মা! রক্ষা করিবে না?"

তখন সকলে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, সেই কুটীর-দ্বারে অপরিচিত এক বীরমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। সেই আগন্তুকের দেহে কোন বেশ-ভূষার পারি-পাট্য নাই। একখণ্ড অপ্রশস্ত বস্ত্রমাত্র তাহার কটিদেশে বিজড়িত, আর একখানি গামছার মত ক্ষুদ্র উত্তরীয় দ্বারা তাহার মস্তক বেষ্টিত। সেই বীর আমাদের সুপরিচিত রাঘব।

আজ্ঞাসূচক গম্ভীর-স্বরে রাঘব বলিলেন, "যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে পিশাচ! তুমি এই সতীর নিকট হইতে সরিয়া আইস। নতুবা আমার এই উলঙ্গ অসি এখনই তোমার শোণিতে স্নান করিবে।"

লছমন সুন্দরীর কণ্ঠদেশ হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া সবিস্ময়ে এই আগন্তুকের প্রতি চাহিল।

বীরেন্দ্র বলিলেন, "কে তুমি? রক্ষিগণ! নিকটে আইস। এই দুরাচারকে এখনই কাটিয়া ফেল।"

রাঘব হাসিয়া বলিলেন, "কোথায় তোমার রক্ষিগণ? তাহারা প্রত্যেকেই বন্ধন-দশায় গাছতলায় পড়িয়া প্রাণের জন্য ভাবিতেছে, আমাকে কাটিতে মানভূম-রাজ্যের সমস্ত সৈন্যেরও সাধ্য নাই। কিন্তু বৃথা কথায় আমি সময় নষ্ট করিতে পারি না। তোমার ন্যায় অধম জীবকে

বধ করিলে আমার কলঙ্ক হইবে; নতুবা এতক্ষণ ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায় তোমাকে টিপিয়া মারিতাম।"

আগন্তুকের এই সাহসিকতাপূর্ণ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে বীরেন্দ্র ও লছমন স্তম্ভিত হইলেন। লছমন সভয়ে জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি শম্ভুরাম?"

তখন রাঘব উভয় হস্ত একত্র করিয়া ললাট স্পর্শ করিলেন;—বলিলেন, "এই অধম সেই দেবতার অতি ক্ষুদ্র একজন সেবক। কিন্তু তোমাদিগের সহিত কোনরূপ আলাপ করিবার আমার প্রয়োজন নাই। আমার আদেশ পালন করিতে তোমরা সম্মত আছ কি না, ইহাই আমি জানিতে চাহি।"

সহসা বীরেন্দ্র সিংহ অসি নিষ্কোষিত করিয়া রাঘবের দেহে আঘাত করিলেন। ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত গৃহে অসি উত্তোলন করিতে তেমন সুযোগ না হওয়াতে রাঘবের বামহস্তে অতি সামান্যমাত্র আঘাত লাগিল। তখন বজ্রমুষ্টিতে রাঘব বীরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিলেন। বীরেন্দ্র বুঝিলেন, এ ব্যক্তির দেহে অসুরের ন্যায় শক্তি;—বলিলেন, "তুমি ডাকাইতের দাস, তোমাকে ক্ষমা করিতে পারিব না।"

রাঘব বলিলেন, "আমি কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করিব। অকারণ লোকের রক্তপাত করিতে আমার গুরুর আদেশ নাই। আমি তোমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই সতীকে নিরাপদ্ স্থানে লইয়া যাইব।"

বলিতে বলিতে রাঘব বীরেন্দ্রকে আকর্ষণ করিয়া ঘরের বাহিরে আনিলেন এবং মার্জ্জার যেমন মূষিককে ধারণ করে, বক যেরূপ সফরী-মৎস্যকে চঞ্চুপুটে গ্রহণ করে, তদ্রূপ অবলীলাক্রমে তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া একটী বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া ফেলিলেন, তাহার পর লছমনের

দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তুই হতভাগা কিরূপ দণ্ডের প্রার্থনা করিস্? তোকে এক পদাঘাতে দূর করিতেছি।"

তৎক্ষণাৎ লছমনকে ধরিয়া রাঘব বনের মধ্যে সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। গুরুতর আঘাত পাইয়া লছমন সেই স্থানে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাঘব অহল্যাকে বলিলেন, "মা, আমি আপনার সন্তান, আমাকে বিশ্বাস করুন, আপনার কোন চিন্তা নাই, আমার সঙ্গে অনেক রক্ষী আছে। আপনি আসুন, আমি আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ্ স্থানে লইয়া যাইব।"

অহল্যা বলিলেন, "বুঝিয়াছি, আপনি দেবতা, আপনাকে আমার কোনই অবিশ্বাস নাই। চলুন, আমি যাইতেছি।"

রাঘব বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে লইবার আবশ্যক নাই। এ পিশাচের দূতী। মা! আপনি সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে আসুন।"

বীরেন্দ্র ও লছমনের অসি-বর্ম্ম রাঘব গ্রহণ করিলেন। তাহার পর কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অহল্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। কিয়দ্দূরমাত্র অগ্রসর হওয়ার পর দশ জন অশ্বারোহী বীরবর রাঘবকে প্রণাম করিল। তাহাদের নিকট বীরেন্দ্র সিংহের অশ্ব সমূহ ও সঙ্গিগণের অস্ত্রাদি সংগৃহীত ছিল।

রাঘব অশ্বারোহণ করিলেন না; সঙ্গীগণকে অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিতে আদেশ করিলেন। বনভূমিও নিস্তব্ধ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শম্ভুরাম ও তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই যে অনমসাহসিক বীর, সে বিষয়ে বীরেন্দ্র সিংহের আর কোন সন্দেহ থাকিল না। দেশের তাবৎ লোকেই তখন শম্ভুরামের প্রশংসা করিত; কেবল যাহারা পরস্বাপহারক, পরপীড়ক এবং অত্যাচারী, তাহারাই শম্ভুরামকে নীতিভ্রষ্ট নৃশংস পুরুষ বলিয়া মনে করিত এবং শাসনতন্ত্র-বিলোপকারী দুর্ব্বৃত্ত ডাকাইত বলিয়া তাহার নির্য্যাতনের উপায় অন্বেষণ করিত; কিন্তু কেহই কোন উপায়ে এই অদ্ভুতকর্ম্মা শম্ভুরামকে কদাচ আয়ত্ত বা অপদস্থ করিতে পারিত না। সকলেই তাঁহাকে দৈবীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া জানিত; অনেকে তাঁহাকে ভবানীর প্রিয়পুত্র জ্ঞানে ভক্তি করিত। বিস্ময় সহকারে সকলেই দেখিত যে, শম্ভুরামের অজ্ঞাত বিষয় এ জগতে বুঝি আর কিছুই নাই। যেখানে যেখানে অত্যাচার ঘটে, সেই সেইখানেই শম্ভুরামের আবির্ভাব। এমন কি, অনেকে মনে করিত যে, মনে মনে কোন পাপ করিলেও শম্ভুরাম হয় তো তাহাও বুঝিতে পারিবে। সন্নিহিত সমস্ত প্রদেশে শম্ভুরামের অগণনীয় শাসন। রাজা বা প্রজা, ধনী বা নির্ধন সকলের উপরেই শম্ভুরামের তীক্ষ্ণদৃষ্টি; কোন পরাক্রমশালী ব্যক্তি বা কোন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রাজ্যেশ্বর, কাহারও সম্মুখে শম্ভুরাম ভীত হইবার পাত্র নহেন।

শম্ভুরাম সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তান্ত বীরেন্দ্র সিংহ অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছেন। গত কল্য রাত্রিকালে তিনি আবার ইহা স্বয়ং

সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন। শম্ভুরামের একজন আশ্রিত ব্যক্তির যখন এতদূর স্পর্দ্ধা, তখন না জানি, শম্ভুরাম কি ভয়ানক লোক। এ পর্য্যন্ত শম্ভুরামের প্রচণ্ড শাসনদণ্ড বীরেন্দ্র সিংহের উপর কখন পরিচালিত হয় নাই। এখন তিনি বুঝিয়াছেন, এই দুর্দ্ধর্ষ দস্যুকে নির্জ্জীব করিতে না পারিলে কোনদিকেই ভদ্রস্থতা নাই।

মহারাজের নিকট বীরেন্দ্র সিংহ শম্ভুরামের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বেই দস্যু-নায়ককে ধরিবার নিমিত্ত চারিদিকে লোক প্রেরিত হইয়াছে, আবার অদ্য তাহাকে হয় ধরিবার, না হয় মারিবার নিমিত্ত বিশেষ আয়োজন হইল। দুই শত সৈন্য চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারি জন সুদক্ষ নায়কের অধীনে থাকিয়া শম্ভুরামের সর্ব্বনাশ করিতে যাত্রা করিল। সকলেই বুঝিল, শম্ভুরাম অচিরে হয় জীবিত, নতুবা মৃতাবস্থায় মহারাজের সম্মুখে আনীত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। যতদিন উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তত দিন সৈন্যেরা রাজধানীতে ফিরিবে না।

বীরেন্দ্র সিংহ পিতৃদেবকে বুঝাইয়াছেন যে, বলেন্দ্র সিংহ এই দস্যু-দলের সহিত মিলিয়াছে এবং মহারাজকে রাজ্যচ্যুত বা হত্যা করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। মহারাজা এ কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন। তিনি শম্ভুরামের সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া দিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ হইলেন।

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল; কোন সম্প্রদায় ফিরিল না; কোন স্থান হইতে কোন সংবাদও আসিল না। বীরেন্দ্র সিংহ অদ্য অপরাহ্ন হইতে পিতার নিকটে রহিয়াছেন। শম্ভুরাম ও বলেন্দ্র সংক্রান্ত কোন্ বিষয়ের কখন্ কোন্ ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহার স্থিরতা নাই। এই জন্য [illegible]

রাজা আজি এই প্রিয় পুত্রকে নিকটে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। বৃদ্ধের মনে অনেক আশঙ্কা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, মহারাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বীরেন্দ্র সাবধানে পিতার হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পুরমধ্যে লইয়া গেলেন। মহিষী নিকটে আসিলেন, পরিচারিকারা মহারাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। তখন বীরেন্দ্র মহারাজের জল-যোগাদির আয়োজন স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করিলেন। এই সকল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া এবং পিতৃভক্তির পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধ মহারাজা অতিশয় প্রীত হইলেন। মহারাণী জানিতেন, বলেন্দ্র সিংহ সর্ব্বগুণে গুণান্বিত। এই বীরেন্দ্র কুলাঙ্গারবিশেষ। কিন্তু মহারাজা কুলপালক পুত্রের উপর বিরক্ত, আর এই নীচস্বভাব পুত্রের প্রতি স্নেহময়। চির-দিন অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবা, সতীর ধর্ম্মনাশ, মহিলামণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া কালপাত করাই যদি পরম ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে বীরেন্দ্র নিশ্চয়ই পিতার উপযুক্ত পুত্র। পুত্রের সহসা এইরূপ পিতৃভক্তির আতিশয্য মহা-রাণীর মনে বড় ভাল লাগিল না। মহারাজা সন্ধ্যা-বন্দনায় নিযুক্ত হইলেন। বীরেন্দ্র সিংহ এই সুযোগে প্রমোদ-কাননাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিত্যক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া মহারাজা জলযোগে বসিলেন। বৃদ্ধ অনেক দিন হইতে রাত্রিকালে আহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ ফলমূল, অল্প মিষ্ট-সামগ্রী এবং একটু দুগ্ধ খাইয়া তিনি রাত্রিপাত করেন। মহারাণী সেই সকল সামগ্রী স্বহস্তে আনিয়া যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। তাহার পর বৃদ্ধ স্বামীকে আসন-সমীপে আনিয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিলেন। উজ্জ্বল আলোক ভোজন-স্থানের নিকটে স্থাপিত হইল। পরিচারিকারা দূরে প্রস্থান করিল। মহারাজার মহিষী

অনেক, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু বীরেন্দ্র-জননী সর্ব্ব-কনিষ্ঠা এবং পুত্রপ্রসবিনী। সুতরাং তাঁহারই মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মহারাণী নিকটে বসিয়া স্বামীকে খাদ্যদ্রব্য দেখাইয়া দিতে লাগিলেন এবং আরও কিঞ্চিৎ খাদ্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে দৈববাণীর ন্যায় শব্দ হইল, "আর খাইও না, বৃদ্ধ বয়সে যেন তোমার ভাগ্যে অপমৃত্যু না ঘটে।"

রাজা কাঁপিতে লাগিলেন, রাণী চমকিয়া উঠিলেন। উভয়েই দেখিলেন, পশ্চাতের উন্মুক্ত দ্বারের অপর পার্শ্বে এক আজানুলম্বিতবাহু, দীর্ঘকায় পুরুষ দণ্ডায়মান। রাজা বলিলেন, "কে তুমি? কিরূপে অন্দরে প্রবেশ করিলে? অন্দরের নিকটে আসিলেও মাথা কাটা যায়, তাহা তুমি জান না কি?"

পুরুষ বলিল, "সব জানি। কিন্তু আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার মৃত্যুকাল অতি নিকটবর্ত্তী, এ অবস্থায় তোমার অপমৃত্যু নিবারণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমি সেই কর্ত্তব্যপালনের জন্যই এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। মহারাণী আমার জননী; অন্তঃপুরের তাবতেই আমার মাতৃরূপা। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, আমি এ স্থানে আসিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিতাম না।"

মহারাজা বলিলেন, "আমার অপমৃত্যু হইবে? এরূপ পাগ্‌লামী করিতে তুমি কেন আসিয়াছ? কে তুমি?"

পুরুষ বলিল, "কে আমি, সে পরিচয় পরে হইবে। আমি পাগ্‌লমী করিতে আসি নাই। তোমার ঐ দুগ্ধে অতি তীব্র বিষ মিশ্রিত আছে।

এখনই একটা বিড়ালকে একটু খাওয়াইয়া আমার কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে পার।”

মহারাণী সমস্ত কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং স্বামীর নিকট হইতে দুধের পাত্রটা সরাইয়া লইলেন। ঘটনাক্রমে একটা বিড়াল সেই সময় দূরে বসিয়া ছিল, মহারাণী বিড়ালকে ডাকিয়া দুগ্ধের পাত্র সরাইয়া দিলেন। পরমানন্দে সেই হৃষ্টপুষ্ট মার্জ্জার সেই রাজভোগ্য দুগ্ধ লেহন করিতে লাগিল। কিন্তু কি ভয়ানক ব্যাপার! অত্যল্প মাত্র দুগ্ধ উদরস্থ হওয়ার পর সেই পশু যন্ত্রণাসূচক অব্যক্ত ধ্বনি করিতে করিতে সরিয়া গেল। কিয়দ্দূর মাত্র গমনের পরই সে ভূপতিত হইল এবং তাহার দেহে বিজাতীয় আক্ষেপ উপস্থিত হইল।

মহারাণী অস্ফুট-স্বরে রাজাকে বলিলেন, “কি সর্ব্বনাশ! দেখিতেছি, দুগ্ধের সহিত ভয়ানক বিষ মিশ্রিত রহিয়াছে। ভগবন্! কি রক্ষাই করিয়াছ। নিশ্চয় এখনই মহারাজের অপমৃত্যু ঘটিত।”

পুরুষ উত্তর করিল, “যাহার সহিত আত্মীয়তা আছে বলিয়া বলেন্দ্র সিংহকে অপরাধী করিয়াছ, যাহাকে ধরিবার নিমিত্ত অথবা হত্যা করিবার নিমিত্ত তোমার বহু লোক দুই দিন হইতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, আমিই সেই ডাকাইত শম্ভুরাম। আমি স্বয়ং আসিয়া তোমার এই নিভৃত অন্তঃপুরে তোমার জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান।”

রাজার তখন সংজ্ঞা প্রায় তিরোহিত। তাঁহাকে পতনোন্মুখ দেখিয়া মহারাণী তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। শম্ভুরাম বলিলেন, “কোন ভয় নাই, আমি নৃশংস দস্যুই হই বা দুর্দ্দান্ত দুরাচারই হই, কখন কাহার কোন অনিষ্ট আমি জ্ঞানেও করি নাই। তোমার গৃহে পিশাচের বাস, তোমার

বীরেন্দ্র সিংহ নরকের কীট। তুমি তাহাকে যুবরাজ করিয়াছ, তোমার মৃত্যুর পর সে সিংহাসন লাভ করিবে, কিন্তু তাহার আর বিলম্ব সহিতেছে না। সে তোমার এই জীর্ণ দেহতরী এখনই ডুবাইয়া দিবার নিমিত্ত তোমার দুগ্ধের সহিত ভয়ানক বিষ মিশাইয়াছে। তুমি পিশাচের কথা বিশ্বাস করিয়া দেবতাকে পদাঘাত করিয়াছ। বলেন্দ্র সিংহের সদ্‌গুণ হৃদয়ে ধারণ করিবার ক্ষমতা তোমার নাই। কারণ, তুমি চিরদিনের পাপী।"

মহারাজা নীরব, অধোমুখ, চিন্তাকুল। শম্ভুরামের প্রত্যেক কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মহারাণীর মনে হইল। শম্ভুরাম আবার বলিলেন, "তোমার কোন কথা শুনিতে আমার প্রয়োজন নাই। এখন আমার কথা তুমি শুনিয়া যাও। লছমন পাঁড়ের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বীরেন্দ্র পিতৃহত্যায় উদ্যত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রমাণ লইতে ইচ্ছা হইলে, তুমি লছমনকে ডাকিয়া মাথা কাটিবার ভয় দেখাইবে, সে ভীরু, কাপুরুষ, সকল কথা স্বীকার করিয়া ফেলিবে। কোন দিন তোমার দুরাচার পুত্র পাপিষ্ঠা সঙ্গিনীদিগের সহিত জঘন্য কার্য্যে কালপাত না করিয়া তোমার পরিচর্য্যা করিতে আইসে না। আজি সহসা তাহার এই পিতৃভক্তি দেখিয়া তোমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তুমি নির্ব্বোধ।"

মহারাণী এ কথা বেশ বুঝিলেন। বীরেন্দ্র সিংহের অপ্রত্যাশিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া মহারাণীর মনে একটা সন্দেহ হইয়াছিল। শম্ভুরাম আবার বলিলেন, "আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। তুমি আমাকে পরিহার জন্য ধরিতেছ। আমি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক ধরা দিয়াছি, কি করিতে চাও, কর, কি বলিতে চাও, বল।"

মহারাজা বলিলেন, "তুমি রাজশক্তির অবমাননাকারী, তুমি লোকের উপর উৎপীড়ন করিয়া থাক। এই জন্য তুমি রাজবিচারে দণ্ডার্হ।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "রাজা কে? বিচারই বা করিবে কে? তোমার ন্যায় আজন্ম ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি রাজনামের কলঙ্ক। তুমিই কি বিচার করিয়া আমাকে দণ্ড দিবে? ধিক্ তোমাকে! আমি এই দণ্ডেই অথবা বহুলোক-বেষ্টিত রাজ-সভামধ্যে তোমার পাপ-জীবনের অবসান করিয়া দিতাম; কিন্তু তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, ঈশ্বর যাহা শীঘ্র ঘটাইবেন, তাহার জন্য আমার ব্যস্ত হওয়া অনাবশ্যক। এই কারণে তুমি ক্ষমা লাভ করিয়া আসিতেছ। সত্য বটে, আমি রাজশক্তির অবমাননাকারী; যেখানে রাজা রাজ-ধর্ম্ম জানে না, যেখানে রাজা পশুরই রূপান্তর, যেখানে রাজা সতীত্বনাশক, ধর্ম্মদ্রোহী, স্বার্থপর ও ভ্রষ্টাচারী, সেখানেই আমি রাজশক্তিকে পদতলে দলিত করি। আমি অত্যাচারী সত্য, যে স্থলে পাপ-লীলার অভিনয় হইতেছে, যে স্থলে অধর্ম্মের ভয়ে মনুষ্য সন্ত্রাসিত হইতেছে, যেখানে অত্যাচারীর কলঙ্কে ধরণী কলঙ্কিত হইতেছে, আমি সেইখানেই অত্যাচারী। কা'ল রাত্রিতে তোমার প্রিয়পুত্র বীরেন্দ্র সিংহ নিঃসহায়া ভ্রাতৃজায়ার ধর্ম্ম হরণ করিতে গিয়াছিল, অধমকে হত্যা না করিয়া আমার লোকেরা সেই সতীর ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছে; সুতরাং আমি অত্যাচারী। কিন্তু যাও বৃদ্ধ, আমি তোমার সহিত অনর্থক বিতণ্ডা করিতে চাহি না। তোমার সাধ্য থাকে—ইচ্ছা হয়, আমাকে দণ্ড দিতে পার। দেখ, আমি নিরস্ত্র; আমি একাকী; তথাপি তোমার ক্ষমতাকে আমি কোন প্রকার গ্রাহ্যও করি না।"

মহারাজা নীরবে অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শম্ভুরাম আবার বলিলেন, "তুমি চিন্তা করিতে থাক; কিরূপে আমাকে হত্যা করিতে বা অধীন করিতে পারিবে, তাহার উপায় স্থির করিয়া রাখ, আবার আসিয়া তোমার প্রিয়পুত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। তাহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত বারংবার আমার আসিবার প্রয়োজন হইবে। তুমি সাবধান থাকিবে, আজি তুমি রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। তোমার গুণধ্বজ পুত্র তোমার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতেও পারে।"

এতক্ষণে মহারাজ বলিলেন, "বুঝিতেছি, আপনি বড়ই শক্তিমান্ পুরুষ। আপনার সহিত আর একবার সাক্ষাৎ প্রার্থনীয়।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "উত্তম। কিন্তু আপাততঃ আপনার একশত সৈন্য আমার হস্তে বন্দী হইয়াছে। অপর একশত আমার এক চর কর্ত্তৃক বিপরীতদিকে প্রেরিত হইয়াছে। যেরূপ বিপদের পথে আমার লোক তাহাদিগকে পাঠাইয়াছে,তাহাতে সজীব অবস্থায় যে তাহারা রাজধানীতে ফিরিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। আপনার সৈন্য-বল অতি সামান্য, তিন চারি শতের বেশী হইবে না। তাহা হইতে দুই শত নির্ব্বাচিত সৈন্য হাতছাড়া হইল। রাজ্যের পক্ষে বড়ই ভয়ানক সময়। আপনার প্রিয়-পুত্র এ সময়ে সকল পাপই করিতে পারেন; রাজ্যের সর্ব্বনাশও ঘটিতে পারে। সাবধান, মহারাজ, সাবধান! আমি এক্ষণে বিদায় হই। মহা-রাণী মা! আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে প্রণাম করি।"

সহসা শম্ভুরাম অদৃশ্য হইলেন। যেন আকাশগত মূর্ত্তি সহসা আকাশে মিলিয়া গেল। মহারাজা অবাক্! এরূপ তেজস্বী, এরূপ সাহসী

মনুষ্য কখনই তাঁহার নয়নে পড়ে নাই। মহারাণী ধীরে ধীরে বলিলেন, "এ ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান্। সত্যই এ ভবানীর বরপুত্র।"

বৃদ্ধ মহারাজা বলিলেন, "এক্ষণে উপায় ?"

মহারাণী বলিলেন, "হাত-মুখ ধোও, বিছানায় উঠিয়া আইস। প্রবীণ সভাসদ্‌গণকে ডাক; বালকের কথা শুনিও না। বৃদ্ধবয়সে অপমৃত্যুতে মরিও না।"

তখন মহারাজা পরিচারিকার দ্বারা প্রতিহারীকে আহ্বান করাইলেন এবং কয়েকজন বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সে কথায় এখন আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা এক্ষণে ডাকাইত-সর্দ্দার শম্ভুরামেরই অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি।

অন্তঃপুরের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর। শম্ভুরাম একলম্ফে সেই প্রাচীরের উপর উঠিলেন; তথা হইতে ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলিস্থাপন করিয়া একটা তীব্র শব্দ উৎপাদন করিলেন। দূরে আনন্দ-কানন হইতে তাহার অনুরূপ শব্দ উঠিল। তখন শম্ভুরাম প্রাচীর হইতে লাফাইয়া বাহিরে পড়িলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর দশ জন অশ্বারোহী বীর তাঁহার নয়নে পড়িল। তাহাদিগের সঙ্গে প্রভুভক্ত 'লাল'। লাল প্রভুকে দর্শনমাত্র বারংবার পুচ্ছ ও মস্তক আন্দোলন করিল। শম্ভুরাম তাহাকে আদর করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিলেন। বেগে সকল অশ্ব ধাবিত হইল। রাত্রিশেষে শম্ভুরাম অনুচরগণ সহ ধর্ম্মকাননে উপস্থিত হইলেন। অনুচরেরা বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। লাল প্রভৃতি অশ্ব সমূহ মন্দুরায় গমন করিল।

তখন শম্ভুরাম আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে না যাইয়া দূর হইতে

সুমধুর প্রীতিপূর্ণ স্বরে ডাকিলেন, "রঙ্গিলা! রঙ্গিলা! কোথায় তুমি?"

তৎক্ষণাৎ সেই উষার শোভাকে সৌন্দর্য্য-বিভূষিত করিয়া প্রভাত-সমীরে তুলিতে তুলিতে রঙ্গিলা তাঁহার সম্মুখে আসিলেন।

শম্ভুরাম জিজ্ঞাসিলেন, "রাজ-পুত্র-বধূ কুশলে আছেন তো?"

রঙ্গিলা বলিলেন, "তুমি বীর—কর্ম্ম সাগরে নিয়ত ভাসমান। নারীর কুশল কিসে হয়, তাহা কি তুমি বুঝিবে গুরু?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "কেন বুঝিব না দেবি! আমি কর্ম্মময় বীর হইলেও তোমার প্রেম-সাগরে সতত ভাসমান। তুমি পশ্চাতে আছ জানিয়া আমি অসাধ্যসাধনে সক্ষম। তোমার উৎসাহে আমার উৎসাহ। তোমার জন্যই আমার জীবন। তুমি যদি কখনও অবসন্ন হও, সেই দিনই আমার কর্ম্মময়তার শেষ হইবে। আমি তোমার নয়ন দেখিলে, তোমার কণ্ঠস্বর শুনিলে, তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারি। তবে কেন আমি নারীর মনের ভাব বুঝিতে পারিব না?"

রঙ্গিলা বলিলেন, "তবে কেন প্রভু, রাজপুত্রবধূর কুশলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? রাজ-পুত্রকে না দেখিতে পাইলে, তাঁহার সংবাদটাও না জানিতে পারিলে, কুশল কিসে হইবে?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তবে অপেক্ষা কর, আমি পারি যদি, রাজ-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছি।"

রঙ্গিলা বলিলেন, "ভবানীর অনুকম্পা যেন চিরদিনই তোমার উপর সমান থাকে।"

তখন শম্ভুরাম সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং বনের মধ্যে নানা

স্থান অতিক্রম করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন। তথায় বলেন্দ্র সিংহ একাকী উপবিষ্ট। দূর হইতেই শম্ভুরাম বলিলেন, "রাজ-পুত্র! এ সংসার কেবল পাপেরই নিকেতন।"

রাজপুত্র বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত ডাকাইত শম্ভুরামকে না চিনিয়াছিলাম, তত দিন আমারও ঐরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ সংসার ধর্ম্মের আলয়।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি কখন কখন পদার্থের প্রকৃত বর্ণ দেখিতে পায় না। গত কল্য আপনার স্থবির পিতা পুত্র-প্রদত্ত বিষ পান করিয়া মরিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আমি ঘটনাক্রমে এ সংবাদ পূর্ব্বে জানিতে পারায় এ যাত্রা তিনি রক্ষা পাইয়াছেন।"

বলেন্দ্র সিংহ বলিলেন, "আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "কোন কারণে গত কল্য রাঘব আপনার কনিষ্ঠ, তাঁহার বয়স্য লছমন পাঁড়ে আর কয়েক জন অনুচরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে আমি গিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলাম; মুক্তিলাভের পর তাহারা যখন রাজধানীতে প্রত্যাগত হয়, তখন আমি প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম। পথে তাহারা যে সকল পরামর্শ করিয়াছিল, তাহা আমি শুনিয়াছিলাম।"

বলেন্দ্র বলিলেন, "ভগবানের প্রসাদে আমার পিতা অপমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। আপনার নিকট আমি অনেক রূপেই ঋণী। আপনার প্রতি আমার অসীম ভক্তি। সেই ভক্তি অন্তরের সহিত আপনাকে উপহার দিতেছি।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "ক্ষুদ্র কীটকে ভক্তি করিয়া আপনি সুবোধের

কাজ করিতেছেন না ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এরূপ ঘটনার পরও আপনি কি বলিতে ইচ্ছা করেন যে, এই সংসার ধর্ম্মের আলয় ?”

বলেন্দ্র বলিলেন, “আপনি এখন কি করিবেন স্থির করিয়াছেন ?”

শম্ভুরাম বলিলেন, “মহারাজের মৃত্যুর পর আপনি তক্ত পাইবেন।”

বলেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “সিংহাসনে আমার কি প্রয়োজন ? হয় দেশের মঙ্গলসাধন করিতে প্রাণপাত করিব, না হয় ভগবানের নাম করিতে করিতে জীবন কাটাইব। আপনার নিকট অন্ত্য শেষ বিদায় প্রার্থনা করিবার নিমিত্তই আমি অপেক্ষা করিতেছিলাম।”

শম্ভুরাম বলিলেন, “এ জগৎ প্রেমের রাজ্য। আপনি পরম পুণ্যাত্মা, পুণ্যাত্মা ব্যতীত প্রেমিক হয় না। দেবী ভবানী পুণ্যের পুরস্কারস্বরূপে আপনাকে দেবী সঙ্গিনী দিয়াছেন। সেই প্রেমস্বরূপিণী সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ধর্ম্মসাধনই আপনার খাটিবে না।”

বলেন্দ্র সিংহ বলিলেন, “সে সুখের স্মৃতি আর কেন ? তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আশা ইহজীবনে আর নাই।”

শম্ভুরাম বলিলেন, “আমার সঙ্গে আসুন। এই সুমধুর প্রাতঃকালে এক স্থানে বসিয়া থাকা অনাবশ্যক।”

নির্ব্বাক্ বলেন্দ্র সিংহ অবনতমস্তকে শম্ভুরামের অনুসরণ করিলেন; শম্ভুরাম পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া আবার রঙ্গিলাকে আহ্বান করিলেন ; রঙ্গিলা উড্ডীয়মান প্রজাপতির ন্যায় দুলিতে দুলিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা স্বামীর পার্শ্বে এক অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া সঙ্কোচে দেহের বস্ত্র সুবিন্যস্ত করিতে করিতে অধোমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

শম্ভুরাম বলিলেন, "রাজপুত্র! সম্মুখে এই যে ক্ষুদ্র কুটীর দেখিতেছেন, ঐ স্থানে অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসিয়া আপনার সহিত মিলিতেছি।"

রঙ্গিলা স্বামীর নিকট সরিয়া আসিলেন; রাজপুত্র বিনা বাক্যে যথাস্থানে উপনীত হইলেন; কিন্তু কি দেখিলেন, যাঁহার চিন্তায় তিনি মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহার অদর্শনে জীবনের সকল সুখ-শান্তি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে, যাঁহার সহিত ইহজীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না বলিয়া ক্ষণপূর্ব্বেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, সম্মুখে তৃণাসনে তাঁহার হৃদয়ের সেই আরাধ্যা—প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা অহল্যা আসীনা। উভয়েই উভয়কে দেখিতে পাইলেন। উভয়েই উভয়ের নিকটে ধাবিত হইবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। মধ্যপথে উভয়েই আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইলেন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! সেই বালারুণপ্রদীপ্ত রক্তিমরাগরঞ্জিত নভোমণ্ডলের নিম্নে সেই সুশীতল শ্যামল অরণ্যমধ্যস্থ শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে এই শব্দহীন, চঞ্চলতাবিহীন, নীরব প্রাকৃতিক দৃশ্য-মধ্যে সেই সুশীতল-সমীর-সঞ্চালিত শান্ত-প্রদেশে জ্যোতির্ম্ময় যুবক ও লাবণ্যময়ী যুবতীর অদ্ভুত মিলন! প্রকৃতি হাসিয়া উঠিল। বিশ্বের শোভার ভাণ্ডার মুক্ত হইল। আনন্দ সকলকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিল।

রঙ্গিলা সাশ্রুনয়নে শম্ভুরামের চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দয়াময়! ভবানী যথার্থই তোমাকে নিজ সন্তানরূপে—প্রিয়পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এত দয়া, এত সুবুদ্ধি, এত সদ্‌বিবেচনা, এত সূক্ষ্ম-দর্শিতা আর কাহার সম্ভবে?"

শম্ভুরাম সেই ক্ষুদ্রকায়া, সেই সরল-হৃদয়া, সেই বনবিহারিণী বিহঙ্গিনীকে আদরে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। কঠোরে কোমলে অদ্ভুত সুখের মিলন হইল!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই বিধবা ব্রাহ্মণ-তনয়াকে সঙ্গে লইয়া শম্ভুরাম প্রস্থান করিলে পর বংশীবদন অনেকক্ষণ সেই স্থানে হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিল। তাহার জীবনে এরূপ কাণ্ড আর কখনও ঘটে নাই। তাহার বাসনা ও ব্যবস্থার এরূপ ব্যাঘাত আর কখনও হয় নাই। সকলই যেন স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারের মত বোধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বংশীবদন আপনার অবস্থা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিল। সে বারংবার উচ্চশব্দে ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিল। একজন ভৃত্য কোনরূপ উত্তর না দিয়া ভীতভাবে বংশী-বদনের সম্মুখে আসিল।

বংশীবদন তাহাকে জিজ্ঞাসিল, "তোদের কি হইয়াছে? কাহারও সাড়া পাইতেছি না কেন?"

ভৃত্য উত্তর দিল, "কি হইয়াছে, তাহা আমরা কি বুঝিব? হঠাৎ ঝড়ে যেন সব ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। যে আসিয়াছিল, সেই কি শম্ভুরাম? লোকে বলিতেছে, শম্ভুরাম হইলে অবশ্যই লুঠপাঠ করিত; টাকা কড়ি লইয়া যাইত। তবে কি এ দেবতা?"

বংশীবদন জানিত, শম্ভুরাম একজন দুর্দ্দান্ত দস্যু; এই দস্যুর অনেক কার্য্যকলাপের বিবরণ সে অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছে। যাহা শুনিয়াছে, তাহাতে তাহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, শম্ভুরাম ডাকাইত বটে, কিন্তু সাধারণ ডাকাইতের অপেক্ষা এ ব্যক্তি স্বতন্ত্ররূপ। আজি

ভৃত্যের কথা শুনিয়া তাহার সেই ধারণা বদ্ধমূল হইল। শম্ভুরাম সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক স্থানেই প্রচার আছে। বংশীবদন কত সময় বন্ধুবান্ধবকে লইয়া অথবা অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে বসিয়া শম্ভুরাম-সম্বন্ধে অনেক গল্প করিয়াছে। শ্রুত কথা আরও রূপান্তরিত ও রঞ্জিত করিয়া সকলকে শুনাইয়া সে অনেক বাহবা লইয়াছে। সকল সময়েই সে বলিয়াছে যে, শম্ভুরাম যতই কেন দুর্দ্দান্ত হউক না, তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ কার্য্য করিতে সে ডাকাইতের কখন সাহস হইবে না। আজি তাহার সকল অহঙ্কারের শেষ হইয়াছে। আজি শম্ভুরাম তাহাকে সম্পূর্ণ-রূপে নির্য্যাতন করিয়াছেন। ভৃত্যের কথার উত্তর না দিয়া বংশীবদন জিজ্ঞাসিল, "যে আসিয়াছিল, তোরা তাকে দেখিয়াছিস্ না কি ?"

ভৃত্য বলিল, "দেখিয়াছি। ডাকাইত বলিয়া বুঝি নাই; মানুষ বলিয়াও মনে হয় নাই।"

বংশীবদন জিজ্ঞাসিল, "আগে যদি দেখিয়াছিস্, তবে কথা কহিস্ নাই কেন? কোন গোল করিস্ নাই কেন ?"

ভৃত্য বলিল, "সাধ্য কি ? তাহার সম্মুখে কথা কহিতে কাহারও ভরসা হইতে পারে না। আপনিও তো একটুও গোল করিতে পারেন নাই। সে সম্মুখে আসিয়া যাহাকে যে ভাবে থাকিতে বলিয়াছে, তাহাকে সেই ভাবেই থাকিতে হইয়াছে। দুই জন পাইক একটু কাঁদানি করিতে গিয়াছিল, তাহাদের ঠ্যাঙ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বাকী সকলের হাত-পা বাঁধিয়া রাখিয়াছে।"

বংশীবদন বলিল, "ছি! তোদের এত ভয় ? একটা মানুষ বই তো নয় ? ঠিক করিয়া এক ঘা লাঠি মারিতে পারিলেই লোকটা মাটীতে

পড়িয়া যাইত। তোরা কেবল ভাত খাইতে জ.আজি কোন ক্ষমতা রাখিস্ না।" রিল

ভৃত্য মনে মনে বুঝিল, আমাদের কোন ক্ষমতা নাই সত্য; কিন্তু তোমার সম্মুখে বৈঠকখানায় সে একা আসিয়াছিল, তুমিও তো একটা কথা কহিতে ভরসা কর নাই? কিন্তু সে কথা না বলিয়া ভৃত্য বলিল, "তাহা তো পারি নাই, এখন লোকগুলার কি গতি হইবে? ইহারা কি বাঁধাই থাকিবে? যে দুইটা লোক পড়িয়া আছে, তাহারা মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে, দেখিতে হইবে না কি?"

বংশীবদন বলিল, "সকলেরই মরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। এরূপ অকর্ম্মণ্য লোকেরা বাঁচিয়া থাকে কেন? একটা মানুষকে এক ঘা লাঠি মারিতেও যাহাদের ভরসা হইল না, তাহারা তো মরিয়াই আছে, তাহাদের কোন সন্ধান না করাই উচিত। তুই যা, পারিস্ যদি, তাহাদের খোলসা করিয়া দে। আর যাহারা পড়িয়া আছে, তাহাদেরও মুখে জল দিয়া ঠাণ্ডা কর্।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল। তখন বংশীবদন ভাবিল, বড়ই লজ্জার ক‍ং হইয়াছে। একটা মানুষকে দেখিয়াই এরূপ ভয় পাওয়া আর বিনা আপত্তিতে তাহার কথা ঘাড় পাতিয়া লওয়া অতিশয় ঘৃণার কথা হইয়াছে। হউক সে বীর, হউক সে সাহসী, মানুষ তো বটে? আমরা দশ জন মিলিয়া অবশ্যই তাহাকে জব্দ করিতে পারিতাম। কাজটা অতিশয় নিন্দনীয় হইয়াছে। বাটীর স্ত্রীলোকেরা এ কথা শুনিয়াছে। আমার যত বীরত্ব আর গৌরব ছিল, সকলই আজ ভাঙ্গিয়াছে। স্ত্রীলোকদের কাছে লজ্জা পাইতে হইবে—ছি! ছি!

তাহার ক শুনিয়া দন আরও নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার কনিষ্ঠ পথা ন্দাকিনী পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছিল; আন্তরিক বিনয়ের সহিত ব্র ন্যার ধর্ম্মরক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। তাহাকে অপমান করিয়াছি, তাহার অনুরোধে বিরক্ত হইয়া আপনার ইচ্ছা মত কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। তাহার এই সাহসের জন্য আমি তাহাকে পদাঘাত করিয়াছি। কিন্তু এখন ভগবান্ তাহার কথাই শুনিলেন। ব্রাহ্মণকন্যার ধর্ম্ম বজায় থাকিল, আমি ঘোর অপমানিত হইলাম। এ মুখ দেখাইব কিরূপে?

বংশীবদন আবার ভাবিতে লাগিল, মন্দাকিনী যদি আমাকে প্রথমে বাধা না দিত, তাহা হইলে এরূপ বিপদ্ কখনও ঘটিত না। জীবনে কোন কার্য্যে আমাকে হতাশ হইতে হয় নাই; কখনও কেহ কোন বিষয়ে আমাকে বাধা দিতেও সাহস করে নাই। হতভাগিনী মন্দাকিনী মাথার উপর টিক-টিক করাতেই আজ এই অপমান, এই মনস্তাপ ভোগ করিতে হইয়াছে। তাহাকে এজন্য বিলক্ষণ শাস্তি দিব। পুরুষের কাজের উপর যে মেয়েমানুষ কথা কহিতে সাহস করে, যে স্ত্রীলোক সাহসাকে হিতকথা শিখাইতে আসে, তাহাকে রীতিমত দণ্ড দেওয়াই উচিত।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। লোকজনেরা বন্ধনমুক্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে নীরবে বসিয়া আছে। বংশীবদন সেইরূপ সময়ে বৈঠকখানা ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। আজি যে কাণ্ড হইয়াছে, তাহার পর সে যে অন্তঃপুরের দিকে আসিবে, এরূপ কেহই মনে করে নাই। সুতরাং সকলেই একটু অসাবধান ছিল। অন্য দিন বংশীবদন অন্তঃপুরে যাইবার সময় একটা আলো সঙ্গে লইত, লোকজনকে ডাকি

ডাকি করিত; সুতরাং একটা গোল পড়িয়া যাইত। আজি মনের অবস্থা নিতান্ত অবসন্ন থাকায় সে নিঃশব্দে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈঠকখানা হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইলে ভুইটা মহল পার হইতে হয়। অন্তঃপুর-মহলে প্রবেশ কারবার সময়ে বংশীবদন দেখিতে পাইল, একটা পুরুষ অতি সন্তর্পণে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে আসিতেছে। অন্ধকারে মানুষ চেনা গেল না, কিন্তু লোকটাকে চোর বলিয়াও বংশীবদনের মনে হইল না। তখন বংশীবদন 'কে কে' বলিয়া চীৎকার করিল, লোকটা বেগে মাঝের মহলে আসিয়া পড়িল। বংশীবদন চীৎকার করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিল। বাটীতে খুব গোলমাল উঠিল। বাহির হইতে নারীরা "চোর চোর" বলিয়া গোল করিতে লাগিল। বংশীবদন অনুসরণ করিয়াও লোকটাকে ধরিতে পারিল না, সে যেন অন্ধকারে মিশিয়া গেল। বাহিরের লোকে আলো লইয়া ভিতরে আসিল এবং ভিতর হইতেও নারীরা অনেকে আলো ধরিল। কিন্তু সবিস্ময়ে বংশীবদন দেখিল, তাহার দ্বিতীয়া ভগ্নী সুভদ্রা আর একদিক্ দিয়া সম্মুখে আসিল,—জিজ্ঞাসিল, "কি হইয়াছে দাদা? এত গোল কিসের?"

বংশীবদন বলিল, "তুই এ দিক্ হইতে আসিলি কিরূপে?"

সুভদ্রা বলিল, "গোল শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিতে আমি পাশের দিকে গিয়া পড়িয়াছিলাম। কি হইয়াছে, বল দেখি?"

ভগ্নীর এইরূপ তাড়াতাড়ি প্রযুক্ত পথ হারাইয়া যাওয়ার কথা বংশীবদনের ভাল বোধ হইল না। এরূপ অন্ধকারে অসাবধানভাবে যাওয়া আসা করা বড়ই অন্যায় বলিয়া তাহার মনে হইল। কিন্তু এখন সেজন্য কোন

শাসন করার সময় নয়। বলিল, "কি হইয়াছে, শুনিতে পাইতেছিস্ না? এত লোক চারিদিক্ হইতে চোর চোর বলিয়া গোল করিতেছে, আর তুই যেন কিছুই জানিস্ না বলিতেছিস্? গোল শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিতেছিলি, যদি কিছুই জানিস না, তবে গোল শুনিলি কিসের?"

সুভদ্রা বলিল, "শুনিয়াছি সব, জানিও অনেক; কিন্তু এখন কিছু বলিব না। তুমি ভিতরে আসিতেছ, চলিয়া আইস। এখানে দাঁড়াইবার দরকার নাই।"

বংশীবদনের মনে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। কি ভয়ানক কথা। সুভদ্রা অনেক জানে। বলিল, "সকল কথাই তোর বলিতে হইবে। আর একদিন অপেক্ষা আমি করিব না।"

সুভদ্রা বলিল, "তুমি এখন ভিতরে আইস।"

তখন সুভদ্রার সঙ্গে বংশীবদন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং কোন পত্নীর কক্ষে প্রবেশ না করিয়া সুভদ্রার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সুভদ্রা নিজ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমাকে কোন কথাই বলিতে হইবে না। তুমি এইরূপে অন্ধকারে কোন গোল না করিয়া যদি বাটীর মধ্যে যাওয়া আসা কর, তাহা হইলেই আপনি সকল কথা জানিতে পারিবে। ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই, একদিনে না হয়, দুই দিনে সকলই তুমি বুঝিতে পারিবে।"

বংশীবদন তাহার পরও অনেকক্ষণ সকল কথা জানিবার জন্য ভগ্নীকে পীড়াপীড়ি করিল; কিন্তু সুভদ্রা কোনরূপে সে দিন আর কোন কথা বলিল না। যতটুকু সে বলিয়াছে, তাহাতেই আগুন জ্বলিয়াছে। আজি একেবারে লঙ্কাদাহের ব্যবস্থা করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

তথন বংশীবদন উৎকণ্ঠিত-চিত্তে মন্দাকিনীর কক্ষে প্রবেশ করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে মন্দাকিনী ঘুমাইয়াছে। শয্যার উপর সেই প্রফুল্ল সুকুমারকায়া সরলা নিদ্রার শাস্তি লাভ করিয়াছে। দুশ্চিন্তা ও অন্তরের যাতনা অভাগিনীকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়াছে। বংশীবদন গৃহস্থিত ক্ষীণালোকোদ্ভাসিত পত্নীর কলেবর কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিল; কিন্তু তাহার হৃদয়ে এই লাবণ্যময়ীর পবিত্রতাপূর্ণ অসাবধানতাজনিত আবেশময় শরীর দর্শনে কোনই অশ্রুপাত হইল না। এ নারী তো তাহার চরণের ক্রীতা দাসী। পদাঘাত করিলে কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। সুতরাং ইহার জন্য মত্ততা অনাবশ্যক। যে সকল নূতন নূতন নারী সময়ে সময়ে তাহার বৈঠকখানা আলোকিত করে, তাহাদের জন্য পাগল হওয়াই উচিত। এইরূপ পাগল সে চিরদিনই হইয়া আসিতেছে। পরের জন্য সে পাগ্‌লামীও দুই একদিনের বেশী থাকে না; আবার কাহার জন্য পাগল হইতে হইবে, এই ভাবনাই সে নিরন্তর ভাবিয়া থাকে।

নিদ্রাগত পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া সে উচ্চস্বরে বলিল, "ঘুমাইতেছিস্ যে! আমি আবার আসিতে পারি, এ কথা মনে রাখিয়া বসিয়া থাকিতে পারিস্ নাই?"

নিদ্রায় অভিভূতা সুন্দরী স্বামীর এই প্রেম-সম্ভাষণ শুনিতে পাইলেন না; সুতরাং উঠিয়া বসিলেন না বা কোন উত্তরও দিলেন না। তথন বংশীবদন সেই যুবতীর একখানি বাহু ধরিয়া অতি নির্দ্দয়ভাবে আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "ঘুম?—মিথ্যা কথা; সমস্তই নষ্টামী। সন্ধ্যার পর একবার লাঠি খাইয়াছিস্, তবু তোর লজ্জা নাই? ভাবিয়াছিলাম,

এবার আর তোকে মারিতে হইবে না; কিন্তু লাথির কাঁঠাল কিলে পাকিবার নহে।"

মন্দাকিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কথার শেষাংশ সুস্পষ্টরূপে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে ব্যস্ততা সহ উঠিয়া বসিল;—বলিল, "তুমি আসিয়াছ? কতক্ষণ আসিয়াছ? নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণকন্যা ধর্ম্ম হারায় নাই।"

বংশীবদন কর্কশস্বরে বলিল, "আমার জীবনে যাহা হয় নাই, আজি তোর জন্যই তাহা অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। তুই আজি আমাকে বাধা দেওয়ায় মাথার উপর টিকটিক করায় আমাকে অপমানিত হইতে হইয়াছে; আর আমার হাতের জিনিস পলাইয়াছে। আমি দেখিতেছি, তুই কাল নাগিনীরূপে আমার সংসারে প্রবেশ করিয়াছিস্।"

মন্দাকিনী বলিল, "আমি কি করিয়াছি? তুমি তো কত দিনই এই রকমের কাজ করিয়া আসিতেছ। কত লোকই তো তোমাকে বাধা দেয়, টিকটিক করে, কিন্তু কোন দিনই তো তোমাকে অপমানিত হইতে হয় নাই। আজি কেন এরূপ হইল?"

বংশীবদন বলিল, "তোর জিহ্বায় বিষ আছে। কাহারও কথায় যাহা হয় নাই, তোর কথায় আজ তাহা হইয়াছে। আমি তোর সর্ব্বনাশ করিয়া তবে ছাড়িব।"

মন্দাকিনী বলিল, "কর যাহা ইচ্ছা,—আমার উপর যত ইচ্ছা অত্যাচার কর, আমি হাসিতে হাসিতে তাহা সহ্য করিব। কিন্তু তোমার চরণে ধরিয়া আবার প্রার্থনা করিতেছি, পরস্ত্রীর প্রতি আর তুমি লোভ করিও না।"

বংশীবদন বড়ই বিরক্ত হইল;—বলিল, "আমার এই উপদেশ

তুই দাসী হইতে আসিয়াছিস্, দাসীর মত থাকিবি। গুরু-ঠাকরুণের মত উপদেশ দেওয়াতে আজি সন্ধ্যার পরেই লাথি খাইয়াছিস্,এবার ঝাঁটা মারিতে মারিতে তাড়াইয়া না দিলে বোধ হয় তোর চৈতন্য হইবে না।"

মন্দাকিনী বলিল, "আমি দাসীর দাসী। উপদেশ দেওয়া দূরে থাকুক, তোমার মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেও আমার সাহসে কুলায় না। প্রভুর হিতচেষ্টাই দাসীর কাজ; সেই জন্যই আমি সাহস করিয়া আজি একটা কথা বলিয়াছি; আমার অপরাধ যথেষ্ট হইয়াছে। তুমি ঝাঁটা মার, লাথি মার, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু আমি বলিতেছি, পরস্ত্রীর সম্বন্ধে তুমি সাবধান থাকিও।"

বংশীবদন বলিল, "তোর কথায় না কি?"

মন্দাকিনী বলিয়া ফেলিল, "আমার কথায় কেন? শম্ভুরামের কথায়। শম্ভুরাম তোমার দৌলত লুঠিতে আসেন নাই, তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে আসেন নাই, তোমাকে এই কুকাজ হইতে নিবারণ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কথা রক্ষা না করিলে বিপদে পড়িতে হইবে।"

বংশীবদন বলিল, "বুঝিয়াছি, শম্ভুরামের ভরসায় তোর সাহস বাড়িয়া গিয়াছে। শম্ভুরাম আমাকে অপমান করায় তোর আনন্দ হইয়াছে। আজি আমি তোর মাথায় লাথি মারিতেছি, আবার এই পায়ের এই লাথি শম্ভুরামের বুকেও একদিন মারিব।"

সত্য সত্যই পাষণ্ড সেই পতিহিতপরায়ণা সাধ্বীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া গৃহ ত্যাগ করিল। যখনই মন্দাকিনীর গৃহে বংশীবদন প্রবেশ করিত, তখনই তাহার আর দুই পত্নী এবং ভগ্নীরা দ্বারপার্শ্বে উৎকর্ণ

হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত; আজিও সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। বংশীবদন বাহিরে আসিবামাত্র সুভদ্রা বলিয়া উঠিল, "ছোট বউয়ের কি আক্কেল গা! যে দাদার সম্মুখে যম আসিয়া কথা কহিতেও ভয় পায়, তাহাকে কি না উপদেশ দেয়, তাহার কাজে কি না টিকটিক করে?"

দ্বিতীয়া পত্নী বলিল, "বড় রূপসী হইলেই বড় অহঙ্কারী হয়। এখন নূতন যৌবনে নূতন ভরসা অনেক। আইস কর্ত্তা, যদি অন্তঃপুরেই থাকিতে হয়, তবে ঠাকুরঝির ঘরে না গিয়া দাসীর ঘরে থাকিলে ক্ষতি কি?"

বংশীবদন বলিল, "আজি আমার মেজাজ খারাপ; তামাসা ভাল লাগিতেছে না। তোমার ঘরেই যাইতেছি, চল।"

তখন বংশীবদন দ্বিতীয়া পত্নীর সহিত অন্য এক কক্ষে প্রবেশ করিল; সুভদ্রা আপন কক্ষে না গিয়া মন্দাকিনীর নিকটে উপস্থিত হইল। তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, তাহার অন্তরের বেদনা দূর করিতে সুভদ্রা সেখানে গেল না; তাহার দুর্দ্দশায় আনন্দ অনুভব করিতে, তাহার মুখে ক্লেশের কথা শুনিয়া অন্তরকে তৃপ্ত করিতে হিতৈষিনী সুভদ্রা উপস্থিত হইল।

মন্দাকিনী নিরপরাধিনী; স্বামীর প্রেম লাভ করিতে সে স্পর্দ্ধা করে না, স্বামীর চরণসেবা করিতে পাওয়ায় যে অপার্থিব সুখ, তাহাতেও তাহার অধিকার নাই। অন্যান্য পত্নীরা যেরূপভাবে স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করে, সেরূপে কথা কহিতেও দুঃখিনীর সাহস নাই। কাহারও অনিষ্টচিন্তা করিতে সে জানে না, ক্ষুদ্র দাস হইতে কর্ত্তা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই মঙ্গলচিন্তা সে নিয়ত করে, একটী অপ্রিয় শব্দ ভ্রমেও তাহার মুখে

হইতে বাহির হয় না। তথাপি সে সকলের বিষ-নয়নে কেন পড়িয়াছে? কেন এই বৃহৎ সংসারে তাহার প্রতি স্নেহপ্রকাশ করিবার লোক কেহই নাই? তাহার দোষ অনেক। প্রথম দোষ, সে পরমা সুন্দরী, বংশীবদনের গৃহে এরূপ সুন্দরী আর কেহ নাই। সপত্নীরা এবং ননদিনীরা এই সৌন্দর্য্যের তাপ সহিতে অক্ষম। তাহার দ্বিতীয় দোষ, সে কলহ করিতে জানে না। বিষম কোন্দল ব্যতীত সে সংসারে একদিনও তিষ্ঠিবার উপায় নাই, ইহা মন্দাকিনী বুঝিল না। গালি খাইয়াও সে নিরুত্তর থাকে, অপমানের বোঝা সে হাসিতে হাসিতে ঘাড় পাতিয়া লয়। তাহার তৃতীয় দোষ, সে বড় ধর্ম্মশীলা; শম্ভুরাম বলিয়া গিয়াছিলেন, বংশীবদনের সংসার পাপপ্রবাহে নিমগ্ন; কিন্তু সেই পাপের সহিত মন্দাকিনী যোগ না দেওয়ায় সকলেই তাহাকে সন্দেহের সহিত সভয়ে দর্শন করে। তাহার চতুর্থ দোষ, সে পতিকে অন্তরের সহিত ভক্তি করে। এ দুষ্কর্ম্ম বংশীবদনের সংসারে পূর্ব্বে কখন ছিল না। তাহার পঞ্চম দোষ, সে স্বামীর ভাল-মন্দের সংবাদ রাখে। তাহার ষষ্ঠ দোষ, সে সকলকেই যত্ন করে; সকলের ক্লেশে আপনাকে ক্লিষ্টা বলিয়া মনে করে। যে এত অপরাধে অপরাধিনী, সে এই পুণ্যের সংসারে সুখ শান্তি পাইবে কেন?

সরলে মন্দাকিনি! তোমার বিরুদ্ধে কিরূপ ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহার কোন সংবাদ তুমি জান না; কিরূপ আয়োজনে তোমার নিমিত্ত দধীচির অস্থি সংগৃহীত হইতেছে, কিরূপে তোমার ঐ নিষ্পাপ মস্তক চূর্ণ করিবার নিমিত্ত বজ্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহাও তুমি জান না।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মন্দাকিনীর মস্তকে অসংখ্য অপরাধের গুরু-ভারের উপর আর এক ভয়ানক ভার চাপিল। মেজো-বউ সে দিন বংশীবদনের সহিত বড়ই ঘনিষ্ঠতা করিল। এত আত্মীয়তা, এত ভালবাসা বংশীবদন আর কখন পায় নাই। বড় লয়-তুরস্ত করিয়া মিঠা-স্বরে মেজো-বউ স্বামীকে মাতাইয়া দিল; স্বামীর যাহা প্রিয় কার্য্য, তাহা অতিশয় অন্যায় হইলেও মেজো-বউ অতি সৎকার্য্য বলিয়া বুঝিল এবং স্বামীর রূপ-গুণ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই অমানুষিক বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। প্রাণে যাহাতে লাগে, এইরূপ হিসাবে সে বাছিয়া বাছিয়া কথা কহিল; বংশীবদন ভিজিয়া গেল; সে এই মেজো-বউকে এত দিন চিনিতে পারে নাই বলিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইল। প্রেম-বিরহিত বংশীবদন আজি একটু শান্তি পাইল।

মেজো-বউ বুঝাইয়া দিল যে, এত কাল পরে হঠাৎ যে শম্ভুরাম আসিয়া পড়িল, ইহার অবশ্যই কোন গুরুতর কারণ আছে। ছোট-বউ মন্দাকিনীর বাপের বাড়ীর দেশে শম্ভুরামের আড্ডা। কোথায় শম্ভুরাম থাকে, তাহা কেহই ঠিক জানে না; কিন্তু পঞ্চকোট অঞ্চল হইতে সে যে যাওয়া আসা করে, তাহা অনেকের মুখে শুনা যায়। সেই অঞ্চলেই তো ছোট-বউয়ের বাপের বাড়ী। অতএব কোন উপায়ে ছোট-বউয়ের যোগাযোগে শম্ভুরাম এখানে আসিয়াছিল, এরূপ কথা অবশ্য মনে হইতে পারে।

অনেক ভাবিয়া বংশীবদন এ কথা সম্ভব বলিয়া মনে করিল। তখন সে মন্দাকিনীকে পরম শত্রু বুঝিয়া তখনই তাহার প্রাণ বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিল।

এই সময়ে মেজো-বউ বড় বাহাদুরী দেখাইল; সে স্বামীকে বুঝাইল যে, একটা আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া হঠাৎ একটা নারী-হত্যা করা অনাবশ্যক। দুই দিন সাবধান হইয়া লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, মন্দাকিনীর দৌড় কত দূর! যদি সত্য সত্যই সে পরম শত্রুকে ডাকিয়া আনিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অবশ্যই দূর করিতে হইবে। বরং সাপের সহিত গৃহে বাস করিতে পারা যায়, কিন্তু যে স্ত্রী হইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে কার্য্য করে, তাহার সহিত এক দিনও একত্র থাকা যাইতে পারে না। অতএব আর দুই দিন বুঝিয়া, ভাল করিয়া দেখিয়া যাহা উচিত, তাহাই করিতে হইবে।

কেন মেজো-বউ এরূপ বুঝাইল? যাহাকে সে দেখিতে পারে না, যাহাকে সে শত্রু বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিপাত করিতে এমন সহজ উপায় হইয়াছিল, তথাপি মেজো-বউ কাল-বিলম্ব ঘটাইল কেন? মেজো-বউ কোন সদভিপ্রায়ে এ কাজ করে নাই। সে বুঝিয়াছিল, সুভদ্রা যে মন্ত্রণা করিয়াছে, তাহাতে মন্দাকিনীর নিস্তার আর কোনমতেই নাই। যখন অপরের চেষ্টায় এই কণ্টক দূর হইবে, তখন মেজো-বউ দুই দিন অপেক্ষা করিবার পরামর্শ দিয়া একটু ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে পারে। তাহা নহিলে সে সহজ সুযোগ ছাড়িবে কেন?

দিন নানা কার্য্যে কাটিয়া গেল। স্নান, আহার-নিদ্রা, দুশ্চিন্তা এই চারি কার্য্য ভিন্ন বংশীবদন আর কিছুই করিল না। শম্ভুরামের বিষয়

কেবল নিদ্রাকাল ব্যতীত অন্য সমস্ত সময়ই তাহার মনে পড়িতে থাকিল। ক্রমে নিরন্তর চিন্তায় নানা আলোচনায় হৃদয়ে শম্ভুরামের ভয়ের পরিমাণ অনেক কমিয়া আসিল। সন্ধ্যার সময় বংশীবদন স্থির করিল, অমাবস্যার দিন দুবরাজপুরের পাহাড়ে টাকা লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করার কথা আছে। যদি না যাই? যদি টাকা না পাঠাই?

স্বকৃত প্রশ্নের উত্তর শম্ভুরামের মন আপনিই দিল,—"তাহা হইলে শম্ভুরাম নিশ্চয়ই বাড়ীতে আসিয়া পড়িবে, নিশ্চয়ই সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইবে, নিশ্চয়ই অনেক অত্যাচার করিবে।"

অনেকক্ষণ বংশীবদন চিন্তা করিল; তাহার পর মনে করিল, ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? সে রাজা নহে, সে বিচারক নহে, সে জরিমানা করিলে আমি দিব কেন? তাহার হুকুম আমি মানিব কেন?

বংশীবদন ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল, অনেক বলবান্ রক্ষক নিযুক্ত করিব, অনেক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিব, সর্ব্বদা সাবধান থাকিব, তাহা হইলে সে আসিলে হটাইয়া দিতে পারিব, তাহাকে ধরিয়া ফেলিতে পারিব, তাহাকে প্রাণে মারিতে পারিব।

এ মীমাংসা মনে মনে করিয়াও বংশীবদন নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাহার মনে হইল, শম্ভুরাম বড়ই দুর্দ্দান্ত, কেহই তাহাকে আঁটিতে পারে না। তাহার দেহের বল অসুরের অপেক্ষাও বেশী; সঙ্গে অনেক লোকও ফিরে, সে লোকেরাও এক একটা দৈত্যবিশেষ। এ অবস্থায় তাদৃশ ডাকাইতকে পরাস্ত করিবার আয়োজন বিফল হইতে পারে। তাহা হইলে সর্ব্বনাশের একশেষ হইবে; তাহা হইলে হয় তো ঘরে আগুন দিয়া মেয়ে পুরুষ সকলকে কাটিয়া সে এখানকার ভিটার চিহ্নও উঠাইয়া দিবে।

বংশীবদন এ বিপদুদ্ধারের কোন সহজ পথ দেখিতে পাইল না। সে তখন মনে করিল, এখনও অমাবস্যার অনেক বাকী। যেরূপে হউক, একটা উপায় করিতেই হইবে। টাকা কোন মতেই দেওয়া হইবে না।

সন্ধ্যার পরই বংশীবদন বাটীর ভিতর সংবাদ পাঠাইয়া দিল, সে আজি রাত্রিতে আহার করিতে অন্তঃপুরে যাইবে না, বাহিরেই সে থাকিবে। ক্রমে নানা চিন্তায় রাত্রি কাটিতে থাকিল; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বংশীবদন পূর্ব্ব-রাত্রির ন্যায় নিঃশব্দে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যে দিক্ দিয়া বাহির হইতে সতত ভিতর-মহলে যাওয়া যায়, সে দিক্ দিয়া বংশীবদন গেল না। অন্তঃপুরের নিকটস্থ হইয়া সে পাকশালার পশ্চাৎ দিয়া চলিতে লাগিল। সে দিক্ দিয়া কোন মনুষ্য হঠাৎ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করে না। কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইয়া বংশীবদন দেখিতে পাইল, দুইটী নারী রান্নাঘরের পাশে দাঁড়াইয়া অস্ফুটস্বরে কি কথা কহিতেছে। একটা কথা বংশীবদনের কর্ণে প্রবেশ করিল;—শুনিতে পাইল, একজন বলিতেছে, "দেখিও ঠাকুরঝি! যেন রামচন্দ্র কাটা না পড়ে!"

বংশীবদন সহজেই বুঝিতে পারিল যে, নারীদ্বয়ের একজন মেজো-বউ, অপরা সুভদ্রা। কথা কতদূর গড়ায়, তাহা শুনিবার জন্য বংশীবদন সেই স্থানে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইল; তাহাকে কেহ দেখিতে পাইল না, কিন্তু সে নারীদ্বয়কে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে থাকিল।

সুভদ্রা উত্তর দিল, "তোমার রসের নাগর রামচন্দ্রের গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগিবে না। যে কাটা যাইবার, সেই কাটা পড়িবে। সতীত্বের কুঁড়ি মন্দাকিনীর রক্তে ঢেউ খেলিবে।"

বংশীবদনের মনে বড়ই সন্দেহ হইল। গত কল্য রাত্রিতে পলাতক পুরুষকে বাটীর মধ্যে দেখিয়া, তাহার পর সুভদ্রার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বংশীবদন আশঙ্কা করিয়াছিল যে, মন্দাকিনী অবিশ্বাসিনী। চোর বলিয়া যাহাকে সন্দেহ করা হইয়াছিল, সে মন-চোর। আজি বুঝিল, সেই মনচোরকে লইয়া এই রাত্রিতে তাহার ভগ্নী ও মধ্যমা স্ত্রী একটা ষড়্যন্ত্র ঘটাইতেছে। বংশীবদন নীরবে নিস্পন্দভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

মেজো-বউ বলিল, "অনেকক্ষণ রামচন্দ্রকে কষ্ট দেওয়া হইতেছে, সে ছোট-বউয়ের দুয়ারে প্রায় তিন দণ্ড দাঁড়াইয়া আছে—বড় কষ্ট পাইতেছে। তোমার দাদা আজি বাটীর মধ্যে আসিবে না, অকারণ রামচন্দ্রকে কষ্ট দিয়া আর কাজ নাই।"

সুভদ্রা বলিল, "প্রাণের টান এত বেশী হওয়াটা ভাল নয়। একদিন খানিকটা সময় না হয় প্রাণের বঁধু রামচন্দ্র একটু কষ্ট পাইল, তাহাতে তাহার গা পচিয়া যাইবে না। দাদা নিশ্চয়ই আসিবে, আমি কা'ল তাহাকে যেরূপ বলিয়া দিয়াছি, সে কথা দাদা কখন ভুলে নাই। সে আসিবে না, খাইবে না, সংবাদ পাঠাইয়াছে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তাহাকে আসিতেই হইবে।"

মেজো-বউ বলিল, "আমি তাহাকে কালি রাত্রিতে অনেক প্রেমের কথা বলিয়াছি; অনেক রকমে তাহাকে ভিজাইয়াছি। সে আমাকে অনেক মনের কথা বলিয়াছে। মন্দাকিনীকে আজিই সে নিকাশ করিত; কিন্তু আমি থামাইয়া রাখিয়াছি।"

সুভদ্রা বলিল, "বেশ করিয়াছ। হাতে-কলমে ধরা পড়িয়া নিকাশ হইলেই ভাল হয়। রামচন্দ্র তোমারও যেমন ভালবাসার জিনিস,

আমারও তেমনই প্রাণের বঁধু। আমরা দুই জনে তাহাকে লইয়া সুখে কাল কাটাইতেছি। তাহার কোন বিপদের আশঙ্কা বুঝিলে আমি কথনই এরূপ ব্যবস্থা করিতাম না। সে বড় চালাক, বড় রসিক, তাহার জন্য ভয় করিও না।”

মেজো-বউ বলিল, “সে কালি কিন্তু প্রায় ধরা পড়িয়াছিল, ভাগ্যে তুমি সঙ্গে ছিলে, তাই তো কৌশলে সে বাঁচিল।”

সুভদ্রা বলিল, “সেই কৌশলে আজিও বাঁচিবে। এত দিন আমরা একজনের পর আর একজন—কথনও বা একসঙ্গে দুই জনকে লইয়া কাল কাটাইয়া আসিতেছি; কেহই কখন কোন কথাই জানিতে পারে নাই। এত নাগর যাইতেছে, আসিতেছে, কাহার কথন বিপদ্ হয় নাই, এখনই বা হইবে কেন?”

বংশীবদন স্ত্রী ও ভগ্নীর এই সকল কথা শুনিয়া মনে করিল, “এখনই দুই জনকে কাটিয়া ফেলা আবশ্যক। বুঝিতেছি, কালিকার চোর ইহাদেরই নাগর। এইরূপ লীলা ইহারা প্রতিদিনই আমার অন্তঃপুরে করিয়া থাকে।” একবার বংশীবদন বিচলিত হইল; কিন্তু আবার ভাবিল, এখন থাকুক, ইহাদের দুই জনকে বধ করা বড় বেশী কথা নয়, যে কোন সময়েই তাহা করিতে পারিব। দেখিতে হইবে, ইহারা কত দূর পাপের অনুষ্ঠান করে।

তখন বংশীবদন যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে আবার ফিরিল এবং যে পথ সতত ব্যবহৃত হয়, সেই পথ দিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

বংশীবদন সম্মুখস্থ হইলে মেজো-বউ ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত

ধরিল। বংশীবদন যেন কোন কথাই জানে না, এইরূপ ভাবে জিজ্ঞাসিল, "তুমি এখানে যে?"

মেজো-বউ উত্তর দিল, "বড় আশা করিয়াছিলাম, আজি সন্ধ্যার সময়ই তোমার দেখা পাইব। আসিবে না সংবাদ দিয়াছ, তথাপি আশা ছাড়িতে পারি নাই; তাই এখানে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি।"

সুভদ্রা লুকাইয়া থাকিল; সে আর বাহিরে আসিল না। অন্য এক পথ দিয়া সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং মন্দাকিনীর ঘরের পার্শ্বে গিয়া লুকাইয়া থাকিল। বংশীবদন ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল; একটু অগ্রসর হওয়ার পর বংশীবদন দেখিল, মন্দাকিনীর দ্বারদেশ হইতে একটা লোক বেগে অন্যদিকে পলায়ন করিল। অস্পষ্ট আলোকে লোক-টাকে বংশীবদন চিনিতে পারিল না; চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "কে ও?—কে যাও?"

মেজো-বউ তাড়াতাড়ি তাহার হাত চাপিয়া ধরিল;—বলিল, "ও কিছু নয়—তোমার দেখিবার দরকার নাই।"

বংশীবদন বলিল, "দেখিবার দরকার নাই? আমার অন্দরে এই রাত্রিকালে একজন অপরিচিত পুরুষ ছোট-বউয়ের দুয়ার হইতে চলিয়া গেল, আর আমি তাহা 'কিছু নয়' বলিয়া কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারিব না।"

স্ত্রীর হস্ত হইতে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইয়া বংশীবদন ছুটিয়া চলিল, মেজো-বউও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। যে যে পথ দিয়া যাইতে হইবে, বংশীবদনের তাহা অভ্যস্ত ছিল; সুতরাং সে দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু অনেক দূর গিয়াও সে কাহাকে দেখিতে পাইল না। তখন সে বলিল,

"বুঝিতেছি, বাটীতে চোর আসিতেছে। কালি সময়মত আমি আসিয়া পড়ায় কিছু লইতে পারে নাই। আজিও আমারই জন্য সে কিছুই করিতে পারে নাই।"

মেজো-বউ বলিল,"চোর বলিয়া ঠিক মনে হয় না। যে ঘরে সংসারের জিনিসপত্র থাকে, সে দিকে না গিয়া চোর ছোট-বউয়ের ঘরের কাছ হইতে ছুটিয়া গেল কেন?"

বংশীবদন বলিল, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী। আমি বুঝিয়াছি, তুমি আমাকে বড়ই ভালবাস। বল দেখি মেজো-বউ! এই কাণ্ড দেখিয়া কি মনে হয়?"

মেজো-বউ বলিল, "আমি স্ত্রীলোক; কেমন করিয়া বলিব?"

বংশীবদন পুনরায় বলিল, "তুমি নিশ্চয় কিছু জান; তুমি বলিতেছিলে, 'ও কিছু নয়', আমার উহা জানিবার দরকার নাই, তাহাতেই বুঝিতেছি, তুমি এ ব্যাপার সম্বন্ধে একটা কিছু সংবাদ জানই জান।"

মেজো-বউ আবার বলিল, "কি জানিব? ছোট-বউ ছেলেমানুষ; বড় নির্ব্বোধ; তুমি যদি তাহার উপর রাগ কর, এই ভয়ে কোন কথা বলিতে পারি না। তাহাকে আমি মায়ের পেটের বহিনের মত ভালবাসি। চোর বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু আরও দুই একদিন ছোট-বউয়ের ঘর হইতে এইরূপ পলাইয়াছে। তাহার গহনাপত্রের লোভে চোর যাওয়া আসা করিতে পারে।"

বংশীবদন বলিল, "সে কি কথা! গহনা-পত্রের লোভে চোর প্রতিদিনই আসিবে কেন? বুঝিতেছি, কথা অতি ভয়ানক। মেজো-বউ! তুমি বড় সতীসাধ্বী; বিশেষ পাপিষ্ঠা মন্দাকিনীকে বড়ই ভালবাস;

কাজেই সকল কথা তুমি বলিতে পারিতেছ না। কিন্তু আর বলিবার কাজ নাই। যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যে কথা তোমার মুখে শুনিয়াছি, তাহার পর আর কিছু জানিবার আবশ্যক নাই। আজি মন্দাকিনীর জীবনের শেষ দিন।"

বেগে বংশীবদন ছুটিয়া চলিল, মেজো-বউ বলিতে লাগিল, "শুন! শুন! স্থির হও! আমার মাথা খাও, এখনই তাহার ঘরে যাইও না।"

কোন উত্তর না দিয়া বংশীবদন বেগে চলিতে লাগিল। সবিস্ময়ে সে দেখিতে পাইল, পার্শ্বে সুভদ্রা। ব্যস্ততা সহ জিজ্ঞাসিল, "এ কি? তুমি এখানে কেন?"

সুভদ্রা বলিল, "আমি ঘুমাইতেছিলাম; তুমি 'কে কে' বলিয়া চীৎকার করায় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; তাহার পর বাহিরে আসিয়া এই দিকে তোমার গলার আওয়াজ পাইয়াছি; তাই এখানে আসিয়াছি।" তাহার পর সুভদ্রা জ্যেষ্ঠের পা জড়াইয়া ধরিল;—বলিল, "সকল কথাই আমি শুনিয়াছি, দাদা! ছেলেমানুষ, কি করিতে কি হইয়াছে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। দোহাই তোমার, তুমি তাহার উপর অত্যাচার করিতে পাইবে না।"

বংশীবদন বলিল, "আবার কি বুঝিতে হইবে? কালি তুমি অনেক বুঝাইয়াছ। আজ বেশ বুঝিয়াছি, নিজের চক্ষেতে অনেক দেখিয়াছি, বুঝিতে কিছুই বাকী নাই। এ অবস্থায় তাহাকে ক্ষমা করিলে, আমি পশু-পক্ষীর অপেক্ষাও অধম হইব। পা ছাড়িয়া দেও; আর বিলম্ব সহে না।" সুভদ্রা পা না ছাড়িয়াই বলিল, "হতভাগিনীকে কত সুশিক্ষাই দিয়া আসিতেছি, কত ভাল চাল-চলনে থাকিতে বলিয়া আসি-

তেছি, পোড়াকপালী আপন অহঙ্কারে কোন কথাই শুনিল না। রূপ আছে, যৌবন আছে, তোমার দয়া আছে, সে আর আমাদের কথা গ্রাহ্য করিবে কেন? কিন্তু দাদা, সে মেয়েমানুষ, ছেলেমানুষ, তাহাকে কোন শাস্তি দিলে তোমার পৌরুষ নাই; তুমি ক্ষমা করিতে স্বীকার না করিলে আমি তোমার পা ছাড়িব না।”

সুভদ্রা জানিত, যে আগুন তাহারা জ্বালিয়াছে, তাহা নিবিবার নহে। অতএব একটু ভালমানুষ সাজিবার সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে। আর এক ভালমানুষও এইরূপ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছে; সে ভালমানুষ এখন আবার পশ্চাদ্দিক্ হইতে বলিয়া উঠিল, “ঠাকুরঝি! ছাড়িয়া দেও,আমি কোনমতেই কর্ত্তাকে আজি ছোট-বউয়ের ঘরে যাইতে দিব না। কাটিতে হয়,মারিতে হয়, আমাকে মারুন,আমাকে কাটুন; তাহার গায়ে হাত দিতে দিব না। উনি গ্রহণ না করেন, তাহাকে দূর করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু যাহাকে একদিন বহিন বলিয়া আদর করিয়াছি, তাহার গায়ে যে রক্ত পড়িবে, সে যে মারি খাইবে, তাহা প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিব না।”

সুভদ্রা পা ছাড়িয়া দিল। বংশীবদন বলিল, “বুঝিতেছি, তোমাদের দয়ার সীমা নাই। যাহা মনে আছে, তোমাদের অসাক্ষাতে তাহা করিব; তোমাদের সাক্ষাতে কিছুই হইবে না। প্রাণের এই জ্বালা লইয়া আমি বাহিরে যাইতেছি। আজি তোমাদের দয়ায় সে পাপিষ্ঠা বাঁচিয়া গেল। কিন্তু তোমরা জানিও, তাহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে। আমি কোন কারণেই এরূপ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিব না।”

তখন বংশীবদন সে স্থান হইতে বেগে প্রস্থান করিল। মেজো-বউ

পশ্চাতে চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল, "যাইও না; আজি আমার ঘরে থাকিতে হইবে।"

বংশীবদন বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল, "না, পাপের দমন না হইলে আমি আর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব না। কালি আমি বাটী থাকিব না। অতি ভয়ানক প্রয়োজনে আমাকে প্রাতেই বর্দ্ধমান যাইতে হইবে। তিন দিন পরে আমি ফিরিতে পারি, তাহার'পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

বংশীবদন চলিয়া গেল। মেজো-বউ হাত ধরিয়া সুভদ্রাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল। সুভদ্রা বলিল, "কেমন? আর কি চাও?"

মেজো-বউ বলিল, "চাই অনেক, পাই কই? রূপসী সতী যমালয়ে গিয়াছে কি?"

সুভদ্রা বলিল, "প্রায় চলিল, একবার দেখিয়া আসি।"

তখন এই দুই পিশাচী মন্দাকিনীর কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। যদি স্বামী দয়া করিয়া কক্ষে পদার্পণ করেন, এই আশায় মন্দাকিনী কখনই দ্বারে অর্গল বন্ধ করিত না। কল্য বারংবার স্বামীর পদাঘাত খাইয়াও আজি আবার অভাগিনী সেই আশায় দ্বার চাপিয়া ঘুমাইতেছে। ঘরে মৃৎপ্রদীপে অতি ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে।

পিশাচী সতিনী ও ননদিনী সেই পাপশূন্যা সরলা সুন্দরীকে অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিল। ব্যাধ পল্লবমধ্যস্থিত প্রসন্নচিত্ত বিহঙ্গিনীকে যেরূপ নয়নে দেখে, মৃগয়া-নিরত অস্ত্রধারী নরপতি বনমধ্যে ক্রীড়াশীলা হরিণীকে যে ভাবে দেখে; নরহন্তা দস্যু পথপ্রবাহী নিশ্চিন্ত পর্য্যটকের প্রতি যেরূপ দৃষ্টিপাত করে, রণকুশল বীর অন্ধকারে আবৃতকায় হইয়া প্রতিযোদ্ধাকে

যেরূপে দর্শন করে, সেইরূপ বিষদিগ্ধ-নয়নে এই দুই পাপিষ্ঠা সেই সুষুপ্তা শোভাময়ীকে দর্শন করিল। উভয়েই বুঝিল, মন্দাকিনীর অদৃষ্ট মন্দ; তাহার জীবলীলার শেষ হইয়াছে। আয়ুর পরিমাণ এখন প্রহর, দণ্ড, পলে সীমাবদ্ধ।

কুটিল-দৃষ্টিতে উভয়ে উভয়ের বদন নিরীক্ষণ করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথিত বক্রেশ্বর-তীর্থের প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ দক্ষিণে দুবরাজ-পুর-গ্রাম-সন্নিহিত ক্ষুদ্র পাহাড়।—বড়ই সুন্দর, বড়ই মনোহর, ইহাতে অভ্রভেদী শৃঙ্গ নাই, শ্বাপদ-সঙ্কুল মহারণ্য নাই, বিহঙ্গমকূজিত রমণীয় পুষ্পবৃক্ষ নাই, অঙ্গ-বিধৌতকারিণী, কলভাষিণী নির্ঝরিণী নাই, তথাপি এই ক্ষুদ্র পাহাড় অতি রমণীয়।

প্রায় এক শত বিঘা স্থান অধিকার করিয়া এই পাহাড় মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। কালের কতই আক্রমণ, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ভীম-প্রভঞ্জন-বেগ এবং দুঃসহ বজ্রাঘাত বুক পাতিয়া অকাতরে নীরবে সহ্য করিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করিয়াছেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে হিমালয়-পর্ব্বতের কিয়দংশ নৈসর্গিক কারণে বিচ্যুত হইয়া এই প্রদেশে আনীত হইয়াছে। ইহার প্রস্তরের প্রকৃতি তাঁহাদিগের মীমাংসার সমর্থন করে, কিন্তু সে বিচার আমাদিগের অনাবশ্যক।

বড়ই বিশৃঙ্খলভাবে বিশাল পাষাণখণ্ড সমূহ ছড়াইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য ও দুরারোহ শৈল ও মধ্যভাগে সমতল ক্ষেত্র। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ, তদুপরি সবুজ বর্ণের ঘাস। কোথাও বা কেবল এক সূক্ষ্ম বিন্দুর উপর নির্ভর করিয়া বাষ্পপূরিত অধোমুখ ব্যোমযানের ন্যায় পাষাণের উপর পাষাণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মনে হয়, একটু প্রবল বায়ু বহিলে, একটী পক্ষী উপরে বসিলে, দেহে একটু আঘাত পাইলে, হস্তস্থিত ছড়ি বা ছাতার আঘাত করিলে, তৎক্ষণাৎ সেই প্রকাণ্ড প্রস্তর-

স্তূপ বিকট শব্দ সহকারে নিম্নে পতিত হইয়া সন্নিহিত পদার্থপুঞ্জ নিষ্পেষিত করিয়া দিবে এবং নিকটবর্ত্তী স্থান বিকম্পিত করিয়া ভূকম্পের কম্পন উদ্ভব করিবে ; কিন্তু সকল আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়া, সকল শক্তিকে বিদ্রূপ করিয়া এবং সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া সেই সকল শৈল পরস্পর অসংবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

বিশৃঙ্খলার এমন শোভা, কঠোরের এমন মাধুর্য্য, অনিয়মের এমন অপরূপ বিকাশ সংসারে বড় অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের স্থানে স্থানে অন্ধকারময়, কোথাও বা সুন্দর আলোকিত গুহা, কোথাও বৃহৎ পাষাণখণ্ডের উপর আর একটা শৈল এরূপভাবে পড়িয়াছে যে, দেখিলেই মনে হয়, একটা বিকটকায় রাক্ষসকে আর একটা ভয়ঙ্কর দৈত্য চাপিয়া ধরিয়াছে ; কোথাও মনে হয়, রাধাকৃষ্ণের বিরাট যুগলমূর্ত্তি পাশাপাশি দাঁড়াইয়া জগতে শোভা বিলাইতেছে। কোথাও মনে হয়, অতি বৃহৎ বিশালোদর ধান্য ও শস্য রাখিবার আধার-সমূহ অসুরগণ এই স্থানে রাখিয়া গিয়াছে ; কোথাও মনে হয়, যেন শ্রমকাতর বিলাসী সান্ধ্য-সমীর সেবন করিবে বলিয়া আসন পাতিয়া রাখিয়াছে। কোথাও পাষাণের উপর পাষাণ পড়িয়া মনোহর সেতুর আকার ধারণ করিয়াছে ; কোথাও বা মনে হয়, ভীষণ দৈত্যের দেহচ্ছিন্ন প্রকাণ্ড মস্তক গড়াগড়ি যাইতেছে ; কোথাও বা মনে হয়, কোন কল্পনাতীত যুগের প্রকাণ্ড হস্তী বুক পাতিয়া বিশ্রাম করিতেছে ; কোথাও বা বোধ হয়, অনেক সাধু-গুরু নিশ্চল ও নিস্পন্দভাবে পরব্রহ্মের ধ্যান করিতেছেন।

এই নাতিবিস্তৃত পাহাড়ের এক প্রান্তে পাহাড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির। অপরদিকে পাহাড়েশ্বরী কালিকাদেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি। অমাবস্যার

দিন শম্ভুরাম সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে রাণীগঞ্জের পথ ধরিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পাহাড়েশ্বরের মন্দির-সন্নিধানে উপনীত হইয়া লালের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। তত্রত্য পাষাণের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া প্রাণের ভক্তি সহকারে শম্ভুরাম অনেকক্ষণ দেবদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন; তাহার পর উঠিয়া লালের বল্গা ধারণ করিলেন এবং সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তাহাকে সাবধানে সঙ্গে লইয়া এক নিভৃত স্থানে রাখিলেন;—বলিলেন, "লাল! আমার পুত্রবৎ প্রিয় লাল! যদি বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তুমি শব্দ করিও না, বিচলিত হইও না, পাষাণের ন্যায় পাহাড়ের সহিত নিশ্চলভাবে মিশিয়া থাকিও।"

অশ্ব যেন প্রভুর সমস্ত কথাই বুঝিল। কারণ, সে মস্তক ও পুচ্ছ আন্দোলন করিয়া প্রভুর কথায় সম্মতি প্রকাশ করিল। অশ্বের কণ্ঠালিঙ্গন ও তাহাকে আদর করিয়া শম্ভুরাম চলিয়া আসিলেন। পাহাড়েশ্বরের অদূরে একটী অনুচ্চ শৈলের উপর বসিয়া তিনি অন্ধকারে মিশিয়া রহিলেন। অশ্বের পদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, শব্দ নিকটে আসিতে লাগিল, ওষ্ঠে হাত দিয়া শম্ভুরাম বহুদূরব্যাপী শব্দ করিলেন। তৎক্ষণাৎ অনুরূপ শব্দ হইল। শুনিতে পাইয়া তিনি পাষাণ হইতে অবতরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তিন জন অশ্বারোহী তাঁহার নিকটে আসিল।

শম্ভুরাম বলিলেন, "আইস, অশ্ব পশ্চাতের পাহাড়-বেষ্টিত কান্তারে রাখিয়া আইস। বোধ হয়, প্রথমে অশ্বের প্রয়োজন হইবে না। আর সকলে কোথায়?"

অশ্বারোহিগণ অবতরণ করিয়া বলিল, "আসিতেছেন; একসঙ্গে আসা গুরুর নিষেধ, এই জন্য পৃথক্ পৃথক্ আসিতে হইয়াছে।"

তাহার পর তাহারা শম্ভুরামকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া অশ্ব লইয়া প্রস্থান করিল। আবার আসিল ;—আবার দুইজন আসিল, ক্রমে ক্রমে কুড়ি জন অশ্বারোহী বীর আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই শম্ভুরামের উপদেশানুসারে নানা প্রকার প্রচ্ছন্ন স্থানে অশ্ব রাখিয়া আসিল।

তাহার পর শম্ভুরাম প্রত্যেকের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সকলেই এক এক দুরারোহ পাহাড়ের উপর উঠিল, প্রায় সকলেই সম্মুখে বৃহৎ পাষাণ রাখিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। শম্ভুরাম সকলের অগ্রে স্থান লইলেন। তাঁহার অতি নিকটে অপর এক সৈনিক স্থান লইল। পাহাড় নিস্তব্ধ। তথায় যে এতগুলি মনুষ্য ও অশ্ব অবস্থান করিতেছে, তাহা বুঝিবার কোন উপায় থাকিল না। শম্ভুরাম মৃদুস্বরে একজন সৈনিককে জিজ্ঞাসিলেন, "আবশ্যক হইবামাত্র অগ্নি জ্বালিবার উপায় ঠিক আছে তো?"

সৈনিক বলিল, "ঠিক আছে; কিন্তু আজি এত বিশেষ আয়োজন কেন? শত্রু তো কোন দিকে দেখিতেছি না গুরু?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "এখন দেখিতেছ না, কিন্তু শীঘ্রই দেখিবে। ভবানীর ইচ্ছায় আমরা কাজ করি, তিনি যে কাজের জন্য যেরূপ আয়োজন করিতে বলেন, তাহাই করিতে আমরা বাধ্য; ফলাফল তাঁহার হাতে। অন্ধকারে যুদ্ধ বড়ই ভয়ানক, সকলকেই কেবল শব্দ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতে হইবে। নরহত্যা বড়ই দোষাবহ; কিন্তু আজি বোধ হয়, নরহত্যাও ঘটিবে। জানি না, ভবানীর মনে কি আছে।"

সৈনিক জিজ্ঞাসিল, "ভবানীর পুত্র গুরুর ইচ্ছা কখনই নিষ্ফল হয় না। আজি যদি এখানে আসিলে নরহত্যা হইবে বুঝিয়াছেন, তবে

আসিলেন কেন গুরু? গুরুর নিকট শিষ্যের মনের কথা জানাইতে কোনই সঙ্কোচ নাই, তাই এত কথা জিজ্ঞাসিতেছি।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "একজন দুষ্টলোকের সহিত কথা ছিল যে, সে এই স্থানে অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। জানিয়াছি, সেই দুষ্ট আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য অনেক আয়োজন করিয়াছে। তথাপি কথা ঠিক রাখিবার জন্য আমি উপস্থিত হইয়াছি।"

বড় অন্ধকার, সম্মুখের মনুষ্য-মূর্ত্তিটীও দেখিবার সম্ভাবনা নাই। শম্ভুরাম বলিলেন, "কাণ ঠিক করিয়া রাখ, নিকটে মানুষের অস্পষ্ট কথা শুনা যাইতেছে না কি?"

সৈনিক বলিল, "হাঁ।"

বাস্তবিকই অনতিদূরে দুই জন মনুষ্য কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইতেছে। ক্রমে মনুষ্য দুই জন পাহাড়েশ্বরীর নিকটে আসিল। এক জন উচ্চস্বরে বলিল, "কৈ? কোথাও তো কেহ নাই, মহাদেব! তুমি সাক্ষী, আমি অমাবস্যার দিন ঠিক আসিয়াছি, কিন্তু আর যাহার আসিবার কথা, সে তো আইসে নাই?"

এই ব্যক্তি বংশীবদন। তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শম্ভুরাম পাহাড় হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাহার ঠিক পশ্চাতে আসিয়া বলিলেন, "আমি অনেকক্ষণ আসিয়াছি। বংশীবদন! তুমি টাকা লইয়া আইস নাই, আমাকে ধরিবার জন্য রাজার সহিত মন্ত্রণা করিয়া অনেক সৈন্য লইয়া আসিয়াছ। আমি সে জন্যও প্রস্তুত আছি, কোথায় তাহারা?"

বংশীবদন বলিল, "এঁ—এঁ—তা—তা—টাকাটা আমার যোগাড় হয় নাই; কিন্তু—রাজা—তা—তা—আমি কি জানি?"

শম্ভুরাম হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা যাহা করিয়াছ, আমি সকলই জানি।"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে শন্ শন্ শব্দে একটা তীর শম্ভুরামের কাছ দিয়া চলিয়া গিয়া পাহাড়ে বাধা পাইল।

শম্ভুরাম বলিলেন, "আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, তোমার সহিত পরে সাক্ষাৎ হইবে।"

পুনরায় শম্ভুরাম অতি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত পূর্ব্বস্থান অধিকার করিলেন। বংশীবদন বলিল, "আমি টাকা আর তিন দিনের মধ্যে পৌছাইয়া দিব। এখন আমার প্রতি কি হুকুম?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তুমি ইচ্ছা করিলে পলায়ন করিতে পার; যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার প্রাণ নষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। আর যদি আমার পরাজয় দেখিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে বাবার ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া থাকিতে পার।"

বংশীবদন সরিয়া দাঁড়াইল;—মন্দিরের দ্বারসমীপে আসিল, ভিতরে ঢুকিল না। শম্ভুরামের পতন দেখিতে তাহার বড়ই ইচ্ছা হইল। দেখিতে দেখিতে চারি শত পদাতিক সৈন্য পাহাড়ের চারিদিক্ ঘেরিয়া ফেলিল। এক শত অশ্বারোহী তাহাদের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একজন এই সৈন্য-সমূহের নায়ক। সে পার্শ্বস্থ এক অশ্বারোহীকে বলিল, "বংশীবদন কথা কহিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে যে, শম্ভুরাম এখানে আসিয়াছে। বুঝিতেছি, তাহার পলাইবার কোন উপায় নাই। এক্ষণে অন্ধকারে তাহাকে ধরা যায় কিরূপে?"

অশ্বারোহী বলিল, "চারিদিক্ হইতে আলোক লইয়া ক্রমে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে শম্ভুরাম ধরা পড়িবে।"

সেনানায়ক বলিল, "বুঝিতেছি, শম্ভুরাম মহাদেবের নিকটে আছে। চারিদিক্ হইতে অগ্রসর হওয়া অনাবশ্যক। আলোক প্রয়োজন বটে, নতুবা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, কিন্তু তাহাতে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা অনেক।"

অশ্বারোহী বলিল, "তাহা হইলে আর কালব্যাজ না করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা যাউক।"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক তীর আসিয়া অশ্বারোহীকে বিদ্ধ করিল। সে তৎক্ষণাৎ অশ্বচ্যুত হইয়া পড়িল। সেনা-নায়ক বুঝিল, শত্রু অতি নিকটেই আছে এবং তাহার অনুভবশক্তি বড়ই চমৎকার। এ অবস্থায় আলোক জ্বালিলে বিপদ্ ঘটিবে। কারণ, অন্ধকারে অনুমান করিয়া যে ব্যক্তি এরূপ সন্ধান করিতে পারে, আলোক জ্বালিলে দেখিতে পাইয়া সে অনায়াসেই সকলকে বিনাশ করিবে। সেনা-নায়ক আরও বুঝিল, অগ্রে পাহাড়ে আশ্রয় লইয়া শম্ভুরাম বড়ই চতুরের কার্য্য করিয়াছে। যাহারা পরে আসিয়াছে, তাহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। কিন্তু বংশীবদনের সহিত কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে বুঝিয়াছিল যে, শম্ভুরাম একাকী। তাহাকে পাঁচ শত লোকেও ধরিয়া ফেলিতে পারিবে না, এ কথা সেনা-নায়কের একবারও মনে হইল না। তখন সেনা-নায়ক নিকটবর্ত্তী প্রায় ত্রিশ জন সৈন্যকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিল। তাহারা পাথরের উপর দিয়া সম্মুখে যাইতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। দূর হইতে শম্ভুরাম বিপক্ষগণের মন্ত্রণা শুনিতে থাকিলেন। তিনি স্থান অনু-

ভব করিয়া আর এক শর ত্যাগ করিলেন। তাহার আঘাতে একজন সৈন্য অকর্ম্মণ্য হইল।

শম্ভুরামের পার্শ্বস্থ সৈনিক মৃদুস্বরে বলিল, "যেখানে কথা কহিতেছিল, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া আমিও তীর ছাড়িব কি ?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "না, বৃথা মানুষ মারায় কোন ফল দেখিতেছি না। বিপক্ষের লোক অনেক, কিন্তু তাহাদের সুযোগ বাস্তবিকই কম। এ অবস্থায় আমাদেরও চুপ করিয়া থাকাই ভাল।"

এ দিকে বিপক্ষ সেনা-নায়ক বুঝিল যে, যাহাই কেন হউক না, কতকগুলা আলোক জ্বালিয়া অগ্রসর না হইলে শত্রুর নিকট যাওয়া হইবে না। তখন তাহার আদেশে অনেক মশাল জ্বলিয়া উঠিল।

শম্ভুরাম সৈনিককে বলিলেন, "তীর মারিতে পার, কিন্তু হাতে পায়ে মারিও, দৈবাৎ অন্য কোথাও লাগিলে নিরুপায়।"

তখন শম্ভুরাম ও সৈনিক বারংবার তীর ছাড়িতে লাগিলেন, কিন্তু বিপক্ষগণ ভয়ানক উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। সাত জন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া গেল। প্রায় চল্লিশ জন তীর-আগমন-স্থান লক্ষ্য করিয়া শম্ভুরামের অধিকৃত পাহাড়ের নিকটে আসিল। শম্ভুরাম ও সৈনিক আরও তীর ছাড়িতে লাগিলেন। বিপক্ষদিগকে সুস্পষ্টরূপে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। পাহাড়ের নিকটে আসিয়া তীরের আক্রমণ হইতে তাহারা রক্ষা পাইল। কারণ, উপর হইতে তীর ছাড়িলে, তাহাদের অঙ্গে লাগিবার আর সম্ভাবনা থাকিল না, কিন্তু নিকটে আসিয়াও কোন সুবিধা হইল না। বুঝিল, শত্রুরা দুই জন ; তাহাতে পাহাড়ের উপর আছে, তাহাদের সম্মুখে প্রকাণ্ড পাষাণ। একে তো পাহাড়ে সৈনিক লইয়া উঠিবার

উপায় নাই, উঠিলেও শত্রুকে সেখানে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। তখন সেনানায়ক বুঝিল যে, বিপরীতদিক্ দিয়া পাহাড়ের উপরে উঠার চেষ্টা করাই উচিত, আর পাহাড়ের এই অংশ বহুলোকে বেষ্টিত করা আবশ্যক।

এইরূপ স্থির করিয়া সে এক শত যোদ্ধাকে অবিলম্বে সেই দিকে আসিতে আদেশ করিল এবং নিকটস্থ লোকদিগকে বিপরীতদিকে যাইতে হুকুম দিল। পঞ্চাশ জন লোক বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের উপর আবার পাহাড়ের উপর হইতে পূর্ব্ববৎ তীরবর্ষণ চলিতে থাকিল। সেনা-নায়ক সঙ্গিগণ সহ অপরদিকে পৌছিয়া দেখিল, বিপদ্ সহজ নহে। কারণ, দুইজন মাত্র শত্রুজ্ঞানে যেরূপ সহজ ব্যাপার মনে হইয়াছিল, এখন দেখা গেল, তাহা নহে; অন্য পাহাড় হইতে বর্ষার ধারার মত তাহাদিগের উপর বাণ বর্ষিতে লাগিল। যে পঞ্চাশ জন অগ্রসর হইতেছিল, তাহার মধ্যে পঁচিশ জন পাহাড়ের নীচে আসিয়া রক্ষা পাইল। এ দিকে যে ত্রিশ জন অপর দিকে গেল, তাহারা প্রায় সকলেই হতাহত হইল।

তখন সেই পাহাড়ের উপর হইতে গগন ভেদ করিয়া গম্ভীরস্বরে শম্ভুরাম বলিলেন, "তুমি বুদ্ধিমান্ সেনাপতি। আমি তোমার কার্য্য-কুশলতা দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। কিন্তু এরূপে কোন ফল হইবে না। আমার অনুমান হয়, তোমার পক্ষের প্রায় ৬০।৭০ জন লোক হতাহত হইয়াছে। অনর্থক মনুষ্যকে কষ্ট দিতে বা কাহারও প্রাণ নাশ করিতে আমি ইচ্ছা করি না। আমি পরামর্শ দিতেছি, তোমরা পলায়ন কর।"

সেনা-নায়ক বলিল, "অগ্রে আসিয়া পাহাড়ে স্থান পাইয়া তোমার

সুবিধা হইয়াছে। যদি আমরা অগ্রে আসিতে পারিতাম, তাহা হইলে ফল বিপরীত হইত।"

শম্ভুরাম হাসিয়া বলিলেন, "বুদ্ধিমান্ সেনাপতির মত কথা হইল না; তোমরা যদি উপযুক্ত স্থান অগ্রে অধিকার করিতে না পার, সে দোষ বিপক্ষের নহে। আর অগ্রে যদি তোমরা পাহাড়ে স্থান লইতে, তাহা হইলেই বা কি হইত? আমি প্রান্তরে থাকিলে অনায়াসে যে দিকে ইচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতাম। আমার অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। তোমাদের ধরাও আমার উদ্দেশ্য নয়, সুতরাং আমার কোন বিপদ্ই হইত না। সে কথা যাউক, তুমি আমাকে খুন কর, তাহাতেও হানি নাই; কিন্তু আমি অকারণে এরূপ মানুষ মারিতে চাই না। এ বিষয়ে তোমার কি পরামর্শ, বল?"

সেনাপতি বলিল, "প্রভুর আদেশে আমি তোমাকে ধরিতে আসিয়াছি; হয় ধরিব, না হয় মরিব। প্রভুর কার্য্য সিদ্ধ না করিয়া প্রাণের ভয়ে আমি কখনই পলাইব না।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তবে আমি নিরুপায়। তোমাকে মারিব না, কিন্তু অকর্ম্মণ্য করিব।" তৎক্ষণাৎ পশ্চাতের এক পাহাড় হইতে এক বর্শা সেনাপতির বাম উরু বিদ্ধ করিয়া দিল। সেনাপতি ভূপতিত হইলে, শম্ভুরাম আবার বলিলেন, "অন্ধকারে রাত্রিকালে এরূপ অস্ত্রাঘাত করিলে, অনেকেরই প্রাণনাশ হইবার সম্ভব। আমি নিরস্ত হইতে সম্মত আছি, তোমরা যুদ্ধ ত্যাগ কর। মশার মত মনুষ্যহত্যা করায় কোনই পৌরুষ নাই।"

সেনাপতি কাতরস্বরে বলিল, "বুঝিতেছি, তুমি ডাকাইত হইলেও

মহদ্‌ব্যক্তি। আমরা পাঁচ শত লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া, রাজার চরণ স্পর্শ করিয়া তোমার বিপক্ষে আসিয়াছি, এরূপ অবস্থায় তুমি আমাদিগকে কি করিতে বল?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "আমি ক্ষান্ত হইতেই বলি। যে যুদ্ধে পাঁচ শত লোকই নষ্ট হইবে, অথচ আমার কোন ক্ষতি হইবে না, সে যুদ্ধ না করাই শ্রেয়ঃ। ভগবান্‌ দেখিতেছেন, তোমাদিগের কোন দোষ নাই। সুতরাং প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত পাপ তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। আমাকে ধরিবার চেষ্টা আজি তোমরা ত্যাগ কর। কারণ, ধরিতে পারিবে না, কেবল মৃত্যুই হইবে। আমি একটা তুচ্ছ লোক; নানা স্থানে আমার গতিবিধি, যদি আমাকে ধরিতে পারিলেই তোমাদিগের প্রভুর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অনেক সময়ে তাহার সুযোগ তোমরা পাইবে।"

সেনাপতি বলিল, "তুমি রাজার বশবর্ত্তিতা স্বীকার করিলে, তোমার সঙ্গে যুদ্ধের আর কোনই প্রয়োজন থাকিবে না।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তোমরা যাহাকে রাজা বলিতেছ, সে যদি দুর্ব্বলকে পীড়ন করিতে ক্ষান্ত হয়, প্রজারঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হয়, অধর্ম্ম-নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে, ন্যায় ও সুনীতির সম্মান করিয়া চলে, তাহা হইলে আমি তাহার দাস হইতে প্রস্তুত আছি। নতুবা এই ক্ষুদ্র শম্ভুরাম —ভবানীর দাস শম্ভুরাম—পদে পদে তাহার কার্য্যের বিরোধিতা করিবে। কিন্তু তোমাদিগের পক্ষে অনেক লোক হতাহত হইয়াছে, তাহাদের শুশ্রূষা এক্ষণে আবশ্যক। বৃথা বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন; তুমি পরাজয় স্বীকার করিলে তোমাদিগের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব আমাকে দিতে হইবে।"

সেনাপতি একটু চিন্তার পর বলিল, "আজিকার যুদ্ধ আমাদিগের পক্ষে কোন মতেই সুবিধাজনক নহে; এ অবস্থায় তোমার পরামর্শই শ্রেয়ঃ। কিন্তু অশ্ব ও অস্ত্র আমরা দিব কেন?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তোমরা যে পরাজিত হইয়াছ, তাহা বুঝিব কিসে? আমি বিজেতা, আমার ইচ্ছায় কার্য্য করিতে তোমরা বাধ্য। তুমি সময় নষ্ট করিও না। তোমার রক্তক্ষয় হইতেছে, বড়ই দুর্ব্বল হইতেছ, তোমার শুশ্রূষা অগ্রে আবশ্যক। চারিদিকে যন্ত্রণাধ্বনি উঠিয়াছে, এ অবস্থায় তর্ক করা বাতুলতা।"

সেনাপতি বলিল, "তাহাই হউক। অশ্ব ও অস্ত্র ত্যাগ করিতে আমি সকলকে আদেশ করিতেছি।"

তখন সেনাপতির আদেশে সকল পদাতিক ও অশ্বারোহী নিকটে আসিল। সকলেই স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিল; সম্মুখে স্তূপাকারে সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইল। অশ্বারোহিগণ অশ্ব হইতে অবতরণ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুরাম একটা সঙ্কেতধ্বনি করিলেন, তৎক্ষণাৎ পাহাড় হইতে সেই বীরেরা অবতরণ করিয়া নিকটে আসিল এবং সেই পুঞ্জীকৃত অস্ত্র-শস্ত্র অশ্ব প্রভৃতি অধিকার করিল। তখন একলম্ফে শম্ভুরাম সেই পাহাড় হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন। বহু মশালের আলোকে বিপক্ষেরা দেখিল, কি সৌম্যমূর্ত্তি, কি গম্ভীর ভাব! শম্ভুরাম পতিত সেনাপতির নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তোমার আঘাত বড়ই গুরুতর হইয়াছে কি?"

সেনাপতি কোন উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে একবার আপনার দক্ষিণ বাহু

ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া আন্দোলন করিল। তখন নিমেষের মধ্যে সেই চারিশতাধিক সেনা শম্ভুরামের অধিকৃত অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইল এবং তাহার পক্ষীয় বীরগণকে আক্রমণ করিল।

শম্ভুরাম চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ভণ্ড অবিশ্বাসী সেনাপতি! তুমি পিশাচের নিয়োজিত পিশাচ।" এই বলিয়া নিষ্কোষিত অসি হস্তে উন্মত্ত সিংহের ন্যায় লম্ফত্যাগে বিপক্ষগণের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার পক্ষীয় বিংশতিসংখ্য যোদ্ধা প্রস্তুত ছিলেন না; অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহারাও অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই স্থলে সংহারমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তখন শম্ভুরাম হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া বিপক্ষগণকে যমালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট। অনেকেই মনে করিল, বুঝি বা বিশ্বনাশকারী ত্রিপুরারি স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অনুচরগণ নিকটে নাই, চারিদিক্ হইতে শত্রুগণ শম্ভুরামকে নাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। শম্ভুরাম কেবল অসিচালনা দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে করিতে বিপক্ষগণের ব্যূহভেদ করিতে থাকিলেন। প্রত্যেক চেষ্টাতেই পাঁচ, সাত বা দশ ব্যক্তি হত হইতে থাকিল। একদণ্ড-পরিমিত কাল এইরূপে যুদ্ধ করিয়া শম্ভুরাম বুঝিলেন, শত্রুপক্ষের অনেক লোকক্ষয় হইয়াছে। যখন যেখানে ব্যূহ গঠিত করিয়া বিপক্ষেরা শম্ভুরামকে নাশ করিবার আয়োজন করিতেছে, অনুচরগণ তাহারই বাহিরে থাকিয়া নিরন্তর অসির আঘাতে বিপক্ষপক্ষ ধ্বংস করিতেছে।

ব্যূহ শিথিল হইয়া আসিল; শম্ভুরাম তখন রক্তাক্ত, বিপক্ষের শোণিত তাঁহার মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ প্রধৌত করিতেছে। আবার

কিয়ৎকাল পরে শম্ভুরাম চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, চারি শতের এক-শতও তখন জীবিত আছে কি না সন্দেহ। তদ্দর্শনে বলিলেন, "যদি বাঁচিতে সাধ থাকে, তাহা হইলে এখনও পলাও।"

বিপক্ষের মধ্য হইতে একজন বলিল, "এ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা বৃথা। অনর্থক মৃত্যু অপেক্ষা পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ।"

তখন সেই এক শতের অধিক সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া সেই গভীর নিশার অন্ধকারে পলায়ন করিল। তখন শম্ভুরাম রক্তাক্ত-কলেবরে অতি ক্লান্ত-ভাবে পাহাড়েশ্বরের সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "প্রভো! কি করিলে? আমি নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অনেক নরহত্যা করিলাম! দয়াময়! এ পাপে আমার প্রবৃত্তি কেন ঘটাইলে?"

অধোমুখে শম্ভুরাম অনেকক্ষণ সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন। পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি বলিল, "কর্ত্তৃত্ব নিজের স্কন্ধে লইতেছ কেন? এ দুর্ম্মতি তোমার কখন্ হইতে হইল? তুমি কর্ত্তব্যের দাস—ভবানীর সেবক; জয়, পরাজয়, রক্ষা, বিনাশ তোমার দ্বারা হয় না।"

শম্ভুরাম উঠিয়া দেখিলেন,সম্মুখে ভবানীর পরিচারক সেই জটজূটধারী ব্রাহ্মণ। তখন শম্ভুরাম প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনি এখানে কেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা পাঠাইয়াছেন, সন্তান আসিয়াছে; উঠ।"

তখন শম্ভুরাম গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণকে আবার প্রণাম করিলেন এবং আপনার অনুচরদিগকে আহ্বান করিলেন। সকলেই অল্পাধিক আঘাত পাইয়াছে; দুই জনের আঘাত গুরুতর হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সকলেই নিকটে আসিল; শম্ভুরামের দেহ নানা স্থানে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। যে দুই জনের আঘাত গুরুতর হইয়াছে, শম্ভুরাম তাহাদের নিকটস্থ হইলেন।

বিপক্ষগণের আলোক-সাহায্যে দেখিলেন, আঘাত গুরুতর হইলেও মারাত্মক নহে।

তখন শম্ভুরাম বলিলেন, "সম্মুখস্থ শ্মশানে এই সকল হত ব্যক্তিদিগের অগ্নিসংকার করা আবশ্যক; আহত ব্যক্তিগণকে নগরে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। ইহার ব্যবস্থা হইলে, আমরা এ স্থান ত্যাগ করিব।"

তখন গ্রামের মধ্য হইতে বহু শকট ও লোক আনীত হইল সকলে শম্ভুরামকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল এবং তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিল। বিপক্ষগণের অস্ত্র, অশ্ব সমস্ত সংগৃহীত হইল। শবদেহ সমূহ শ্মশানঘাটে নীত হইল। আহত ব্যক্তিগণ শকটে স্থাপিত হইল; বিপক্ষ-সেনাপতিও সেই সঙ্গে শকটমধ্যে স্থান পাইল। সে বুঝিল, শম্ভুরামের সহিত কপট-ব্যবহার করিয়া বহুলোকের জীবননাশ হইয়াছে।

বিপক্ষগণের বহু অস্ত্র ও অশীতিটী অশ্ব সংগৃহীত হইল। পুনরায় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া শম্ভুরাম মন্দিরমধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন; বংশীবদন কুত্রাপি নাই। আহত বীরদ্বয়কে সযত্নে ক্রোড়ে লইয়া দুই জন বীর অশ্বে আসন গ্রহণ করিল। ভবানীর সেবক ব্রাহ্মণ অগ্রেই অদৃশ্য হইয়াছেন। তাঁহার সন্ধান করা অনাবশ্যক। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শম্ভুরাম লালের পৃষ্ঠে আসন গ্রহণ করিলেন। অশ্বারোহী সহ অশ্ব-সমূহ ধীরে ধীরে নদীতে উপনীত হইল। তথায় শম্ভুরাম অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সকলকে বারি পান করত বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন এবং ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া ঔষধ লেপন করিতে উপদেশ দিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন অপরাহ্নে রাণীগঞ্জের এক ক্রোশ উত্তরে এক খামার-বাড়ীতে বংশীবদন একাকী উপবিষ্ট। সে যাহা যাহা ভাবিয়াছিল, যে যে আশায় যে যে আয়োজন করিয়াছিল, সকলই বৃথা হইয়াছে। এরূপ ব্যাপার যে কখন ঘটিতে পারে, ইহা সে ভ্রমেও মনে করে নাই। একজন পাঁচ শত লোককে মারিয়া ফেলিতে পারে, ইহা কল্পনা করিলেও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। কা'ল সে যাহা দেখিয়াছে, তাহাতে তাহার মনে হইয়াছে যে, এই শম্ভুরামের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বোধ হয় যমেরও সাধ্য নাই। যখন ব্যাপার অতিশয় ভয়ানক বলিয়া সে বুঝিয়াছে, তখনই সে দেব-মন্দিরের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়াছে।

বংশীবদন আরও বুঝিয়াছে যে, এই শম্ভুরামের আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া সে বড়ই গর্হিত কাজ করিয়াছে। কারণ, এই অপরিসীম ক্ষমতাশালী লোকের হস্ত হইতে নিস্তারের কোনই উপায় নাই। কেবল যে দৈহিক শক্তি ও সাহসে শম্ভুরাম অদ্বিতীয়, এরূপ নহে; মানবের অতি-গুপ্ত সংবাদ জানিবার তাঁহার যেরূপ অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার দৈবীশক্তি আছে বলিয়াই মনে হয়; লোকেও তাঁহাকে ভবানীর বরপুত্র বলিয়া জানে। এই অদ্ভুতকর্ম্মা মনুষ্যকে বিরক্ত করিয়া বংশীবদন সর্ব্বনাশকে ডাকিয়া আনিয়াছে। এক্ষণে উপায়?

বংশীবদন বুঝিয়া দেখিল, যাহা যাহা শম্ভুরাম বলিয়াছেন, তাহা

সকলই সত্য; তিনি বলিয়াছেন, ব্যভিচারে তাহার সংসার ভাসিয়া যাইতেছে। বংশীবদন মনে মনে বলিল, "ইহা ঠিক কথা; আমি স্বয়ং ইহার প্রমাণ দেখিয়াছি; ক্রোধে, ঘৃণায়, লজ্জায় আমি মরিয়া যাইতেছি। আমার দুর্ব্ব্যবহারে সংসারের অনেক লোক এইরূপ কষ্ট পাইয়াছে, অনেক সতী আত্মহত্যা করিয়াছে, অনেক পুরুষ দেহত্যাগ করিয়াছে, অথবা অকালে প্রাণ হারাইয়াছে।" নিজের গৃহে নিজের পত্নী ও ভগ্নীকে ব্যভিচারিণী বুঝিয়া বংশীবদনের মনে পরের অবস্থা বুঝিবার শক্তি জন্মিয়াছে।

অনেক চিন্তা করিয়া বংশীবদন বসিল;—ভাবিল, শম্ভুরাম বড়ই দয়াশীল। কালি তাহার ব্যবহারে বুঝিয়াছি, সে অকারণ কাহারও অনিষ্ট করিতে কখনই ইচ্ছুক নহে। আমার সহিত নিশ্চয়ই সে আবার দেখা করিবে। আমি রাজার সহিত মিলিয়া তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিলাম, সুতরাং সে আমাকে বিশেষ শাস্তি না দিয়া ছাড়িবে না। কিন্তু যদি আমি ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে সাবধান হই, যদি তাহার নিকট অকপটে দোষ-স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাহা হইলে বোধ হয়, সে আমাকে ক্ষমা করিতে পারে। যখন তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রবলপরাক্রান্ত লোকও দাঁড়াইতে অক্ষম, তখন আমি কোন্ ছার!

রাত্রি এক প্রহরের পর বংশীবদন খামার-বাড়ী হইতে উঠিয়া নিবিড়ান্ধকারের মধ্যে পথ চলিতে লাগিল; পথ অন্ধকার হইলেও তাহার কোন কষ্ট হইল না। কারণ, সকল পথই তাহার সুন্দররূপ পরিজ্ঞাত। রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বংশীবদন আপনার ভবনদ্বারে উপস্থিত হইল। রক্ষীরা অনেকে বাহিরে বসিয়া ছিল, বংশীবদন তাহা-

দিগকে গোলমাল করিতে নিষেধ করিল। নীরবে বংশীবদন পুরমধ্যে প্রবেশ করিল। সদর-মহল পার হইয়া সে পাকের মহলে প্রবেশ করিল, সকলেই নিদ্রিত, কোথাও কোনরূপ শব্দমাত্র নাই। বংশীবদন মন্দপাদবিক্ষেপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল;—বুঝিল, সেথানেও সকলে নিদ্রাচ্ছন্ন। তাহার পর সে ক্রমে ক্রমে মন্দাকিনার ঘরের নিকট আসিয়া নিঃশব্দে দ্বার ঠেলিল। বংশীবদন যে দিন হইতে বাড়ী ছাড়া, সেই দিন হইতে রাত্রিকালে মন্দাকিনী দ্বারে অর্গল না লাগাইয়া শয়ন করেন না। সে স্থান হইতে বংশীবদন আরও অগ্রসর হইল। অনতিদূরে সুভদ্রার ঘর, বংশীবদন দ্বারে হাত দিয়া দেখিল, দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ; শিকলে কুলুপ লাগানো। বংশীবদন আরও অগ্রসর হইল; মেজো-বউয়ের ঘরের নিকট আসিয়া বংশীবদন দ্বার ঠেলিল; দুয়ার খুলিয়া গেল। কিন্তু ভিতরে কোন লোক নাই। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কোন শব্দই বংশীবদন শুনিতে পাইল না। তখন সে সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল; তাহার পর কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া পাশের দিকের একটা সরু পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর সে দূরে একটা আলোকের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল;—প্রদীপ দেখিতে পাইল না, কিন্তু একটা আলোক আছে বলিয়া বুঝিতে পারিল। সে দিকে যাইতে আর একটা উঠান পার হইতে হয়, সে উঠানে গাছপালা অনেক,সেই বনের অপর দিকে দুই-খানা ঘর আছে, যদি কখন বাটীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে আত্মীয়কুটুম্বের আধিক্য হয়, তাহা হইলে সেই দুইখানি ঘর ব্যবহার করা হয়, অন্য সময় তাহা প্রায়ই শূন্য পড়িয়া থাকে। বনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়ার পর

বংশীবদন একটী সুস্পষ্ট আলোক দেখিতে পাইল। তখন সে আরও মন্দ-গতিতে ও নিঃশব্দে আসিয়া ঘরের নিকট উপস্থিত হইল। ঘরের দ্বার খোলা; জানালা সেকালে থাকিত না, এক একটা চতুষ্কোণ বা গোলা-কার রন্ধ্র থাকিত; সে সকলও খোলা। দ্বারের দিকে বংশীবদন গেল না; পশ্চাতের এক রন্ধ্র-সমীপে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। ভিতরকার সকল ব্যাপারই বংশীবদন সুস্পষ্ট-রূপে দেখিতে পাইল।

বংশীবদন দেখিল; তাহার স্ত্রী ও ভগ্নী আর তিন জন পুরুষ এক স্থানে উপবিষ্ট। পুরুষেরা অবাধে নারীদ্বয়ের অঙ্গে হস্তার্পণ করিতেছে অথবা যাহার যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহারই মুখচুম্বন করিতেছে। এরূপ নির্লজ্জ ব্যাপার বংশীবদন কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। সে স্বয়ং নিতান্ত চরিত্রহীন পুরুষ; কিন্তু সেও কখনও এরূপ ব্যাপারের কল্পনা করিতে সাহস করে না। সে যাহা দেখিল, তাহা সচরাচর সম্ভাবিত নহে। যাহা সে বুঝিল, তাহা নরকেও সম্ভবে কি না সন্দেহ।

বংশীবদন সেই লোকত্রয়ের মধ্যে রামচন্দ্রকে চিনিতে পারিল। রামচন্দ্র গ্রামেরই লোক—সম্পর্কে বংশীবদনের ভাই হয়। আর দুই জন লোককে বংশীবদন চিনিতে পারিল না। লোকগুলার সহিত নারীদ্বয়ের অসংযত নির্লজ্জ ব্যবহারের কোনরূপ চিত্র উপস্থিত করিবার চেষ্টা করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু রামচন্দ্রের সহিত তাহাদের কথোপকথনের কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করায় হানি নাই। রামচন্দ্র বলিতেছে, "যাই বল ভদ্রা দেবি, আমি তোমাদের গোলাম হইয়া আছি, গোলাম হইয়াই থাকিব। মেজো-বউ ঠাক্‌রুন! গরীবের দরখাস্তটা তোমাদের শুনিতেই হইবে।"

মেজো-বউ বলিল, "ভয় হয়, পাছে তুমি হাত-ছাড়া হও।"

সুভদ্রা বলিল, "রূপের আগুনে পাছে তুমি পুড়িয়া মর!"

রামচন্দ্র বলিল, "রূপের কথা কেন বলিতেছ? তোমাদের দুই জনের রূপের তুলনা আমি জগতে দেখি না। আমি কেবল একদিন মন্দাকিনীকে চাই। তোমাদের গোলাম হইয়া আছি, দাসখত লিখিয়া দিয়া তোমাদের চরণে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছি, তাহার কিছুই অন্যথা হইবে না। কেবল একদিনের জন্য মনের এই আশাটা মিটাইতে চাই।"

সুভদ্রা বলিল, "তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; বরং তাহার এই সতীত্বের তেজ টুটিলে আমরা বড় সুখী হইব। তবে কথাটা কি জান, বড় শক্ত মেয়ে।"

রামচন্দ্র বলিল, "শক্ত হউক, নরম হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। এ সময় কর্ত্তা বাড়ী নাই; সে ঘরে একলা শুইয়া থাকে, তোমরা সহায় থাকিলে এই সুযোগে অনায়াসে সবই হইতে পারে।"

মেজো-বউ বলিল, "আজিকালি সে আবার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকে। যদি ঠাকুরঝি মনে করে, তাহা হইলে দরজা খুলিয়া রাখার উপায় হইলেও হইতে পারে। তাহার ধর্ম্মের কথা, তাহার স্বামীভক্তি আমাদের অসহ্য। এত লাথি খায়, তবু স্বামী ছাড়া আর কিছুই চায় না। তাহাকে যদি তুমি আমাদের পথে আনিতে পার, তাহা হইলে আমরা সন্তুষ্টই হইব।"

সুভদ্রা বলিল, "আজি আর উপায় নাই; কালি সন্ধ্যা হইতে আমি

তাহার সহিত ভাব করিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া রাখিব। তাহার পর ভাই রাম, তোমার কপাল।”

রামচন্দ্র মনের তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য সুভদ্রার সহিত যে ব্যবহার করিল, তাহা মনে হইলেও শরীর কণ্টকিত হয়।

বংশীবদন অন্তরাল হইতে সকল ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিল এবং সকল কথা শুনিল; কিন্তু তাহার কিছুমাত্র ক্রোধ হইল না। সে বুঝিল, এত কাল সে যেরূপ অত্যাচারে মনুষ্য-সমাজকে উৎপীড়িত করিয়া আসিতেছে, তাহারই উচিত শাস্তি আরম্ভ হইয়াছে। মাথার উপর একজন ভগবান্ নিশ্চয়ই আছেন। এ সংসারে এখনও ধর্ম্ম আছে, এ শাস্তি ভোগ করিতে সে বাধ্য। তাহার পর সে মনে করিল, অনেক সতীর সর্ব্বনাশ সে করিয়াছে, কাহারও ধর্ম্মরক্ষার সহায় সে কখনও হয় নাই। আজি তাহার সাধ্বীপত্নীর ধর্ম্মনাশের আয়োজন হইতেছে। চেষ্টা করিয়া সেই সতীর পবিত্রতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহার পরও যদি সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহার পরও যদি বিষয়কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল রাক্ষসীর সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতেই হইবে। অনেক নারীহত্যা, অনেক নরহত্যা, অনেক সতীর সর্ব্বনাশ, অনেক গৃহস্থের সর্ব্বস্ব হরণ করা হইয়াছে। সেই পাপের বোঝা শতজন্মেও ঘাড় হইতে নামিবে না, আর বোঝা বাড়াইয়া কাজ নাই।

মেজো-বউ সেই অপরিচিত পুরুষদ্বয়ের মধ্যে বসিয়া বড়ই বীভৎস ব্যাপারের অভিনয় করিতেছিল;—বলিল, “এ কয় দিন কিন্তু আমরা বড় সুখে কাটাইতেছি। এত দিন আমোদ চলিতেছে, কিন্তু এমন নিশ্চিন্ততা কখনই হয় নাই।”

সুভদ্রা বলিল, "বাস্তবিক বড় ভয়ে ভয়ে—বড় সাবধানে দশ বৎসর কাটিতেছে, এই কয়টা দিন বেশ সুখে আছি।"

রামচন্দ্র বলিল, "আমিও বড় নির্ভাবনায় যাওয়া আসা করিতেছি।"

সুভদ্রা বলিল, "কিন্তু এ সুখের দিন শীঘ্রই ফুরাইবে। দুই চারি দিনের মধ্যেই কর্ত্তা ফিরিয়া আসিবে।"

অপরিচিত পুরুষদ্বয়ের একজন বলিল, "আমরা রামচন্দ্রের সঙ্গে অনেক দিন যাওয়া আসা করিতেছি বটে, কিন্তু আর ভরসা হয় না। কর্ত্তা ফিরিয়া আসিলেই আমাদের যাওয়া আসা শেষ করিতে হইবে।"

সুভদ্রা বলিল, "কোন মতেই তাহা হইবে না। আমরা তোমাদের কাহাকেও ছাড়িতে পারিব না।"

মেজো-বউ বলিল, "প্রাণ দিতে পারিব, তবু তোমাদের মত রসিক লোকের সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না। এ পর্য্যন্ত অনেক লোকের সহিত আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এমন মনের মত মানুষ আর কখনও পাই নাই।"

রামচন্দ্র বলিল, "প্রাণের মায়া তো সকলেরই আছে; তোমরা আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করিবার উপায় কর না কেন? মনে করিলে তোমরা সকলই করিতে পার।"

সুভদ্রা বলিল, "যতদূর পারা যাইতে পারে, সকলই করা হইয়াছে; আর কি সুবিধা হইতে পারে, বল?"

মেজো-বউ বলিল, "হইতে পারে। অনেক টাকা-কড়ি আছে, অনেক বিষয়-আশয় আছে, বাড়ী-ঘর আছে. ভয় কেবল একটা লোকের জন্য তাহার কি কোন প্রতীকার হয় না?"

সুভদ্রা বলিল, "বড় শক্ত কথা; বড় ভয় হয়, কিন্তু সেইরূপ হইলেই মনের সাধ মিটিবে বটে।"

রামচন্দ্র বলিল, "তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে সহজেই সকল কাজ শেষ করিতে পার। দশটা টাকা খরচ করিলে অনায়াসেই নিষ্কণ্টকে তোমরা সকল বিষয়ের মালিক হইয়া স্বাধীনভাবে আমোদ-প্রমোদ করিতে পার।"

মেজো-বউ জিজ্ঞাসিল, "সহজ উপায় কি, বল?"

রামচন্দ্র বলিল, "কর্ত্তা দুই চারি দিনমধ্যেই ফিরিবে। ফিরিবার সময় রাস্তায় দুইটা লোক লাঠি লইয়া লুকাইয়া থাকিলেই গোল মিটিয়া যাইবে।"

মেজো-বউ বলিল, "বুঝিয়াছি—কেহই কোন সন্দেহ করিবে না। নাম হইবে, ডাকাইতে মারিয়াছে, বেশ মৎলব বটে; কিন্তু আমরা সেরূপ লোক পাইব কোথায়?"

রামচন্দ্র বলিল, "লোকের আবার ভাবনা? টাকা পাইলে কত লোক হাসিতে হাসিতে কাজ শেষ করিয়া দিবে।"

সুভদ্রা বলিল, "তাহা হইলে তুমি লোক ঠিক কর। টাকার কোন ভাবনা নাই।"

বংশীবদন এ কথাও শুনিল; তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য, আপনাদের সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য, স্বাধীনভাবে এইরূপ ঘৃণিত আচরণ চালাইবার জন্য স্ত্রী ও ভগ্নী অর্থব্যয় করিয়া তাহার প্রাণনাশের আয়োজন করিতেছে। ইচ্ছা হইল, এই দণ্ডে এই পাঁচ নারীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হইবে অথবা বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া

ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া মারিতে হইবে। মনে পূর্ব্বে যে ভাব ছিল, তাহা তিরোহিত হইল; তখন বিজাতীয় ক্রোধে বংশীবদনের প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল; সে সে স্থান ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বাহিরে আসিল; তথা হইতে পাঁচ জন সশস্ত্র রক্ষী সঙ্গে লইয়া পুনরায় সেই পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তাহার পর যে গৃহমধ্যে সেই নারকী লীলা অভিনীত হইতেছিল, তাহার দ্বারে আসিয়া বলিল, "তর-বারি-হস্তে সকলে তোমরা দাঁড়াইয়া থাক; এই ঘরের যে লোক বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিবে,তাহাকেই নিঃসঙ্কোচে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।"

গৃহমধ্যস্থ সকলেই বংশীবদনকে দেখিতে পাইল। তখন সকলেই বুঝিল, এরূপ অবস্থায় তাহাদের নিষ্কৃতির কোনই আশা নাই। মৃত্যু তখন তাহাদের সম্মুখে। তাহারা মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল; পাচ জনের ক্রন্দনে একটা কলরব উপস্থিত হইল। রক্ষিগণকে সেই স্থানে রাখিয়া বংশীবদন পুনরায় বাটীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল;— দেখিল, মন্দাকিনী ঘরের বাহিরে আসিয়া, কোথা হইতে ক্রন্দনের শব্দ উঠিতেছে, তাহাই শুনিবার জন্য ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করিতেছে। বংশী-বদনকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া মন্দাকিনী চমকিয়া উঠিল; তাহার পর বলিল, "এ কি, তুমি কখন্ ফিরিয়াছ? এত দেরি হইল যে?"

বংশীবদন বলিল, "কোন কথা বলিবার সময় নাই; তুমি উঠিয়াছ, ভালই হইয়াছে; আমি এখন ভয়ানক কাণ্ডে মাতিয়াছি। তোমার সহিত অনেক কথা আছে, পরে হইবে।"

মন্দাকিনী বলিল, "এক একবার কান্নার শব্দ শুনিতেছি, কে কোথায় কাঁদিতেছে, বলিতে পার?"

বংশীবদন বলিল, "পারি। কান্নার এখনই শেষ হইবে। তুমি একটু অপেক্ষা কর।"

বংশীবদন বেগে প্রস্থান করিল। ভীতা মন্দাকিনী স্বামীর অনুমতি না পাইয়াও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল ;—দেখিল, বংশীবদন তাহার প্রকাণ্ড খাঁড়া বৈঠকখানা ঘর হইতে বাহির করিল ; খাঁড়া লইয়া যখন সে উন্মত্তের ন্যায় ফিরিতেছে, তখন মন্দাকিনী তাহার পথরোধ করিয়া বলিল, "বল, কি হইয়াছে, তবে যাইতে দিব। ঠাকুরঝি কোথায়? মেজদিদি কোথায়?"

বংশীবদন বলিল, "যমালয়ে যাইবার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইতেছে ; তুমি পথ ছাড়িয়া দেও, তোমার সহিত এখনই সাক্ষাৎ করিব।"

মন্দাকিনী বলিল, "না, আমার বড় ভয় হইতেছে ; এখানে থাকিতে পারিব না। তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।"

বংশীবদন বলিল, "আসিতে চাও, আইস, কিন্তু আমার কাজে বাধা দিতে পাইবে না। সেখানে তোমার আরও ভয় হইবে। আমি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।"

মন্দাকিনী বলিল, "তুমি কি করিতে যাইতেছ? আমি তোমার কথা শুনিয়া বড়ই ভয় পাইতেছি। তোমার হাতে খাঁড়া কেন? তুমি খাঁড়া ফেলিয়া দেও।"

বংশীবদন বলিল, "খাঁড়া ফেলিয়া দিব, জন্মের মত খাঁড়ার সহিত সম্বন্ধের শেষ হইবে ; কিন্তু আর একটু পরে।"

মন্দাকিনী বলিল, "তুমি মানুষ মারিবে, আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে যাইতে দিব না।"

কান্নার রোল বড় উচ্চ হইয়া উঠিল। বংশীবদন বলিল, "ডাকিতেছে—ঐ দেখ, তাহারা ডাকিতেছে, আর না।"

বংশীবদন উন্মাদের ন্যায় অস্থিরভাবে মন্দাকিনীকে পাশে ঠেলিয়া দিয়া ছুটিল; সহসা পশ্চাৎ হইতে গম্ভীরস্বরে কে বলিল, "বংশীবদন! আমি আসিয়াছি।"

বংশীবদন কাঁপিয়া উঠিল;—বুঝিল, আগন্তুক শম্ভুরাম। তখন বংশীবদন বলিল, "বড় অসময়ে আসিয়াছেন; ধনে আপনার প্রয়োজন। পাঁচ হাজার টাকা কেন, আমার সর্ব্বস্ব আপনি লইয়া যাউন। আমার ধনাগার কোথায়, তাহা আপনি জানেন, এখন আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "এখনই সাক্ষাৎ করিতে হইবে। কেবল ধনে আমার প্রয়োজন হইলে তোমাকে না ডাকিলেও চলিত। তুমি যে জন্য যাইতেছ, তাহা আমি জানি, এখন আমি তোমাকে তাহা করিতে দিব না।"

বংশীবদন বলিল, "আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে বোধ হয় দেবতারও সাধ্য নাই। আমি আপনার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত; কিন্তু এ বিষয়ে নহে।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তোমার কনিষ্ঠা স্ত্রীকে সরিয়া যাইতে বল; তুমি আমার নিকটে আইস।"

তখন মন্দাকিনী দূরে অন্ধকারের মধ্যে সরিয়া গেলেন। শম্ভুরাম আসিয়া বজ্রমুষ্টিতে বংশীবদনের হাত চাপিয়া ধরিলেন;—বলিলেন, "রক্তস্রোতে পৃথিবী ভাসাইলে এ পাপের কোনই দণ্ড হইবে না।"

বংশীবদন বলিল, "তবে কি করিব?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "আপনাকে উন্নত কর। পাপ হইতে আপনাকে সাবধান কর; পাপের ছায়াও স্পর্শ করিও না।"

বংশীবদন বলিল, "যাহা করিতে হয়, আপনি করুন। আমি চির-দিনের পাপী। আমার উন্নতি ইহজীবনে আর হইবে না।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "অবশ্য হইবে। তোমার শেষ পরিণীতা পত্নী দেবী স্বরূপিণী। তাঁহার সংস্রবে তোমার পাপ ধৌত হইবে। তুমি প্রেম অভ্যাস কর, তাঁহার নিকট আত্মোৎসর্গ কর, সুখী হইবে।"

বংশীবদন বলিল, "আর ইহাদের ব্যবস্থা কি হইবে?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "বাটীর আবর্জ্জনা দাস-দাসীরাও প্রতিদিন দূর করিয়া দেয়; ইহাদিগকেও আবর্জ্জনা মনে করিয়া দূরে ফেলিয়া দাও।"

বংশীবদন বলিল, "যে আজ্ঞা। কিন্তু আমি আর তাহাদের মুখ দেখিব না। আমি আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছিলাম, যাহাতে আপনি মারা পড়েন, তাহার অনেক ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলাম, সকলই বিফল হইয়াছে। আমি সে জন্য আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি না। কারণ, আমার অপরাধ ক্ষমার অতীত। দেবতার বিরুদ্ধে যাহারা কার্য্য করে, তাহারা শাস্তি পাইয়া থাকে, আমার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন, করুন। আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি আপনার চরণে অর্পণ করিতেছি, আপনি সৎকর্ম্মে ধন ব্যয় করিয়া থাকেন, পাপের ধন যদি সৎকর্ম্মে লাগে, তাহা হইলে আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করিব।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "পাঁচ হাজারের অধিক টাকা লইবার আমার প্রয়োজন নাই। যাহারা দুর্ব্ব্যবহারে তোমাকে ক্লেশ দিয়াছে, তাহাদের মুখ তুমি আর দেখিতে পাইবে না। তুমি আমার বিরুদ্ধে অনেক লোক

সংগ্রহ করিয়া অন্যায় করিয়াছিলে,অকারণ অনেকগুলি লোকের প্রাণনাশ করিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। জানি না, এ জন্য ভবানী কি বলিবেন। তুমি টাকা বাহির কর, আমি অন্য ব্যবস্থা করিতেছি। আমার লোকেরা পাপিষ্ঠদিগকে এত দূরে রাখিয়া আসিবে যে, তুমি জীবনে আর তাহাদের সন্ধান পাইবে না। সাবধান! তোমার দুর্ব্ব্যবহারে মন্দাকিনীর চক্ষুতে আর কখন যেন জল না পড়ে।"

শম্ভুরাম প্রস্থান করিলেন।

বংশীবদন মন্দাকিনীকে ডাকিয়া আনিলেন এবং ধনাগার হইতে স্বামী ও স্ত্রী আলো লইয়া পাঁচ হাজার টাকা অনেকগুলি থলিয়ার মধ্যে পূরিয়া রাখিলেন। প্রায় দুই দণ্ড পরে শম্ভুরাম আবার দেখা দিলেন। বংশীবদন ও মন্দাকিনী সমস্ত টাকা দেখাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

শম্ভুরাম বলিলেন,"তোমরা চিরসুখী হও। পাপে যেন তোমাদের মতি না হয়। তোমাদের অর্থ মহৎকার্য্যে ব্যয় হইবে। এইরূপ ব্যয় হইলেই অর্থ সার্থক হয়। বংশীবদন, এই ধর্ম্মশীলা পত্নীর সহিত নিষ্কণ্টকে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। পাপীরা আর তোমার নিকটেও আসিবে না, প্রয়োজন হইলেই তোমরা আমার সাক্ষাৎ পাইবে। দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি রাখিবে, প্রাণপণে দরিদ্রের উপকার করিবে। তোমরা সরিয়া দাঁড়াও, আমার লোক আসিয়া টাকার থলিয়া উঠাইবে।"

মন্দাকিনী অন্তরালে প্রস্থান করিলেন। শম্ভুরামের আদেশে তিন জন অনুচর আসিয়া টাকা উঠাইয়া লইল। শম্ভুরাম অদৃশ্য হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে বহু লোক অপরিচিত ব্যক্তিবিশেষের হস্ত হইতে বহু সাহায্য প্রাপ্ত হইল। কোন দুঃখী পরিবারবর্গ ও একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ পুত্রকে লইয়া অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করিয়া থাকে, সেই পুত্র মরণাপন্ন; ঔষধ নাই, পথ্য নাই; একদিকে বৃদ্ধ জনক, একদিকে বৃদ্ধা জননী, চরণ-সমীপে বিধবা ভগ্নী, দূরে সাশ্রুনয়না যুবতী পত্নী, আরও দূরে দুইটী ভাগিনেয় ও একটী পুত্র; সকলেই আগতপ্রায় বিপদের ছায়া-দর্শনে শঙ্কাকুল—ম্রিয়মাণ। সহসা এক অপরিচিত পুরুষ আসিয়া কহিয়া তাহাদিগকে পঞ্চাশ টাকা দিল। কবিরাজ ডাকিতে, ঔষধ ও পথ্য সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়া অজ্ঞাত সহায় অদৃশ্য হইল।

কোথাও যৌবনোন্মুখী কন্যার বিবাহ দিতে না পারায় জনক-জননী অপমানে মৃতকল্প, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লজ্জায় অধোমুখ, আহার-নিদ্রা বন্ধ, জাতি যায়, যে অর্থ পাত্রপক্ষ দাবী করে, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেও তাহার সিকি ভাগও সংগৃহীত হইবে না। জননী আত্মহত্যা কল্পনা করিতেছে, পাত্রী ভগবান্‌কে ডাকিয়া মৃত্যুর কামনা করিতেছে, সহসা এক অপরিচিত পুরুষ আসিয়া ঠিক প্রয়োজনীয় অর্থ ঢালিয়া দিল; কোন পরিচয় দিল না, কেবল সত্বর শুভকর্ম্ম শেষ করিতে বলিয়া লুকাইয়া গেল।

সকল কথা বিস্তারিতরূপে বলিতে হইলে অতি বাহুল্য হয়; সংক্ষেপতঃ এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সেই দিন সমস্ত প্রদেশে যেখানে

উৎপীড়নের হাহাকার, দুঃখের দীর্ঘ নিশ্বাস, অভাবের তীব্র তাড়না, জাতি-মান-রক্ষণের অসম্ভাবনা, যেখানে হতাশের আর্ত্তনাদ, রোগ-যন্ত্রণার তপ্ত শ্বাস, সেই সেইখানেই অজ্ঞাত পুরুষ দেবদূতের ন্যায় যথোপযুক্ত সাহায্য-দানার্থ সমাগত। সকলেই বুঝিল যে, ভগবৎপ্রেরিত গন্ধর্ব্ববিশেষ করুণা ও শান্তি লইয়া সকলের গৃহদ্বারে উপস্থিত। একদিনে বহুদূরব্যাপী সকল লোকের অভাবজনিত অন্তর্দ্দাহ নিবারিত হইল; একদিনে বহুদূর-ব্যাপী লোকের মুখমণ্ডল হইতে বিষাদের কালিমা তিরোহিত হইয়া প্রসন্নতা ক্রীড়া করিতে লাগিল; একদিনে সর্ব্বস্থান আনন্দের মধুর উচ্ছ্বাসে মুখরিত হইল।

কে এই অচিন্তিতপূর্ব্ব যথোপযুক্ত সহায়তা-হস্তে উপস্থিত হইল, কে এই সার্ব্বজনীন দুঃখরাশি দূর করিবার নিমিত্ত যুগপৎ সর্ব্বত্র দর্শন দিল, কোন পরিচয় না পাইয়াও, কোন রহস্য উদ্ভেদ না করিয়াও সকলে বুঝিল, ইহা সেই দেবতা শম্ভুরামের কীর্ত্তি। সেই অদ্ভুতকর্ম্মা পরহিতব্রত-পরায়ণ মহাপুরুষ ব্যতীত আর কে এরূপে সকলের মনের ভাব বুঝিয়া সকল অভাব দূর করিতে পারে? যুবতী আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে লুকাইয়া শম্ভুরামের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল; বিপ্র যজ্ঞসূত্র-সংবলিত হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া ভগবানের নিকট শম্ভুরামের সুখ-শান্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে নারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া শম্ভুরামকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন; যুবকেরা সেই দেবচরিত মহাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবার কামনা করিতে থাকিলেন। শিশুরা সকল কথা না বুঝিয়াও "অমলাম থাকুল" বলিয়া জননীর অঞ্চল আকর্ষণ করিতে লাগিল।

চারিদিকে প্রাণের ভক্তি, শ্রদ্ধা, উল্লাস ও কৃতজ্ঞতা অদৃষ্ট শম্ভুরামের উদ্দেশে প্রবাহিত হইতে থাকিল। যখন দেশ এইরূপ আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, শম্ভুরাম তখন ধর্ম্মকাননে বলেন্দ্র সিংহের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "আপনার পিতৃদেব শেষ-শয্যায় শয়ান। এ সময় আপনাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে আমি পরামর্শ দিতেছি।"

বলেন্দ্র সিংহ বলিলেন, "কেন সহসা তাঁহার এ দশা হইল? আবার কি কেহ তাঁহার প্রতি বিষপ্রয়োগ করিয়াছে?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "না। এবার স্বাভাবিক কারণেই তাঁহার অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু সেই দিনের সেই ভয়ানক বিষপ্রয়োগ ব্যাপারই এত শীঘ্র তাঁহাকে মৃত্যুমুখে আনয়ন করিয়াছে। যাহাকে পরম প্রিয় বলিয়া তিনি জানিতেন, যাহাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেন, যাহার চক্রান্তে পড়িয়া দেবতাকে তিনি পরাভব করিয়াছেন, তাহার এইরূপ দুর্ব্যবহারে মহারাজের হৃদয়ে বড়ই গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। সেই আঘাতেই তাঁহার বার্দ্ধক্যগ্রস্ত বিকল দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।"

বলেন্দ্র সিংহ পিতার এইরূপ অবস্থার কথা শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা হইল যে, এ সময়ে তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিরক্ত পিতা হয় তো অতিশয় ক্লেশানুভব করিবেন, হয় তো তাঁহার শেষকাল আরও শীঘ্র উপস্থিত হইবে। এ অবস্থায় স্থির থাকা অসম্ভব, অথচ নিকটস্থ হইতেও ভয় হইতেছে। অপিচ, বীরেন্দ্র সিংহ হয় তো এই শোকের সময়ে ভ্রাতৃবিরোধের অনল জ্বালিয়া শেষ-শয্যাশায়িত পিতার হৃদয়কে দগ্ধ করিবে; রাজসংসারে নীরব শোকের পরিবর্ত্তে নিদারুণ ভীতি ও পাপের স্রোত প্রবাহিত করিবে।

শম্ভুরাম বলেন্দ্র সিংহের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আপনাকে মহারাজ দেখিবার প্রয়াসী। আপনি সম্মুখে উপস্থিত হইলে, মরণকালে তিনি শান্তি লাভ করিবেন। আপনি ইচ্ছা করিলে আপনার সহধর্ম্মিণীকেও সঙ্গে লইতে পারেন। এ অবস্থায় মহারাজ প্রসন্নচিত্তে দেবীকে পুত্রবধূরূপে স্বীকার করিবেন; আপনাদিগের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।"

বেলা দেড় প্রহরের সময় মহারাজা রুগ্নশয্যায় স্থিরভাবে পতিত রহিয়াছেন; পার্শ্বে অনেক মহিষী, উপপত্নী ও পরিচারিকা। বীরেন্দ্র সিংহ পিতার সম্মুখে আইসেন নাই; কিন্তু রাজ্য, সিংহাসন, সৈন্য, সেনাপতি, হয়, হস্তী সকলই তিনি অধিকার করিয়াছেন এবং তৎসমস্তের ব্যবস্থা লইয়া বিব্রত আছেন। পিতার মৃত্যু-সম্ভাবনায় তাঁহার উল্লাসের সীমা নাই। বৃদ্ধ মরণাপন্ন পিতা বীরেন্দ্রকে কোন আদেশ করিতে সাহস করিতেছেন না। তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে বলিয়া এখনও বিশ্বাস হইতেছে না, এখনও আশঙ্কা হইতেছে, হয় তো অসির আঘাতে তাঁহার [illegible] জীবনসূত্র ছিন্ন হইবে। পুত্র পিতার কোনই সন্ধান করিতে [illegible]। চিকিৎসা বা পথ্যাদির ব্যবস্থা হইতেছে না, কেবল নারী-[illegible] সেই মরণাপন্ন স্থবিরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

মহারাজা কাতর-স্বরে বলিলেন, "ছোটরাণি! সকলই গিয়াছে, [illegible] জীবন আছে; তাহাও আর অধিকক্ষণ থাকিবে না। এই সময়ে [illegible] যদি বলেন্দ্রকে দেখিতে পাইতাম, যদি তাহার সেই বধূকে [illegible] পাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় সুখী হইতাম। তাহার হাতের [illegible] জল মুখে পড়িলে বোধ হয়, আমার যন্ত্রণার শান্তি হইত।"

মহারাণী বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, কুপুত্রের কুচক্রে গুণবান্ সন্তানকে তাড়িত না করিলে, জীবন থাকিতে মহারাজার এই দুর্দ্দশা কথনই ঘটিত না। আজি যাহার হাতের জল পাইবার জন্য শেষাবস্থায় মহারাজকে ব্যাকুল হইতে হইয়াছে, সে প্রাণ দিয়া পরিচর্য্যা করিত। ক্ষণেক চিন্তার পর ছোটরাণী বলিলেন, "উপায় কি?"

মহারাজা নয়ন মুদিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন;—বলিলেন, "উপায় কি? পাষণ্ড হয় তো রীতিমত সৎকারও করিবে না। হয় তো যথাসময়ে পিণ্ডও দিবে না।"

মহারাণী বলিলেন, "যাহাই হউক, কোন সন্ধান জানিতে পারিলে, বলেন্দ্র সিংহকে সংবাদ পাঠাইতাম।"

মহারাজা বলিলেন, "কাজ নাই। হয় তো এথন এখানে আসিলে তাহার জীবনান্ত হইবে। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সে বাঁচিয়া থাকুক, সুখে থাকুক।"

মহারাণী বলিলেন,"বিপদ্ অনেক ঘটিতে পারে বটে,কিন্তু যাহাই কেন হউক না,এ অবস্থায় কোনরূপে সংবাদ পাইলে সে নিশ্চয়ই ছুটিয়া আসিত।"

দ্বারের বাহির হইতে শোকসংক্ষুব্ধস্বরে এক ব্যক্তি বলিল, "পিতা! অধম পুত্র আসিয়াছে; অবাধ্য সন্তান ক্ষমা ভিক্ষা করিতে চরণে উপস্থিত হইয়াছে। অনুমতি করুন, এই রোগ-শয্যায় আপনার চরণ সেবা করিয়া সে জন্ম সার্থক করুক।"

চারিদিকে জয়োল্লাস উঠিল; সকলে সানন্দে বলিয়া উঠিল, "যুবরাজ আসিয়াছেন," কেহ কেহ বলিল, "পশ্চাতে রাজবধূ আছেন।"

বৃদ্ধ মহারাজা ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিতান্ত দুর্ব্বলতা হেতু একটু ঘাড় তুলিতেও সাধ্য হইল না ;—বলিলেন, "আইস বলেন্দ্র, নিকটে আইস।"

তখন জলভারাকুল-নয়নে বলেন্দ্র সিংহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পিতৃচরণের ধূলা মস্তকে গ্রহণ করিয়া তিনি জননী প্রভৃতিকে প্রণাম করিলেন এবং পীড়িতের চরণ-সমীপে বসিয়া অধোমুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন ;—বলিলেন, "মা! রাজবৈদ্য আসে নাই কেন? ঔষধ দেওয়া হইতেছে না কেন? মহারাজ এ সময়ে যাহা খাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা সংগ্রহ করা হইতেছে না কেন?"

জননী বসনে বদন আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বলিলেন, "আর কিছুতেই প্রয়োজন নাই। এই শেষ-সময়ে তোমাকে দেখিতে পাইয়া শান্তিলাভ করিলাম ; শুনিতেছি, বধূমাতাও সঙ্গে আসিয়াছেন। রাণি! লক্ষ্মীকে নিকটে লইয়া আইস। আর আমার কিছুই নাই, আমি না বুঝিয়া তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়াছি ; শেষ আশীর্ব্বাদ তোমাদিগকে দিতেছি।"

তখন মহারাণী ও দুই জন পরিচারিকা অগ্রসর হইয়া দ্বারের অপর-পার্শ্ববর্ত্তিনী অবগুণ্ঠনবতী অহল্যা সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া মহারাজের সমীপে আনয়ন করিলেন। অহল্যার নয়নজলে গণ্ড ভাসিতেছে, কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি গুরুজনগণকে প্রণাম করিলেন।

মহারাজা বলিলেন, "মা! তুমি রাজলক্ষ্মী হইয়াও বনবাসিনী। শুনিয়াছি, তোমার ন্যায় ধর্ম্মশীলা নারী দেবলোকেও নাই। আর কি দিব মা, আমার সকলই গিয়াছে, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি অক্ষয় সুখের

অধিকারিণী হও। তোমরা বধূমাতার মুখ খুলিয়া দেও, আমি অন্তিম-কালে একবার মা লক্ষ্মীর শোভা দেখিতে চাহি।"

মহারাণী সাদরে অহল্যার অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন। রূপে সেই মৃত্যুর আলয়স্বরূপ কক্ষ সমুদ্ভাসিত হইল, সকলেই সেই শোভা দেখিয়া নিস্পন্দ হইল।

মহারাজা বলিলেন, "বলেন্দ্র সিংহ সত্যই দেবলোকের সঙ্গিনী পাই-য়াছে। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, উভয়েই একমন একপ্রাণ হইয়া চিরসুখী হও। কিন্তু বলেন্দ্র, আর না; ভগবান্ আমার প্রার্থনা পূরণ করিয়া-ছেন; শেষ-সময়ে তোমাদের দেখিতে পাইয়াছি। এখানে আমার মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করিয়া কাজ নাই। এখনই হয় তো সর্ব্বনাশ ঘটিবে।"

বলেন্দ্র বলিলেন, "কোন বিপদের ভয়ে আমি এখন আপনার চরণ ত্যাগ করিতে পারিব না।"

আর কথা বলা হইল না, তখন বাহির হইতে বীরেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "সাবধান, সর্ব্বত্র সাবধানে সৈন্যগণ অপেক্ষা কর। দুরাত্মা বলেন্দ্র যেন কোন দিক্ দিয়া পলাইতে না পারে। পলাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে। লছমন্! তুমি সাবধানে চারিদিকে দৃষ্টি রাখ; অহল্যাও আসিয়াছে, ধূর্ত্তা হরিণী আপনি জালে পড়িয়াছে।"

পীড়িত রাজা চমকিয়া উঠিলেন। দারুণ ত্রাসের একটা অস্ফুট ধ্বনি সকলের মুখ হইতে বাহির হইল। অহল্যা কাঁপিতে লাগিলেন; তৎ-ক্ষণাৎ বীরেন্দ্র সিংহ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ধূর্ত্ত

বলেন্দ্র! কেন মরিতে আসিয়াছ? ভাবিয়াছ, মরণাপন্ন রাজার চরণে কাঁদিলে রাজ্য পাইবে? রাজ্য এখন এই বৃদ্ধের নহে, আমি এখন মানভূমের মহারাজা। তোমাকে জীবিত অবস্থায় ফিরিতে হইবে না। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে আমার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে না। ভগবান্ তোমার দুর্ম্মতি ঘটাইয়া যথাসময়ে তোমাকে এখানে আনিয়াছেন।”

বলেন্দ্র সিংহ বলিলেন, “ভাই, আমি তোমার রাজ্য চাহি না, আমি তোমার ঐশ্বর্য্য চাহি না, আমি নীরবে আসিয়াছি, নীরবেই প্রস্থান করিব। কেবল পিতার জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত আমাকে কৃপা করিয়া এখানে থাকিতে দাও।”

মহারাজা বলিলেন, “বীরেন্দ্র! এই মৃত্যুকালে আমার শান্তি নষ্ট করিও না। রাজ্য ঐশ্বর্য্য তুমিই লইয়াছ, আমার মৃত্যু পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিতে তোমার বিলম্ব সহে নাই। কিন্তু সে জন্য বলিবার আর কোন কথা নাই; কেবল প্রার্থনা করি, এই মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে তুমি এই শেষসময়ে এ স্থানকে পাপপূর্ণ করিও না।”

বীরেন্দ্র বলিল, “তুমি মিথ্যাবাদী, তোমাকে বিশ্বাস নাই। তুমি একদিন সত্য-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আমাকে যুবরাজ করিয়াছ; সুতরাং তোমার অক্ষম অবস্থায় রাজ্যগ্রহণে আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার। তুমি সে কথা এখন ভুলিতেছ, অধম বলেন্দ্রের মিষ্ট কথায় তুমি নিজের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইতেছ। আমি বলেন্দ্রকে বধ করিব; অহল্যাকে উপপত্নী করিব।”

বলেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন;—বলিলেন, “সাবধান, তুমি আমাকে এখন শত অপমান কর, শত অস্ত্রাঘাতে আমাকে ছিন্নভিন্ন কর, আমি

নিশ্চেষ্ট থাকিব। পিতার এই অন্তিম-শয্যাপার্শ্বে আমি আত্মরক্ষার চেষ্টাও করিব না; কিন্তু সাবধান, তোমার পাপ-রসনা হইতে অহল্যার নাম উচ্চারিত হইলে কখনই নিস্তার পাইবে না।”

তখন বীরেন্দ্র বলিল, “ঐ অহঙ্কৃতা নারীর সর্ব্বনাশ অগ্রে হইবে। এখনই আমার রক্ষিগণ উহাকে আমার প্রমোদ-উদ্যানে লইয়া যাইবে।”

তখন কাঁপিতে কাঁপিতে অহল্যা রুগ্ন মহারাজের চরণতলে স্বামীর পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বীরেন্দ্র বলিল, “স্বামীর মৃত্যু সম্মুখে না দেখিলে তোমার বুঝি মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না?”

মহারাজা দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া বলিলেন, “নরাধম! পাপিষ্ঠ! আমার সম্মুখ হইতে দূর হ! এখনও আমি জীবিত। এ রাজ্যে এখনও আমার পূর্ণাধিকার; আমি মৃত্যুকালে বলিতেছি, আমার এই রাজ্যে সামান্য ভূখণ্ডেও তোর অধিকার থাকিবে না। তুই এই দণ্ডে আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা!”

হা হা শব্দে হাসিয়া বীরেন্দ্র সিংহ বলিল, “ভাবিয়াছিলাম, তোমার স্বাভাবিক মৃত্যুতে বাধা দিব না; কিন্তু সে সৌভাগ্য তোমার অদৃষ্টে নাই। অগ্রে তোমার প্রথম পুত্র বলেন্দ্রকে তোমার সম্মুখে নিপাতিত করি, অহল্যাকে প্রমোদকাননে প্রেরণ করি, তাহার পর তোমার ঐ জীর্ণদেহ হইতে প্রাণপক্ষী তাড়াইয়া দিব।”

তখন সেই উন্মাদ পশু আপনার জননী প্রভৃতির সম্মুখে অহল্যার হস্তধারণ করিতে উদ্যত হইল। তখন চারিদিক্ হইতে একটা ভয়ানক কোলাহল উপস্থিত হইল। বলেন্দ্র সিংহ পিতার চরণে মস্তক স্থাপন

করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! ধৈর্য্য দেও, পিতার এই শেষ-সময়ে যেন আমি কোন দুর্ব্ব্যবহারে বিচলিত না হই।"

বলেন্দ্র পিতৃচরণে মুখ লুকাইয়া রহিলেন; অহল্যা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। মহারাজা বলিলেন, "পাষণ্ড! নরকেও এরূপ পাপলীলা সম্ভবে না; আমি মরিতে বসিয়াছি, অন্তঃপুর নারী-পরিপূর্ণ, বলেন্দ্র অস্ত্রহীন, এ বিপত্তিকালে রক্ষার আর উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু বিশ্বনাথ কি পৃথিবী ছাড়িয়াছেন? ভবানী কি তোকে ভুলিয়াছেন! তোর এ পাপের কি দণ্ড হইবে না?"

তখন সবিস্ময়ে সকলে দেখিল, নরনারায়ণরূপী দুই বীর সেই গৃহমধ্যে নিঃশব্দে সমাগত। মহারাজা বলিলেন, "দেবতা আসিয়াছেন, পাপীর প্রার্থনা শুনিয়াছেন।"

কৃষ্ণার্জ্জুন সদৃশ সেই বীরদ্বয়ের একজন শম্ভুরাম, অপর জন রাঘব। শম্ভুরাম বলিলেন, "এই শোকক্ষেত্রে অস্ত্রাঘাত করিও না। দুরাত্মাকে বাঁধিয়া ফেল।"

সভয়ে বীরেন্দ্র দেখিল, একলম্ফে রাঘব আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। বীরেন্দ্র বুঝিল, সকল চেষ্টাই বৃথা;—বলিল, "সৈন্যেরা কোথায়?"

রাঘব বলিলেন, "সৈন্য ডাকিবার দিন তোমার ফুরাইয়াছে। তোমার পাপিষ্ঠ সঙ্গিগণ বাঁধা পড়িয়াছে; অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য মহারাজের আদেশ লইয়া বলেন্দ্র সিংহকে সিংহাসনে বসাইবার নিমিত্ত ক্ষেপিয়াছে। রাজ্যে তোমার বন্ধু নাই, যে দিক্ দিয়া তুমি যাইবে, সেই দিকে নর-নারী তোমাকে ধিক্কার দিবে। তুমি নীরবে আমার সহিত চলিয়া আইস।"

তখন অবহেলায় রাঘব সেই নির্ব্বাক্ দুর্ব্বৃত্তকে টানিয়া আনিলেন।

মহারাজা বলিলেন, "তোমাদের মঙ্গল হউক। এ রাজ্য বলেন্দ্র সিংহের হইল। শম্ভুরাম, তোমাকে ডাকাইত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, সে ভ্রম দূর হইয়াছে। বুঝিয়াছি, তোমার ন্যায় দেবতা বুঝি দেবলোকেও নাই। বলেন্দ্র ও অহল্যাকে তুমি রক্ষা করিয়াছ। তোমার হস্তেই ইহাদিগকে সমর্পণ করিলাম। আমার কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "যতক্ষণ আমার দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ আমি ধর্ম্মশীল বলেন্দ্র সিংহের হিত চিন্তা করিব। এ বিষাদের ক্ষেত্রে আমার ন্যায় অপরিচিত পুরুষের আর থাকা উচিত নয়। মহারাজ! আমি প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি।"

শম্ভুরামকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। সকলেই বুঝিল, মুমূর্ষু-কালে নানাবিধ উত্তেজনায় মহারাজের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া আসিয়াছে। তখন বলেন্দ্র সিংহ পিতার মস্তক-সন্নিধানে গমন করিয়া পবিত্র গঙ্গোদকে তাঁহার শুষ্ক রসনা সিক্ত করিতে লাগিলেন এবং উচ্চ-স্বরে তাঁহার কর্ণ-সমীপে হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অহল্যা শ্বশুরের চরণ অঙ্কে ধারণ করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। চারিদিকে রোদনের রোল উঠিল, সেই শোকোচ্ছ্বাসমধ্যে বর্ষীয়ান্ ভূপতির প্রাণবায়ু শূন্যে মিশিয়া গেল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্নকালে শম্ভুরামের ধর্ম্মকানন নিরতিশয় গ্রীষ্মে প্রতপ্ত হইয়াছে। বৃক্ষলতাদি স্পন্দহীনভাবে প্রখর সূর্য্যের জ্বালাময় কিরণমালা নীরবে বুক পাতিয়া ধারণ করিতেছে। ভগবান্ দণ্ড-সহিষ্ণুতা বড় প্রশংসনীয় গুণ বলিয়া যেন প্রচার করিতেছেন। এ সংসারে পাদপের ন্যায় দণ্ড-সহিষ্ণু আর কে আছে? নিদাঘের প্রখর তাপ, প্রাবৃটের অজস্রধারা, হিমানীর দুরন্ত শৈত্য এবং বসন্তের মারুত-হিল্লোল সকলই বনস্পতি অকাতরে সহিয়া আসিতেছে। প্রাকৃতিক কোন ব্যাপারই অনুকূলবোধে সাগ্রহে আলিঙ্গন অথবা অন্য কোন ব্যাপারকে প্রতিকূলবোধে উপেক্ষা করিতে তাহারা জানে না। বিরাটকায় তপস্বীর ন্যায় তাহারা সমভাবে নভস্তলে বসিয়া বিশ্বেশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। ছায়া ও আশ্রয়-দানে তাপক্লিষ্ট অথবা করকাকাতর জীবকে রক্ষা করিতেছে। প্রভঞ্জনের সহিত মিলিত হইয়া সুস্বনে বিভুর গুণগান করিতেছে। সুতরাং বৃক্ষ-রাজিকে দেখিলে পুরাণ-বর্ণিত যোগনিরত মহাপুরুষগণের কথাই মনে পড়ে। নদীতীরে নির্জ্জন প্রদেশে গম্ভীরদর্শন বটবৃক্ষকে দেখিয়া হৃদয়ে সত্যই শান্তিরসের আবির্ভাব হয়। শ্মশানমধ্যস্থ নির্ব্বিকার সমভাবাব-স্থিত অসংখ্য বৃক্ষকে দেখিয়া, জ্ঞানবৃদ্ধ সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ে; নির্জ্জন দেবালয়-সমীপস্থ শ্যামকায় বিশাল বকুলবৃক্ষ দর্শনে নিস্পন্দ-নিশ্চল বিহ্বল ভক্তের কথা মনে পড়ে; সুদূরব্যাপী প্রান্তরমধ্যস্থ একমাত্র

শ্যামকলেবর পাদপ দেখিয়া সর্ব্বত্যাগী সাধকের কথা মনে পড়ে। বৃক্ষ! এ সংসারে অধম মানবকে তুমি অনেক শিক্ষা দিতেছ।

আমরা বলিতেছিলাম, রবিকরতাপে ধর্ম্মকানন প্রপীড়িত, উপরে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড বসুন্ধরাকে অদৃশ্য অনলে দগ্ধ করিতেছেন। পার্শ্ব হইতে পঞ্চকোট পাহাড়ের উত্তপ্ত পাষাণপুঞ্জ তাপ-প্রবাহ উদ্গীরণ করিতেছে; সেই তাপে কাতর ধর্ম্মকাননস্থ প্রকৃতিপুঞ্জ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কুটীরাদির মধ্যে অথবা ঘন-পত্রপল্লব-সমাবৃত বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইয়া প্রচণ্ড তাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত উপায় অন্বেষণ করিতেছে; সেই অসহনীয় তাপের প্রখরতা উপেক্ষা করিয়া রঙ্গিলা ধর্ম্মকাননমধ্যস্থ দেবনিকেতনে আগমন করিয়া তত্রত্য ভগবতী-মূর্ত্তির অঙ্গে ব্যজন করিতেছেন। ব্যজনী নাই, কারণ, সাংসারিক কোন বিলাসসামগ্রী শম্ভুরাম ও রঙ্গিলার ছিল না, সন্নিহিত বৃক্ষনিচয় হইতে কতিপয় কিশলয় সংগ্রহ করিয়া রঙ্গিলা দেবীর দেহে সমীরসঞ্চালন করিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, যিনি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুবিপর্য্যয় যাঁহার আজ্ঞায় সংঘটিত হয়, সুখ-দুঃখ যাঁহার বাসনাধীন, স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব যাঁহার বাসনায় স্থিতিশীল, জন্ম-মৃত্যু কার্য্য-অকার্য্য সকলই যাঁহার শাসনাধীন, সেই সনাতনী আদ্যাশক্তি গ্রীষ্ম বা শীতে কখনই কাতর হইবার নহেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তেরা, তাঁহার দাসানুদাসেরা যে যে কারণে সুখ-দুঃখ অনুভব করে, সেই চিন্ময়ী পরাশক্তি সেই সেই কারণেই সন্তোষ বা নিরানন্দ অনুভব করিতেছেন, ইহা জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবা করাই বিধেয়। ভক্ত নিজের ভোগাভোগ ও সুখ-দুঃখের পরিমাণানুসারে ভগবানের পরিমাণ অনুধাবন করিয়া থাকে। সাধক স্বকীয় ভোগাভোগ ও

সুখ-দুঃখের পরিমাণানুসারে ভগবানের সেবার নিয়ম অবধারণ করে, এই জন্যই ভক্তিময়ী রঙ্গিলা এই অসহনীয় গ্রীষ্মের সময় একাকিনী সেই দেবস্থানে ভক্তিপরিপ্লুত-হৃদয়ে দাঁড়াইয়া দেবীর উদ্দেশে সঞ্চিত বৃক্ষপল্লব-সহায়ে বায়ু আন্দোলন করিতেছেন আর প্রার্থনা করিতেছেন;—

"কত দিন এইরূপে পৃথিবী পাপের ভার বহিবেন? এ ভার কমিবে না কি?—মা, বল, পৃথিবীর নত-মস্তক আবার উন্নত হইবে না কি? বল্ মা, তোর পুত্র তোর আদেশমত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে না কি?"

অনেকক্ষণ রঙ্গিলা কাতর-নয়নে দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পশ্চাৎ হইতে সেই জটাজুটধারী দীর্ঘকায় দেবসেবক বিপ্র বলিয়া উঠিলেন, "অবশ্য হইবে, অবশ্য পারিবে। যদি অধর্ম্ম এ পুণ্যকাননে প্রবেশ না করে, যদি ভোগবাসনা এই বীরগণের হৃদয় কলুষিত না করে, তাহা হইলে, মা রঙ্গিলা, ধর্ম্মের জয় অবশ্যই হইবে; তাহা হইলে, মা রঙ্গিলা, ভবানীর প্রিয়পুত্রের সকল সাধনা সফল হইবে; তাহা হইলে, মা রঙ্গিলা, ভবানীর আরাধনা সার্থক হইবে।"

রঙ্গিলা মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "দেবতা আসিয়াছেন? দাসের দাসী প্রণাম করিতেছে।"

দেবসেবক বলিলেন, "তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার কোন কথাই আমি জানি না; কারণ, ইহজগতে নারীর যাহা প্রার্থনীয়, তাহা সকলই তুমি পাইয়াছ; তোমার স্বামী মনুষ্যমধ্যে দেবতা। সকল বিষয়েই শম্ভুরাম অদ্বিতীয়, তোমার স্বামীভক্তির অনুরূপ দৃষ্টান্ত বসুন্ধরায় দেখি না। তোমার রূপ-গুণ সকলই দেববালার অনুরূপ, সর্ব্বোপরি মা রঙ্গিলা, তোমার শান্তি ও পরিতৃপ্তি দেববালারও অনুকরণীয়। মা, এই সকল

যাহার আছে, তাহার আর কি চাই? স্বর্গেও বোধ করি, একাধারে এত সৌভাগ্য কাহারও ঘটে নাই। তথাপি আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তোমার পতিপরায়ণতা অক্ষুন্ন থাকুক। তোমার সুখ-শান্তি অবিচ্ছিন্ন হউক।”

রঙ্গিলা বলিলেন, “অধর্ম্মের সম্মিলন না হইলে, স্বার্থপরতার তাড়না না ঘটিলে ধর্ম্মরাজ্যের উন্নতি অবশ্যই হইবে। তখন সফলতার চিত্র সম্মুখে দেখিয়া কেন না আনন্দিত হইব? দেবীর শাসিত, আপনার পরিরক্ষিত, গুরুর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্ম্মকাননে পাপের ছায়াও প্রবেশ করিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে ভগবন্! আবার জিজ্ঞাসিতেছি, কত দিনে ভবানীর পুত্র বসুন্ধরার আনন্দ দেখিয়া কৃতার্থতা লাভ করিবেন?”

দেবসেবক বলিলেন, “মা, কখন্ কি হইবে, কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে মা, আজি যে বিশ্বাসী ধার্ম্মিক-চূড়ামণি, কালি সে পাপ-প্রমত্ত পশু হইবে কি না? মনুষ্যমন বড়ই ক্ষণভঙ্গুর, ইহার দৃঢ়তা ও স্থিরত্বের উপর নির্ভর করিয়া যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, তাহার ফলাফল কে বলিতে পারে মা?”

রঙ্গিলা একটু চিন্তিতা হইলেন; বদন ভার করিয়া বলিলেন, “এ ধর্ম্মকাননের প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রই সুপরীক্ষিত, প্রত্যেকেই অগ্নি-পরীক্ষার পর এই স্থানে প্রবেশ করিয়াছে। এরূপ লোকদেরও আবার কখনও পতন হইতে পারে কি দেবতা?”

দেবসেবক বলিলেন, “মা, কাহাকেও বিশ্বাস করিতে আমি সাহস করি না। কাহার কথা বলিতেছি, আমি আপনাকে আপনি বিশ্বাস

করি না। রাঘবের ন্যায় ধর্ম্মরাজ্যের প্রধান স্তম্ভ একদিন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। কাহার কথা কে বলিতে পারে মা?"

রঙ্গিলা অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় রাঘব সেই স্থলে প্রবেশ করিলেন। নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, "রঙ্গিলা, তুমি এখানে? আমি কত স্থানে তোমাকে অন্বেষণ করিতেছি।"

রঙ্গিলা বলিলেন, "এই যে দাদা আসিয়াছ, আমরা তোমার কথাই কহিতেছিলাম। তোমার পরমায়ু বৃদ্ধি হইবে। আমাকে অন্বেষণ করিতেছিলে কেন দাদা?"

রাঘব বলিলেন, "অহল্যা সুন্দরী তোমাকে প্রণাম জানাইয়াছেন। তিনি তোমাকে একদিন রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় কি রঙ্গিলা?"

রঙ্গিলা বলিলেন, "এরূপ প্রশ্ন তো কখন শুনি নাই, আমার কি কোন অভিপ্রায় আছে দাদা? গুরু যদি আমাকে এখনই প্রাণত্যাগ করিতে বলেন, আমি তাহাই করিব। গুরুর ব্যবস্থায় আমি ভাল মন্দ বিচার না করিয়া কর্ম্ম করিতে বাধ্য। তুমি এতদিন পরে গুরুকে না জিজ্ঞাসা করিয়া আমার অভিপ্রায় জানিতে কেন ইচ্ছা করিতেছ দাদা?"

রাঘব বলিলেন, "তবে আইস, গুরুর সমক্ষেই কথা হইবে।"

যতক্ষণ রাঘব ও রঙ্গিলা কথা কহিতেছিলেন, ততক্ষণ দেবসেবক বিপ্র নিরন্তর রাঘবের মুখের প্রতি চাহিয়া ছিলেন। দেবী ও বিপ্রকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলে পর দেবসেবক বলিলেন, "মা, রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিতে তোর কি সাধ হইয়াছে? মা, এই ধর্ম্মের রাজ্য, এই

স্বার্থত্যাগের সংসার, এই পাপনিবারণের চেষ্টা কেন তুই ধ্বংস করিবি মা? পাষাণি! এমন শম্ভুরাম, এমন রঙ্গিলা, এমন রাঘব, এমন অদ্ভুত বীরগণ, সকলকেই কি তুই রসাতলে পাঠাইবি মা? সংসারে পাপের উদ্দাম নর্ত্তন চলিবে, অধর্ম্ম উল্লাসে ক্রীড়া করিতে থাকিবে, ক্রন্দনের হাহাকার রোলে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইবে, অত্যাচারীর পরুষ-আঘাতে সংসার জর্জ্জরিত হইতে থাকিবে, তাহা হইলে কি তুই সুখী হইবি [illegible] জানি না, ভবানি তোর মনে কি আছে?"

অনেকক্ষণ পরে দেবসেবক আবার ভবানীর পাদপদ্মে দৃষ্টিপাত করিলেন;—বলিলেন, "পাষাণ-দুহিতে! তোর রাঘব স্বর্গের দেবতা, সংসারে তাহার মত গুণান্বিত মনুষ্য আর কোথাও আছে কি [illegible] সেই রাঘবের হৃদয়ে তুই কামানল কেন জ্বালিলি? সে যে এই অনল নিবাইবার জন্য মা তোর চরণে লুটাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তুই তাহার হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলি না কেন? দেখিতেছিস্ না মা, বুঝিতেছিস্ না দয়াময়ি, এই অনলে সে আপনি পুড়িবে, সংসারকে পুড়াইবে। মা, মা, এই পুণ্যরাজ্য ধ্বংস করাই যদি তোর মনে ছিল, তবে এমন কাণ্ড— এত আয়োজন ঘটাইলি কেন পাষাণি?"

তখন সেই জটাজূটধারী বিপ্র সেই স্থানে মস্তক স্থাপন করিয়া অনেকক্ষণ দেবীর চরণে হৃদয়ের নির্ব্বাক্ যাতনা ঢালিয়া দিলেন।

এ দিকের ব্যাপারে অনেকক্ষণ আবদ্ধ না থাকিয়া আমরাও দেবীর চরণে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া রাঘব ও রঙ্গিলার অনুসরণ করিতেছি। পথিমধ্যে রাঘব জিজ্ঞাসিলেন, "রঙ্গিলা, তোমরা [illegible] কথা কহিতেছিলে, কি কথা কহিতেছিলে?"

রঙ্গিলা বলিলেন, "মনে কর, তোমার সুখ্যাতি করিতেছিলাম।"

রাঘব বলিলেন, "জানিতে ইচ্ছা নাই, অবিচলিত চিত্তে গুরুর আদেশপালন যাহার জীবনের ব্রত, সাংসারিক কোন সুখ্যাতিতে তাহার প্রয়োজন নাই।"

রঙ্গিলা বলিলেন, "মনে কর, তোমার নিন্দা করিতেছিলাম।"

রাঘব বলিলেন, "অসম্ভব নহে, কেবল ত্রুটি সংশোধন করিবার নিমিত্ত তাহা জানিবার প্রয়োজন হইতে পারে, অন্য কোন প্রয়োজন নাই।"

রঙ্গিলা বলিলেন, "আমরা বলিতেছিলাম, এই ধর্ম্ম-সংস্থাপন-চেষ্টায় কেবল পাপের সংস্পর্শ নষ্ট হইবে। মনুষ্য অবিশ্বাসী, এমন কি, দেবোপম দাদার চরিত্রও কলুষিত হওয়া অসম্ভব নহে।"

রাঘব শিহরিয়া উঠিলেন; মনে মনে বুঝিলেন, সত্যই রাঘব কলুষিত হইয়াছে। সত্যই রাঘব মনে মনে পাপের পঙ্কে ডুবিয়াছে। তবে কি ভবানি, তবে কি এই পাপ-নিবারণ-চেষ্টা এত দিনে ব্যর্থ হইবে? তবে কি সংসারের সকল আশা অনন্ত সমুদ্রে বিলীন হইবে? না—না, রাঘব প্রাণ দিবে, একটুও বিচলিত হইবে না।„

রঙ্গিলা বলিলেন, "আমার কথায় কি তোমার কষ্ট হইল দাদা? তোমাকে বিচলিত দেখিতেছি কেন? তুমি কথা কহিতেছ না কেন দাদা?"

রাঘব বলিলেন, "অসম্ভব নহে, সত্যই বলিয়াছ রঙ্গিলা, অসম্ভব নহে। মনুষ্য নরকের কীট, বিশেষ ইহাদের সত্য নাই, ধর্ম্ম নাই, বিশ্বাস নাই। সত্যই রঙ্গিলা. একদিন হয় তো এই বিশ্বাসী রাঘবও

পাপ-স্রোতে মজিয়া আমাদের সকল আয়োজন ধ্বংস করিতে পারে।"

তাহার পর রাঘব মনে মনে বলিলেন, "কখনই না,নিষ্পেষিত করিব, এই পাপ-কলুষিত হৃদয়কে চূর্ণ করিব, তথাপি লালসার প্রশ্রয় দিয়া গুরুর নিকট অবিশ্বাসী হইব না। ধর্ম্মরাজ্যের ক্ষয় করিব না, জগৎকে অন্ধকারে ডুবাইব না, পাপের রক্ত গায়ে মাখিয়া পিশাচের ন্যায় নীচ হইব না। রঙ্গিলা, কেন তুমি জ্বলন্ত রূপের শিখা লইয়া আমার নয়ন-সমক্ষে আসিলে? কেন ক্ষুদ্রপতঙ্গের ন্যায় রাঘব-পতঙ্গ সেই অনল দেখিয়া পুড়িয়া মরিতে ছুটিল? রঙ্গিলা, আমাকে অন্ধ করিয়া দাও, তোমার ঐ শোভা দেখিবার সামর্থ্য নষ্ট করিয়া দাও। যে দিকে তুমি থাক, সেখানে আমি থাকি না, যেখান হইতে তোমার মধুর স্বর শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানে আমি যাই না, যেখানে তোমার নাম আলোচিত হইতে পারে, সেখানে আমি যাই না। মা ভবানী জানেন, আমি হৃদয়ের সহিত কি যুদ্ধ করিতেছি। বুঝিবা যুদ্ধে আমাকে পরাজিত হইতে হয়, কিন্তু রাঘব অবিশ্বাসী হইতে পারিবে না। যদি ভবানী অন্তরে শান্তি না দেন, তবে হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া তাঁহারই চরণে ফেলিয়া দিব; তথাপি গুরুর নিকট কার্য্যে বা ব্যবহারে কদাচ অবিশ্বাসী হইব না।"

রঙ্গিলা বলিলেন, "তোমাকে কাতর ও ব্যাকুল দেখিতেছি কেন দাদা? আমার কথায় কি তুমি কষ্ট পাইয়াছ ভাই?"

অতি আদরে রঙ্গিলা আপনার সুকোমল হস্ত দ্বারা সেই তেজস্বী বীরের হস্ত ধারণ করিলেন। আর একদিন এইরূপে রঙ্গিলা রাঘবের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন। সেদিনকার মত আজিও রাঘবের আপাদ-

মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। রাঘব আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না, চিন্তার আগুনে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। শম্ভুরামের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া অবধি যে হৃদয় তিলেকের নিমিত্তও বিচলিত হয় নাই, সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে পাপ-চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে, চিন্তা-বিষে হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছে। সেই নির্জ্জন প্রদেশে রঙ্গিলা তাঁহার সঙ্গিনী; এক চক্ষে রঙ্গিলার রূপ দেখিতেছেন, আর এক চক্ষে অগ্নিকণা নির্গত হইতেছে। বিচঞ্চল চিত্তে তিনি চঞ্চলা চিন্তাকে মনোমধ্যে আনয়ন করিলেন; বুঝিলেন, পাপচিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অনন্তর তিনি রঙ্গিলার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না; মস্তক অবনত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "রঙ্গিলা, জানি না, কেন আমার শরীর অকস্মাৎ অবসন্ন হইয়া আসিল, আমি যেন দশদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি, আর আমি চলিতে পারিতেছি না। গুরুদেব তোমাকে স্মরণ করিয়াছিলেন, তুমি অগ্রগামিনী হও, আমি এইখানে একটু বসি।"

রাঘব সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন, রঙ্গিলার মন আকুল হইল; রাঘবের সুখে তিনি অন্তরে অন্তরে অপূর্ব্ব সুখানুভব করেন; রাঘবের কষ্টে তাঁহার অতিশয় কষ্ট অনুভূত হয়; রাঘব অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, ইহাতে তিনি অন্তরে অত্যন্ত বেদনা পাইলেন। গুরুদেব যাহা বলেন, রঙ্গিলা কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করেন না; রাঘব যাহা বলেন, অবিচলিত চিত্তে তাহাও তিনি পালন করেন। গুরুদেব আহ্বান করিয়াছেন, যাইতেই হইবে, রাঘব যাইতে বলিয়াছেন, যাইতেই হইবে, সুতরাং মৃদুস্বরে রাঘবকে তিনি বলিলেন, "দাদা! তবে তুমি এইখানেই একটু বিশ্রাম কর, সাবধানে থাক, আমি

স্বামী-সন্নিধানে চলিলাম, তোমার শরীর সুস্থ হইলে তুমি যাইও; নতুবা শীঘ্র আমিই এইখানে ফিরিয়া আসিতেছি।"

মন্থরপদে রঙ্গিলা গুরুসমীপে চলিলেন, যে স্থানে শম্ভুরাম, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন; চরণে প্রণত হইয়া, মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আমারে কি তুমি ডাকিয়াছ?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "হাঁ, প্রয়োজন আছে, তুমি বসো।"

রঙ্গিলা বসিলেন। মুখপানে চাহিয়া শম্ভুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন প্রকার চিন্তায় কি তুমি কাতর আছ? তোমার মুখখানি আজ এমন মলিন দেখিতেছি কেন রঙ্গিলা?"

রঙ্গিলা বলিলেন, "চিন্তার কোন প্রয়োজন আমার কখনও হয় নাই, এখনও কোন চিন্তাই আমার মনে আসিতেছে না।"

শম্ভুরাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রঙ্গিলা?"

রঙ্গিলা উত্তর করিলেন, "জীবনে মরণে যাহার সহিত আনন্দের অবসান হইবে না, আত্মার অস্তিত্বে যাহার পূর্ণ বিশ্বাস, পারলৌকিক মিলনে যাহার কোন সন্দেহ নাই, সে কেন চিন্তা-কলুষে যন্ত্রণা ভোগ করিবে? মৃত্যুভয়েও আমি কাতর হই না। আমি দেবতার দাসী, এখন মনুষ্যরূপী দেবতার সেবা করিতেছি, মরণের পর দিব্য-কলেবর-যুক্ত দিব্য পুরুষের সেবা করিয়া ধন্য হইব, ইহাতে চিন্তার কথা কোথায় আছে গুরু?"

রঙ্গিলার মুখে এরূপ কথা শম্ভুরাম কতদিন শুনিয়াছেন, ইহা অপেক্ষাও বহুগুণ দৃঢ়তার কথা, অপরিমেয় আসক্তির কথা, তুলনারহিত একপ্রাণতার অপূর্ব্ব কথা, স্বর্গীয় প্রেমবন্ধনের অমৃত কথা অনেকবার

শুনিয়াছেন। শম্ভুরাম জানিতেন, রঙ্গিলা বনবিহঙ্গিনী, কপটতা জানে না, মিথ্যা জানে না, প্রবঞ্চনা জানে না, সুতরাং সে কথা আর বাড়াইতে শম্ভুরামের ইচ্ছা হইল না ; তিনি সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাঘব কোথায় ?"

রঙ্গিলা উত্তর করিলেন, "দাদার কি হইয়াছে, বলিতে পারি না, সময়ে সময়ে দাদার কেমন অসুখ হয়, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোন পীড়ার কথা বলেন না, কিন্তু তাঁহার জন্য আমি বড় চিন্তিত হইয়াছি। তুমি দাদার অবস্থা দেখিয়া, যাহাতে তাঁহার আর অসুখ না হয়, তাহার উপায় করিয়া দাও।

শম্ভুরাম বলিলেন,"পীড়া ? অসুখ ? এ সকল কেন এখানে আসিবে ? এ ধর্ম্মারণ্যে কাহারও কোন রোগ নাই, কেবল পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিলে, নিরবচ্ছিন্ন কেবল ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিলে, একমনে ধর্ম্ম-সাধন ভিন্ন অন্য সকল কামনা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিলে মনুষ্যের কখনই রোগ হইতে পারে না। রাঘব দেবতা, তাঁহার শরীরে পাপের সংস্পর্শ মাত্র নাই, তবে কেন তাঁহার রোগ হইবে ? আমি রাঘবের সংবাদ লইতে যাইব ; যদি ইচ্ছা হয়, তুমিও আমার সঙ্গে আসিতে পার।"

রঙ্গিলা বলিলেন, "আমি যাইব না, তুমি দাদার মুখে তাঁহার অসুখের অবস্থা বিশেষ করিয়া জানিয়া আইস, আমি ততক্ষণ ফুল তুলি।"

শম্ভুরাম রাঘবের অন্বেষণে চলিলেন। রাঘব কোথায় ? রাঘব একাকী আপন কুটীরের সন্নিধানে স্থির হইয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। কিরূপ চিন্তা ?—তিনি ভাবিতেছেন, কি করিলাম ? কেন নরকের

যাতনা হৃদয়ে ধরিলাম ? কেন আমার মন এমন হইল ? আহা! সেই করস্পর্শ কি সুখময়! কেমন প্রাণ-মুগ্ধকর! বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলাম না! আপনি মজিলাম, সন্ন্যাসধর্ম্ম কলঙ্কিত করিলাম, আর তবে এ জীবন রাখি কেন ? যদি মনের গতি ফিরিল না, তবে এই পাপ মনের সহিত এই দেহ কেন ছাই করিয়া ফেলি না ?

রাঘব এই দুঃসহ যাতনার অনলকুণ্ডে পুড়িতেছেন, এমন সময় শম্ভুরাম সহসা তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিলেন ; গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তোমার না কি অসুখ হইয়াছে ভাই ? তুমি ধার্ম্মিক-চূড়ামণি. পাপ-রিপুর পরমবৈরী,—তোমার ন্যায় পুণ্যশীল, তেজস্বী বীরের দেহে রোগের কখনও স্থান হইতে পারে না ; তবে কেন তোমার অসুখ ?"

রাঘব একবার কাতর-নয়নে শম্ভুরামের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ;—বলিলেন, "কৈ, রোগ ত কিছু হয় নাই গুরু! তবে কি না, কিছু দিন হইতে সময়ে সময়ে মস্তিষ্ক একটু অবসন্ন হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন যন্ত্রণা অনুভব করি না।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "একটু সাবধান হইয়া থাক, যে সকল কার্য্য অধিক আয়াসসাধ্য, আপাততঃ সে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। চারিদিকে অনেক চর ফিরিতেছে, সকল প্রকার সংবাদ তোমার জানা আবশ্যক। কারণ,ধর্ম্মারণ্যের রক্ষার ভার তোমারই যত্নের উপর নির্ভর। প্রথমতঃ একটী সুসংবাদ বলি। যুবরাজ বলেন্দ্রসিংহ সস্ত্রীক পিতার আসন্নকালে মানভূমের রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখেই বৃদ্ধ মহারাজ জীবলীলা সংবরণ করিয়াছেন ; শেষনিশ্বাস বহির্গত হইবার পূর্ব্বে দুরাচার বীরেন্দ্রসিংহ তথায় উপস্থিত হইয়াছিল ; অগ্রজকে

হত্যা করিয়া, অহল্যাদেবীর সতীত্বনাশ করিয়া, মুমূর্ষু পিতার প্রাণনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। ভবানীর ইচ্ছায় আমি সেই সময় সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আমার আদেশে আমার অনুচরেরা সেই মহাপাপী বীরেন্দ্রসিংহকে বন্দী করিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান করিয়া ধর্ম্মানুরক্ত বলেন্দ্রসিংহ সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। অমাত্যবর্গ, সেনানীবর্গ ও সাধারণ প্রজাবর্গ পরম সন্তুষ্ট হইয়াছে। সকলেই এখন মহারাজ বলেন্দ্রসিংহের অনুগত ও আজ্ঞাকারী। কনিষ্ঠ সহোদর বন্দী অবস্থায় কারাগারে থাকে, দয়াশীল বলেন্দ্রসিংহ তাহা কষ্টকর বিবেচনা করিয়া দয়াবশে তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন। সহোদরের অনু-গ্রহে মুক্তিলাভ করিয়াও নীচাশয় বীরেন্দ্রসিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনিষ্ট-সাধনে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিল। ধর্ম্ম সেই পাপের প্রতিফল দিয়াছেন। আমি সংবাদ পাইলাম, বীরেন্দ্র একদিন একাকী রাজপথ দিয়া যাইতে-ছিল, উৎপীড়িত প্রজাদের সহিত তাহার কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, প্রজারা ক্রোধবশে তাহাকে হত্যা করিয়াছে।"

রাঘব বলিলেন, "মা ভবানীর ইচ্ছাতেই পাপী৷ ঐরূপ প্রতিফল হইয়াছে।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "মা ভবানীর ইচ্ছায় সমস্ত পাপী লোকের ঐরূপ সমুচিত প্রতিফল হইবে। মানভূমরাজ্য নিরাপদ্ হইয়াছে,রাজা বলেন্দ্রসিংহ রাজধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিয়া প্রজাপুঞ্জের চিত্তরঞ্জন করিতে-ছেন। অহল্যাদেবী সেই রাজ্যের মহারাণী হইয়াছেন, স্বামীকে সদুপ-দেশ-প্রদানে তাঁহার সবিশেষ ক্ষমতা আছে। পুরুষ মন্ত্রিগণ অপেক্ষা

রাজাকে মন্ত্রণা প্রদান করিতে তিনি বিশেষ নিপুণা। মানভূম প্রজাগণের কষ্টে আমি যে অননুভূত যন্ত্রণা অনুভব করিতাম, ভবানীর কৃপায় সে যন্ত্রণার অবসান হইল ; কিন্তু আর এক প্রবল শত্রু আমাদের বিপক্ষে খড়্গহস্ত হইয়া দণ্ডায়মান। বীরভূম জেলার পশ্চিম-প্রান্তের একখানি গণ্ডগ্রামের নাম নগর ; তুমি জান, সেই গ্রামে একজন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রাজা আছে, সেই রাজাকে লোকে নগরের রাজা বলিয়া জানে। সেই রাজা অনেকবার আমাদিগকে বিপাকে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা কোথায় থাকি, এত দিন সে তাহা জানিত না, সম্প্রতি সে আমাদের ধর্ম্মকাননের সন্ধান পাইয়াছে, এবং আমাদিগকে নির্ম্মূল করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছে। শুনিতেছি, আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সেই রাজা বিংশতি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, আমাদিগকে ধ্বংস করা তাহার দৃঢ়-সঙ্কল্প।"

রাঘব বলিলেন, "ভবানীর যদি তাহাই ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে নগরের রাজার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে পারিবে। আমাদিগকে ধ্বংস করা যদি ভবানীর মনে থাকে, তবে সে ধ্বংস অনিবার্য্য ; নতুবা কোন পরাক্রান্ত দুষ্ট লোক সম্মুখ-সমরে আমাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না। আমাদের পক্ষে এখন কিরূপ আয়োজন করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আপনি কিরূপ স্থির করিয়াছেন, তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "আমি এখনও কিছুই স্থির করি নাই। তোমার গুপ্তচরেরা সর্ব্বত্রগামী, তাহারা শীঘ্রই আরও বিশেষ সংবাদ আনিয়া দিবে ; তাহাদের মুখের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, যেরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত

'চনা হয়, তুমিই তাহা করিও। এখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ...প ভবানীর আরতি দেখিতে যাইতেছি, তুমি এখন এই স্থানেই বিশ্রা- কর।"

শম্ভুরাম প্রস্থান করিলেন। রাঘব ভাবিতে লাগিলেন, পাপ প্রবেশ করিয়াছে, রোগ হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে আমি কদাচ গুরুদেবের নিকট অবিশ্বাসী হইব না। আমি ক্ষুদ্র,—অতি ক্ষুদ্র, আমার তুল্য ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা গুরুদেবের কোন অনিষ্ট হইতে পারিবে না। ইহ-সংসারের মনুষ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবুদ্‌বুদ সদৃশ; এই রাঘবও একটী ক্ষুদ্র জলবুদ্‌বুদ, এই বুদ্‌বুদ অচিরে জলে মিশিয়া যাইবে। জলবিম্ব জলে মিশিলে গুরুদেবের ধর্ম্মরাজ্যের কোম অপচয় হইবে না। আমার অস্তিত্ব আমি লোপ করিয়া দিব, তথাপি গুরুদেবের নিকটে অবিশ্বাসী হইতে পারিব না। রাঘবের অস্তিত্ব-বিলোপে মহাপুরুষের ধর্ম্মরাজ্যের একটি কণিকামাত্রও ধ্বংস হইবে না।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাঘব কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইল। পরিতপ্ত হৃদয়ে ভাবনার শেষ হয় না; রাঘব আবার ভাবিতে লাগিলেন, হাঁ তাহাই করিব, এই সঙ্কল্পই ঠিক; আমার অস্তিত্ব আমি লোপ করিয়া দিব; পাপ করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত করিব।

সন্ধ্যা হইল; চারিদিক অন্ধকারে আবৃত; আকাশে নক্ষত্রমালা দেখা দিল; বিষণ্ণ-নয়নে আকাশপানে চাহিতে চাহিতে রাঘব আপন কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রায় একমাস বিগত। আবার অমাবস্যা আগত। বেলা অবসান। স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া, প্রকৃতিকে স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেব দিবাকর অস্তাচলে গমন করিতেছেন, ধর্ম্মারণ্যের বিহঙ্গকুল রজনী-প্রভাতে আহার অন্বেষণে দিগ্‌দিগন্তে উড়িয়া গিয়াছিল, সূর্য্যের তরুণছটা দর্শন করিয়া স্ব স্ব কুলায়ে ফিরিয়া আসিতেছে; তরুশিরে কলরব করিয়া ক্ষুধার্ত্ত শাবকগণের চঞ্চুপুটে চঞ্চুপুট স্থাপন করিয়া সমাহৃত আহার-কণিকা প্রদান করিতেছে, দূরে দূরে শ্রমজীবিগণ দিবাভাগের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া স্ব স্ব আলয়াভিমুখে ফিরিয়া যাইতেছে; সান্ধ্য-সমীরণ মৃদু নিস্বনে হিল্লোলিত হইয়া তরুপত্র আন্দোলিত করিতেছে, সময় অতি রমণীয়!

রাঘব আপন কুটীরে যাইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। বনপথে রঙ্গিলাকে সহচারিণী করিয়া রঙ্গিলার উদ্দেশে তিনি আপন মনে বলিয়াছিলেন, "রঙ্গিলা! তুমি যেখানে থাক, সেখানে আমি যাই না, যেখানে থাকিলে তোমার মধুর স্বর শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানে আমি থাকি না; যেখানে তোমার প্রসঙ্গ হয়, সেখান হইতে আমি দূরে প্রস্থান করি।

ঐগুলি রাঘবের কল্পনার কথা। গুরুদেবের আদেশে রাঘব প্রায়ই রঙ্গিলার সহিত কথা কহিতেন, রঙ্গিলার নিকটে গিয়া বসিতেন,

ধর্ম্মের কথা লইয়া রঙ্গিলার সহিত তর্কবিতর্ক করিতেন, সময়ে সময়ে গুরুদেবের আজ্ঞা বিজ্ঞাপন করিতেন; সকলই ছিল, কেবল দূষণীয় বিষয় এই যে, রঙ্গিলা তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তিনি শিহরিয়া উঠিতেন, দুইবার তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। কল্পনায় যাহা তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাহা হয় ত তাঁহার অন্তর্গত ভাব; রঙ্গিলার নিকটে যাইতে, বসিতে, তাঁহার সহিত কথা কহিতে হয় ত তাঁহার মনোগত ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পার্থিব প্রেমদাস চঞ্চল মানব; রাঘব মানব; অনিবার্য্য অনুরাগ জোর করিয়া তাঁহাকে সেই পথে টানিয়া লইয়া যাইত। এখন তাঁহার সেই মানসিক কল্পনা প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এখন আর তিনি কোন ছলে কোন অনুরোধে কোন প্রয়োজনে রঙ্গিলার নিকটে গমন করেন না, রঙ্গিলার বদন দর্শন করেন না, রঙ্গিলার যে মধুর [illegible] শ্রবণে তাঁহার কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইত, তাঁহার কর্ণ এখন সেই অমৃত-ধারায় অভিসিঞ্চিত হয় না। সবিশেষ সংযমে, সবিশেষ সাবধানে মনোবেগ সংবরণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ তিনি এখন তফাতে থাকিতে যত্ন করেন। গুরুদেবের নিকটে যখন থাকেন, তখন তাঁহার মুখের ভাব অন্য প্রকার হয়। শম্ভুরামের চরিত্র দেবোপম হইলেও তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন; রাঘবের মনে যে কোন প্রকার গ্লানি আছে, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারেন না।

প্রদোষের ধূসরবর্ণ বনভূমিতে [illegible]রিব্যাপ্ত হইল। বাহিরের অল্প অল্প আলোকপ্রভা দৃশ্য হইতেছিল, কিন্তু ধর্ম্মারণ্য প্রায় অন্ধকার। আকাশমণ্ডলের নীলোদ্যানে নক্ষত্র-ফুল ফুটিল; অমাবস্যা-রজনী, চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, তথাপি সুন্দরী তারামালা বিরহ-

মলিনা না হইয়া সমুজ্জ্বল শোভায় মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল, প্রেমের নয়নে প্রকৃতির এই দৃশ্য অতি সুন্দর।

গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে শম্ভুরাম একাকী দেবীর মন্দিরে গমন করিতেছেন। সঙ্কট উপস্থিত হইলেও তাঁহার প্রশান্ত বদন কদাচ চিন্তাকালিমায় সমঙ্কিত হয় না; তাঁহার অটল হৃদয় কিছুতে বিহ্বল হয় না; বদন গম্ভীর অথচ প্রফুল্ল। কোন অপরিচিত লোক তাঁহাকে দেখিলে যথার্থই শম্ভু সদৃশ শান্তমূর্ত্তি বিবেচনা করে। শম্ভুরাম যাইতেছেন,বামে দক্ষিণে কোন দিকে দৃষ্টি নাই; নয়ন অচঞ্চল, মধ্যে মধ্যে এক একবার আকাশপট নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়পটে প্রকৃতি প্রতিমা চিত্র করিতেছেন, সহসা এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার দুই পায়ে জড়াইয়া ধরিল। শম্ভুরাম একটু চমকিয়া উঠিলেন। লোকটী কে,জানিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহাকে উত্থিত হইবার আদেশ করিলেন। লোক কুঞ্চিত-কলেবরে উঠিয়া করযোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইল। প্রদোষকাল হইলেও বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া শম্ভুরাম দেখি-লেন, বংশীবদন।

গম্ভীরস্বরে শম্ভুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বংশীবদন, অকস্মাৎ এ সময়ে এখানে তোমার কি প্রয়োজন?"

অশ্রুপ্লাবিত-নয়নে বংশীবদন উত্তর করিল, "প্রভু, আমার সংসারে আগুন লাগিয়াছে! সেই আগুনের তেজে আমি দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছি।"

শম্ভুরাম বলিলেন,"বুঝিয়াছি; ঐরূপ হইবে,তাহা আমি জানিতাম। তুমি এইখানে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর; আমি ভবানীর মন্দিরে যাই-

তেছি, তোমার সকল কথা শুনিবার এখন সময় নাই, দেবীকে প্রণাম করিয়া শীঘ্রই আমি ফিরিয়া আসিতেছি; আসিয়াই তোমার সকল কথা শুনিব।"

বংশীবদন আরও কি বলিবার উপক্রম করিতেছিল, বলিবার অবসর না দিয়াই শম্ভুরাম দ্রুতপদে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বংশী-বদন সেইখানে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে শম্ভুরাম ফিরিয়া আসিলেন। বংশীবদন ভক্তিভাবে প্রণাম করিল; কুটীরে প্রবেশ না করিয়া শম্ভুরাম সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন, বংশীকে বসিতে বলিলেন; বংশী কিন্তু বসিল না, নমভাবে দাঁড়াইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। শম্ভুরাম বলিলেন, "তোমার সংসারের দুইটী কণ্টক আমি দূর করিয়া দিয়াছি, তবে আবার অগ্নি জ্বলিয়াছে, ইহার কারণ?"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বংশীবদন বলিল, "আমি মহাপাপী, নিয়ত পরদারে রত ছিলাম; সেই পাপ প্রবৃত্তির পরিপোষণার্থ আরও অনেক প্রকার ভয়ানক ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম সাধন করিয়াছি,আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। নররূপে আপনি সাক্ষাৎ দেবতা; আপনি দয়া করিয়া অনুকূল হইয়া-ছেন, দুর্ভাগ্যের উপর আমার সৌভাগ্যের উদয়। আমি যখন—"

অসম্পূর্ণ বাক্যে বাধা দিয়া শম্ভুরাম বলিলেন,"অতীত বৃত্তান্ত শুনিয়া সময় নষ্ট করিতে আমার ইচ্ছা হয় না; বর্ত্তমানে তোমার কি কষ্ট উপস্থিত, সংক্ষেপে তাহাই বলিয়া যাও।"

বংশীবদন বলিল, "পাপানল আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে, পাপ আমার কণ্ঠরোধ করিতেছে; ঘৃণা আসিয়া সেই পাপের সহকারিণী

হইতেছে, সে সকল ঘৃণার কথা আপনার নিকটে নিবেদন করিতে আমি একপ্রকার অক্ষম হইতেছি। আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, লজ্জায় ঘৃণায় জলাঞ্জলি দিয়া তখন অবশ্যই বলিতে হইবে। পরিবারের মধ্যে যাহাদিগকে আমি অকপটে বিশ্বাস করিতাম, যাহাদিগকে আমি বন্ধু বলিয়া জানিতাম, চক্ষের সাক্ষাতে কপটে যাহারা আমাকে ভয় করিত, এখন বুঝিতেছি, তাহারাই আমার প্রবল শত্রু। দেব! আপনি শুনিয়াছেন, আমার তিনটী স্ত্রী, তিনটী ভগ্নী। একটা স্ত্রী ও একটা ভগ্নীর দারুণ পাপাভিনয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া খড়্গাঘাতে আমি তাহাদের প্রাণবিনাশে উদ্যত হইয়াছিলাম, দেবরূপে আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া বাধা দিয়াছিলেন, স্ত্রীহত্যা পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই দুই কণ্টকীলতা আপনি উৎপাটন করিয়াছেন; আমি প্রথম ভাবিয়াছিলাম, হয় ত নিষ্কণ্টক হইলাম; কিন্তু এখন দেখিতেছি, চারিদিকে আগুন। হায়, হায়! পরদারাসক্তিতে আমি উন্মত্ত হইয়াছিলাম। পাপক্রিয়াতে মত্ত হইয়া একপ্রকার অন্ধ হইয়াছিলাম, নিজের সংসারে কি হইতেছে, কিছুই জানিতাম না, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতাম না। দৈবযোগে দুই পিশাচীর বিশ্বাসঘাতকতা আমার চক্ষে পড়িয়াছিল, তদবধি আমি গুপ্তচরের কার্য্য করিতে শিখিয়াছি, আমার প্রথমা স্ত্রী তিন পুত্রের ও পাঁচ কন্যার জননী, তাহার রূপের নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে; তথাপি তাহার দুষ্ক্রিয়ার অন্ত নাই। দুটী কন্যার বিবাহ হইয়াছে; দুই জামাইকে আমি ঘরজামাই করিয়া রাখিয়াছি। কন্যাদুটী অল্পবয়স্কা। একটী জামাইয়ের সহিত আমার এক ভগ্নীর পাপাভিনয় হয়, আমার প্রথমা স্ত্রী তাহাতে সহায়তা করে। আর এক ভগ্নী গোপনে

গোপনে অন্যলোকের গুপ্ত কুঞ্জে নিশাযাপন করে। আমি যদি পূর্ব্ববৎ অন্ধ থাকিতাম,তাহা হইলে সংসারে সকলেই ঐরূপ পাপাভিনয় করিয়া সংসারসাগরে পাপের স্রোতে ভাসিত।"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বংশীবদন আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,"গুরুদেব, আর আমি গৃহে যাইব না। গৃহে আমার শান্তি নাই,শান্তি কখনও পাইব,সে আশাও নাই। আপনি দয়া করিয়া আমার এক ভগ্নী এবং এক পত্নীকে নির্ব্বাসিতা করিয়াছেন, বাকী যাহারা আছে, তাহারাও আমাকে অহরহঃ দগ্ধ করিতেছে। আমার পুত্রের জননী—জ্যেষ্ঠা পত্নী ব্যভিচারিণী; অপরা দুই ভগ্নী মহা পাপপঙ্কে নিমগ্ন; যাহারা ছোট ছোট আছে,সতত পাপের দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহারাও পাপপঙ্কে ডুবিবে সন্দেহ নাই। আর আমি গৃহে যাইব না। আমার রাণীগঞ্জে ভদ্রাসন, ভূমিসম্পত্তি, সঞ্চিত ধনদৌলত সমস্তই আপনি গ্রহণ করুন, আপনার হস্তে প্রচুর ধন অর্পিত থাকিলে, স্বর্গের শিশিরের ন্যায় সর্ব্বত্র সৎকার্য্যে পরিবর্ষিত হইবে। আমার ধন পাপার্জ্জিত হইলেও সৎকার্য্যে জগতের উপকারে আসিবে। আমি মনে করিয়াছিলাম, আত্মহত্যা করিব; কিন্তু গত রাত্রে আবার ভাবিয়াছি, সংসারে আমার পাপের অন্ত নাই, তাহার উপর আত্মহত্যা-মহাপাপে লিপ্ত হইলে অনন্তকাল আমাকে নরকবাস করিতে হইবে, আত্মবিনাশ করিব না। সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বনবাসী হইব; কোথায় কোন্ বনে যাইব, কেহই তাহা জানিবে না।"

বিশেষ মনোযোগের সহিত পাপী, অনুতাপীর সমস্ত অনুতাপবাক্য শ্রবণ করিয়া শম্ভুরাম বলিলেন, "না বংশীবদন, গৃহ ত্যাগ করিও না।

পূর্ব্বে তোমাকে আমি বলিয়াছি, তোমার কনিষ্ঠা পত্নী মন্দাকিনী পৃথিবীতে দেবীরূপিণী; তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলে মন্দাকিনী কদাচ প্রাণে বাঁচিবে না; অজ্ঞানে পৃথিবীতে তুমি অনেক পাপ করিয়াছ, তাহার উপর সজ্ঞানে সাধ্বী সতী পতিব্রতা পরিণীতা-পত্নী বর্জ্জন, তাহার মৃত্যুর কারণ, এই দুই পাপ করিলে তোমাকে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল নিরয়গামী হইতে হইবে। ভবানীর নামে আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি গৃহে যাও, পতিব্রতা পত্নীতে ধর্ম্মানুসারে রত থাকিয়া, পাপ-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, সাবধানে ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে থাক, পরিণামে মঙ্গল হইবে, অশান্তির পীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইয়া ক্রমে ক্রমে শান্তিলাভ করিতে পারিবে।"

বংশীবদন বলিল, "দেব! তাহা আমি পারিব না, শান্তি আমি পাইব না। পরদারপাপে মত্ত হইয়া আমি বহুলোকের কুল মজাইয়াছি, সেই পাপে আমার নিজের কুল মজিয়া গিয়াছে। আমার ন্যায় অধম পাপাত্মার শান্তি কোথায়? আমি জানিতাম, মন্দাকিনী সতী;—জানিতাম, কিন্তু সময়ে সময়ে কেমন এক প্রকার সংশয় আসিয়া আমার চিত্তকে কলুষিত করিত; সংশয় আপনি আসিত না, আমার পরিবারের কলঙ্কিনীরা মন্দাকিনীর নামে কলঙ্ক রটাইয়া আমার কর্ণে বিষবর্ষণ করিত; তাহারা যাহাদিগকে লইয়া পাপ-সাগরে সাঁতার দিত, তাহাদিগকেও মন্দাকিনীর ধর্ম্মনাশ করিবার পরামর্শ দিতে ছাড়িত থাকিত না। যে রাত্রে আপনি আমাকে তীক্ষ্ণধার খড়্গহস্তে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই রাত্রে আমি স্বকর্ণে সেই পাপ-পরামর্শ শ্রবণ করিয়াছি। কলঙ্কিনীদের কলঙ্ক-নায়ক যাহারা, আমি তাহাদের সকলের

নাম জানি না, শুনিয়াছি, তাহাদের মধ্যে একজন রামচন্দ্র। সেই রামচন্দ্র গ্রাম-সম্পর্কে আমার ভাই হয়; সেই পাপিষ্ঠ আমার নন্দকিনোকে হরণ করিবার পরামর্শ করিয়াছিল। কত প্রকার পাপাগ্নিতে আমি দগ্ধ হইতেছি, তাহার পরিচয় দিতে পারি না; সেই জন্য ভাবিতেছি, আমি গৃহত্যাগী হইয়া বনবাসী হইব।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "ও সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। তুমি বুঝিতেছ না, ও সঙ্কল্প পাপ-সঙ্কল্প। ধর্ম্মশীলা সহধর্ম্মিণীকে কাঁদাইয়া এ সংসারে কেহ কখন সুখী হইতে পারে নাই। গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠাশ্রম, সে আশ্রম তুমি ত্যাগ করিয়া যাইও না, যাহাদিগকে তুমি পাপী বলিয়া জানিতে পারিয়াছ, যাহাদিগকে পাপী বলিয়া সন্দেহ করিতেছ, সপ্তাহের মধ্যে তাহাদিগকে আমি বঙ্গভূমির সীমা হইতে তফাৎ করিয়া দিব; তুমি অথবা তোমার তুল্য আর কেহ ইহজন্মে আর তাহাদের সন্ধান পাইবে না। আমি এই ধর্ম্মারণ্যে বাস করি, কিন্তু এই স্থানেই আমার জীবনব্রত সীমাবদ্ধ নহে; ভারতবর্ষের নানা স্থানে আমার ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম আছে, পবিত্রতাপরায়ণ সাধুজনেরা সেই সকল আশ্রমের রক্ষক; তাঁহাদের মধ্যে অনেকগুলি স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহারাও নিয়মিত ব্রতচারিণী, যে সকল পাপীয়সী রমণীকে আমি তাঁহাদের নিকটে প্রেরণ করি, উপদেশ প্রদান করিয়া, সৎকার্য্য শিক্ষা দিয়া তাঁহারা সেই পাপিনীগণকে সৎপথে আনিবার যত্ন করেন; তোমার কোন চিন্তা নাই। পবিত্র আশ্রমে যাহারা থাকিবে, তাহাদের উপযুক্ত ভরণ-পোষণের নিমিত্ত আমি উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিব। তোমার ধনসম্পত্তি আমি অধিকার করিতে চাহি না; তোমার

সম্পত্তি তোমার থাকুক, মন্দাকিনীকে লইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্তানগুলি লইয়া তুমি স্বচ্ছন্দে গৃহবাসী হইয়া থাক।"

বংশীবদন সে কথায় তখন আর কোন উত্তর দিতে পারিল না, মস্তক অবনত করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। শম্ভুরাম পুনরায় বলিলেন, "তুমি গৃহে যাও, আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিলাম, অবশ্য তাহা পালন করিব। এখন আর আমি তোমার সহিত অধিক বাদানুবাদ করিতে পারিতেছি না, ধর্ম্মারণ্যের অনেক কার্য্য আমাকে মুহুর্ম্মুহু আহ্বান করিতেছে, ভবানীর আদেশে পরিত্যক্ত ব্যক্তিগণকে শান্তি-সলিলে স্নান করাইয়া তাহাদিগের জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারণ করা আমার কার্য্য। তুমি যেমন একজন, এরূপ আরও অনেক পরিতাপী আছে; তাহাদিগকে দর্শন করিতে হইবে, আরও এ রাজ্যে যে সকল প্রবল-প্রতাপ দুষ্ট লোক সর্ব্বদা দুর্ব্বলের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেছে, তাহাদিগকে দমন করিবার উপায় করিতে হইবে। আমি এখন কার্য্যান্তরে চলিলাম, তুমি বিদায় হও। যদি ইচ্ছা হয়, সময়ে সময়ে এই পুণ্যাশ্রমে আসিয়া আমার মুখে সাংসারিক তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিও। কলুষনাশিনী জগৎ-জননী ভবানীদেবীর পাদপদ্ম দর্শন করিও, তোমার মনের চাঞ্চল্য বিদূরিত হইবে, শান্তিদেবী তোমার প্রতি কৃপা করিবেন।"

নীরবে শম্ভুরামের চরণে প্রণাম করিয়া বংশীবদন সে রাত্রে বিদায় গ্রহণ করিল।

এক সপ্তাহ অতীত। বংশীবদনের নিকটে শম্ভুরাম যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিয়াছেন। বংশীবদনের সংসারের কুল-কলঙ্কিনীগণকে ভারতের অপর প্রান্তে ভিন্ন আশ্রমে প্রেরণ করিয়া

ছেন, দুরাচার রামচন্দ্র পলায়ন করিয়াছে, কণ্টক-কাননের কণ্টকী-লতা উৎপাটিত হইয়াছে; বংশীবদনের শান্তির বিষম কণ্টক স্থান-চ্যুত হইয়াছে।

কতক ইচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায়, কতক প্রবোধে, কতক অনুরোধে, বংশীবদন গৃহবাসী হইল, সতী মন্দাকিনী পরম পরিতুষ্টচিত্তে পতিসেবা করিয়া অনেক দিনের পর সংসারসুখে সুখানুভব করিতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার পর দুই মাস অতিবাহিত। পৌষমাসের শেষ দিন, মকর-সংক্রান্তি। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব গোস্বামীর তিরোভাবের মেলা। স্থানীয় লোকেরা কেন্দুবিল্ব গ্রামকে কেন্দুলী বলিয়া প্রচার করে, সেই নামানুসারে ঐ মেলার নাম কেন্দু-লীর মেলা। দেশের নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী সমাগত হয়, পক্ষাধিক কাল মেলা জনতা-পূর্ণ থাকে।

কেন্দুলীর মেলার সময় ধর্ম্মারণ্যের কতিপয় অনুচর কেন্দুলী গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা শুনিয়া আসিল যে, নগরের রাজা অতি অল্পদিনের মধ্যে ধর্ম্মারণ্য ধ্বংস করিবে, সশিষ্য সানুচর শম্ভুরামকে নিপাত করিবে, সহস্র সহস্র সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শিবির-স্থাপন করিয়া সমরের আয়োজন করিতেছে, ধর্ম্মারণ্যের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রায় সমস্ত লোক মেলা দেখিতে গিয়াছে, অরণ্য আক্রমণ করিবার ইহাই সুসময়। শম্ভুরামের যে সকল অনুচর মেলা-স্থলে উপ-স্থিত হইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া শম্ভুরামকে ঐ সংবাদ দিল। শম্ভুরাম যুদ্ধবিগ্রহ ভালবাসেন না, কিন্তু অপর কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করিতে বিরত থাকেন না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পাঠকমহাশয়েরা তাহা অবগত হইয়াছেন। সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তিনি স্থানে স্থানে চর প্রেরণ করিলেন। রাঘবকে

আহ্বান করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তত থাকিবার অনুমতি দিলেন, নগরের রাজা ধর্ম্মারণ্য আক্রমণ করিবে শুনিয়াই তিনি রাঘবকে এ সংবাদ দিয়াছিলেন, মনোবেদনায় অস্থির থাকিলেও রাঘব তদর্থ উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে অপ্রস্তত ছিলেন না। শম্ভুরাম নিজেও তাদৃশ সঙ্কটে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তত।

বিলম্ব হইল না, চরেরা ফিরিয়া আসিয়া নিবেদন করিল, বিপক্ষ-সৈন্য কিঞ্চিৎ দূরে দূরে প্রচ্ছন্নভাবে দলবদ্ধ। তাহাদের যে সব পরামর্শ, তাহাতে এমন বোধ হয় না যে, তাহারা ধর্ম্মকাননে প্রবেশ করিয়া সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, কাননের অর্দ্ধক্রোশ দূরে যে প্রশস্ত ময়দান, সেই ময়দানকে রণক্ষেত্ররূপে অধিকার করা তাহাদের অভিপ্রেত।

শম্ভুরাম অনেক বিবেচনা করিলেন, রণক্ষেত্রের কথা তাঁহার ভাল লাগিল না; তথাপি তিনি আপন সৈন্যগণকে বলিয়া দিলেন, তাহারা সর্ব্বদা যেন সশস্ত্র হইয়া সাবধানে দেবী-মন্দির ও আশ্রমের চতুঃসীমা রক্ষা করে।

সৈন্যগণ সর্ব্বদাই তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী, আজ্ঞা প্রাপ্ত না হইলেও তাহারা সতর্কতা পরিহার করে না; আশ্রমের সীমা রক্ষা করিতে তাহারা উত্তরদিকে চলিয়া গেল। শম্ভুরাম নিশ্চিন্ত রহিলেন না, কখনই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন না; তাঁহার মস্তকে গুরুতর কার্য্য বিস্তর; ভবানীর পূজা, ভবানীমন্দিরের তত্ত্বাবধান, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, রঙ্গিলার তুষ্টিবিধান এবং অপরাপর অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্যকার্য্যে সর্ব্বদাই তিনি যত্নবান্। রাঘবের সহিত যখন তিনি পরামর্শ করিতে যান, 'তোমার উপরেই ধর্ম্মারণ্যরক্ষার ভার, তুমি আপন বিবেচনামত উপস্থিত বিষ-

য়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ কর,' রাঘবকে যখন তিনি এই সকল কথা বলেন, নতমস্তকে রাঘব তখন এই উত্তর দেন যে, 'অবধারণের কর্ত্তা আমি নহি, আপনার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেই এ দাস দুঃসাধ্য কার্য্যে অগ্রসর হইবে।'

রাঘবের উপযুক্ত কথা রাঘব বলে, বিশ্বাস ও স্নেহের উপযুক্ত কথা শম্ভুরাম বলেন, উভয়েই উভয়ের প্রতি সমান অনুরক্ত; কার্য্যেও সেই অনুরক্তির সমান পরিচয় হয়। একটু অসময় হইলেও এইখানেই রঙ্গিলা সম্বন্ধে একটু আভাস দিয়া রাখা অনুচিত বোধ হইতেছে না। রঙ্গিলার প্রকৃত নাম রঙ্গিলা নহে, প্রকৃত নাম ভবানী। শম্ভুরামের অভ্যাস, ভবানীর নাম উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই 'মা' শব্দ উচ্চারণ করেন, পরিণীতা পত্নীকে সম্বোধন করিবার সময় পাছে সেইরূপ বিসদৃশ ঘটনা হয়, সেই ভয়ে সাবধান হইয়া অথচ একটু কৌতুক করিয়া ধর্ম্মশীলা সহধর্ম্মিণীর নাম রাখিয়াছেন,—রঙ্গিলা। ধার্ম্মিকলোকের কর্ণে শিষ্যের বদনে গুরুপত্নীর নাম অপ্রিয় হইলেও, রাঘব সর্ব্বদা গুরুপত্নীকে রঙ্গিলা নামে সম্বোধন করেন। প্রথম প্রথম ইহার তাৎপর্য্য বুঝা যাইত না, পরিশেষে অরণ্যপথে রাঘবের মনোভাব পরিস্ফুট হওয়াতে বিস্ময়-সহকারে সেই তাৎপর্য্য অনুভূত হইয়াছে। রাঘব অবশ্য শম্ভুরামের প্রিয়শিষ্য; গুরুর সহিত শিষ্যের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ, অথচ সরলহৃদয় শম্ভুরাম স্নেহবশে সময়ে সময়ে রাঘবকে ভাই বলিয়া আদর করেন, রঙ্গিলা সেই সূত্র ধরিয়া রাঘবকে দাদা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; রাঘব কিন্তু রঙ্গিলাকে দিদি বলিতেন না, অথচ মৌখিক সম্বোধনে ভগ্নীর ন্যায় সমাদর জানাইতেন। রঙ্গিলার প্রকৃত নাম রঙ্গিলা না

হইলেও আমরা এই আখ্যানের উপসংহারকাল পর্য্যন্ত রঙ্গিলাকে রঙ্গিলা বলিয়াই পরিচয় দিব।

যে দিন গুপ্তচরমুখে শম্ভুরাম শ্রবণ করিলেন, নগরের রাজা অচিরে আশ্রম আক্রমণ করিবে, সেই দিন সন্ধ্যার পর ভবানীদেবীর আরতি-দর্শনান্তে প্রত্যাগত হইয়া তিনি রঙ্গিলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনুসঙ্গিক দুটী পাঁচটী বাক্যালাপের পর গম্ভীর-বদনে বলিলেন, "রঙ্গিলা সম্প্রতি নূতন সঙ্কট উপস্থিত, ধর্ম্মবুদ্ধিপরিশূন্য নগরের রাজা নিয়ত তাহার প্রজাগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। অসহায় প্রজাগণের প্রতি আমি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করি বলিয়া আমার প্রতি তাহার আক্রোশ, ইহা তুমি জান; সেই পাপিষ্ঠ এক্ষণে ভবানীদেবীর রক্ষিত এই পবিত্র আশ্রম আক্রমণ করিতে উদ্যত। বোধ করি, আপাততঃ দিনকতক তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

পতিপরায়ণা রঙ্গিলা বলিলেন, "ভবানীদেবী রক্ষা করিবেন, সে জন্য তোমাকে চিন্তিত হইতে হইবে না; ধর্ম্মের বিঘ্নকারী যাহারা, ধর্ম্ম তাহাদিগকে নির্ম্মূল করেন; পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহাই চিরদিন শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। তোমাকে পরাভব করিতে কাহারও সাধ্য হইবে না। দাদা কোথায়? অনেক দিন অবধি তাঁহাকে আমি দেখিতে পাই না; তাঁহার অসুখ হইয়াছিল, তিনি কেমন আছেন, সে সংবাদও আমি পাই না, তুমিও একদিনও সে কথা আমাকে বল না। দাদা আর আমাকে দেখা দেন না। তাঁহার মুখে ভক্তির কথা, ধর্ম্মের কথা, স্নেহের কথা এখন আমি শুনিতে পাই না। যখন

একাকিনী থাকি, তখনই সেই সব কথা আমার মনে হয় ; তিনি এখন কেমন আছেন ? ভাল আছেন ত ?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "ভাল আছেন, মস্তিষ্ক কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিল, সেই কারণে আমি তাঁহাকে কিছু দিন বিশ্রাম করিতে বলিয়াছি ; বহুশ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছি, এক স্থানে কিছু দিন নিরুদ্বেগে অবস্থান করিলে শরীর সুস্থ হইবে,তন্নিমিত্তই তিনি এখন আর কোথাও গতিবিধি করেন না ; সন্ধ্যার সময় দেবীর মন্দিরে গমন করেন, সেইখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, আমিও সময়ে সময়ে তাঁহার কুটীরে গমন করিয়া প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দান করি। যে কথা এখন বলিলাম, তাহাতে বোধ হয়, রাঘবের বিশ্রামভঙ্গ হইবে। অকস্মাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ যদি সংঘটিত হয়, তাহা হইলে রাঘবের সাহায্য ব্যতীত আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিব না।"

রঙ্গিলার বদন একটু বিষণ্ণ হইল, তিনি বলিলেন, "দাদাকে যুদ্ধ করিতে হইবে ? অসুস্থ শরীরে যুদ্ধ করিতে কি তিনি সমর্থ হইবেন ? কেন প্রভু, তোমার সৈনিকদলে ত বীরপুরুষের অভাব নাই ? তাহারা কি যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী হইতে পারিবে না ? মা ভবানী তোমার সহায়, সৃষ্টিকালাবধি তিনি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে অসুর-নাশিনী, তাঁহার কৃপাবলে তুমি কি রণজয়ী হইতে পারিবে না ?"

শম্ভুরাম বলিলেন, "পারিব, সংগ্রামে শত্রুসমীপে অগ্রসর হইতে আমি শঙ্কা রাখি না, ভবানী আমার হৃদয়কে নিঃশঙ্ক করিয়াছেন, সকলিই সত্য ! কিন্তু রাঘব আমার দক্ষিণ হস্ত, কি সঙ্কটে, কি উৎসবে রাঘব আমার সঙ্গে না থাকিলে আমার হৃদয় যেন দুর্ব্বল হইয়া যায়।

বিশেষতঃ সৈন্যসজ্জায়, ব্যূহরচনায় রাঘব সুপণ্ডিত, সে সকল বিষয়ে আমার তাদৃশ অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। অতএব রাঘবকে আমার প্রয়োজন হইবে। দিন দিন তাঁহার শরীর সুস্থ হইয়া আসিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে তাহার কষ্ট হইবে না। আরও কি জান, রাঘব আমার সেনাদলের প্রধান সেনাপতি ;—সুদক্ষ সেনাপতি। অশ্বপৃষ্ঠে রাঘবকে উপস্থিত দেখিলে সেনাদল দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া শতগুণ বল প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে রণক্ষেত্রে রাঘবকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

রঙ্গিলা নিরুত্তর হইলেন, শম্ভুরাম গাত্রোত্থান করিয়া রাঘবের কুটীরাভিমুখে চলিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

মকরসংক্রান্তি ;—রজনী প্রভাত হইল ; সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। মকরে প্রখর প্রভাকর। মাঘমাসের প্রথম দিবসে এ বাক্য সিদ্ধ হয় না, সূর্য্যরশ্মি অপ্রখর। দিবাকর অধিকক্ষণ গগনমণ্ডলে বিহার করিলেন না, সার্দ্ধ-ত্রিপ্রহর পূর্ব্বাকাশ হইতে পশ্চিমাকাশে বিচরণ করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের পশ্চিমকোণে কিঞ্চিৎ মেঘোদয় হইল। বনস্থলী মহা অন্ধকারে আবৃত। ভবানীর মন্দির হইতে প্রত্যাগত হইয়া শম্ভুরাম একখানি প্রস্তরাসনে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় একটী লোক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শম্ভুরাম অনাবৃত স্থানে ছিলেন না, কুটীরমধ্যেই উপবিষ্ট ছিলেন, একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই স্তিমিত দীপপ্রভায় শম্ভুরাম দেখিলেন, যেন মানবের ছায়া-মূর্ত্তি ; মুখ তুলিয়া মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, চিনিতে পারিলেন, বাকী খাজানার নিমিত্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যাহারা সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রী-কন্যাকে বিবস্ত্রা করিতেছিল, সম্মুখবর্ত্তী ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে প্রধান, শিউড়ির গোমস্তা। শম্ভুরামের প্রতাপে তাহারা পরাস্ত হইয়া বশীভূত হইয়াছিল, রাজসরকারের চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিল, তদবধি এই গোমস্তা আমাদের শম্ভুরামের সেবক। সর্ব্বদা নিকটে নিকটে থাকে, কিন্তু অবসর বুঝিলেই উপযুক্ত সংবাদ প্রদান করিয়া, গুরু-

দেবের চরণ বন্দনা করিয়া চলিয়া যায়। পরিচিত হইলেও এইখানে পুনরায় বলিয়া রাখিতে হইবে,ঐ গোমস্তা নগরের রাজার অধীন ছিল।

শম্ভুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ?"

গোমস্তা বলিল, "অনেক দিবসাবধি, যে একটা জনরব উঠিয়াছিল, তাহা সত্য। নগরের রাজা বহু সৈন্যসংগ্রহ করিয়াছে; অদ্য রাত্রে আশ্রম আক্রমণ করিবে। আমি দেখিয়া আসিলাম, শতাধিক হস্তী, সহস্রাধিক অশ্ব এবং প্রায় পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী পদাতিক নানা প্রহরণ ধারণ করিয়া আশ্রমের অদূরে উপস্থিত হইয়াছে। কোন সময়ে আক্রমণ করিবে, তাহা আমি এখনও অবগত হইতে পারি নাই। অতর্কিতভাবে দস্যুগণ আসিয়া পড়িলে, বিপদ্ সংঘটিত হইতে পারে, ইহা বুঝিয়াই প্রভুকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

শম্ভুরাম কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "সংবাদ আমি জ্ঞাত আছি, বিপক্ষের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। আমার সৈন্যগণও সর্ব্বদা প্রস্তুত; তবে কি না, নির্দ্দিষ্ট সময় পরিজ্ঞাত না থাকাতে কতকটা চিন্তাযুক্ত ছিলাম, তুমি আসিয়া নিশ্চিত সংবাদ প্রদান করাতে উপকৃত হইলাম; তুমি আসিয়া ভালই করিয়াছ। এখন তুমি কি করিবে, ফিরিয়া যাইবে কিংবা আমার পক্ষীয় লোকদিগকে পথ দেখাইবার নিমিত্ত এইখানেই অপেক্ষা করিবে ?"

গোমস্তা বলিল, "যদি অনুমতি হয়, তবে এইখানেই থাকিতে পারি; নতুবা বাহিরে বাহিরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া বিপক্ষ-পক্ষের সলা পরামর্শ জানিবার চেষ্টা করি। আমি শুনিয়াছি, অগ্রে তাহারা ভবানীদেবীর

মন্দির আক্রমণ করিবে; দেবীর প্রতিমা চূর্ণ করিয়া, নদীর জলে ডুবাইয়া দিবে; তাহার পর ধর্ম্মারণ্য ধ্বংস করিয়া আশ্রমবাসিগণকে জীবন্ত ধরিয়া লইয়া যাইবে। যদি কেহ প্রতিবন্ধকতা করে, তাহা হইলে মহামারী উপস্থিত করিবে। আমি আরও শুনিয়াছি, রাজা স্বয়ং সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণের সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। রাজা যদিও যুদ্ধবিশারদ নহে, তথাপি সেনাগণের বিক্রমের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্মকানন নষ্ট করিয়া দিবে, ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তাহা হইলেই ভাল হয়, রাজবাটী হইতে রাজাকে ধরিয়া আনা আমি কিছু ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিবেচনা করিতেছিলাম। দুরাশয় রাজা যদি স্বয়ং পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করে, আপনি আসিয়া যদি এই জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দেয়,তাহা হইলেই আমি সুখী হই। তুমি এখন যাইতে পার, অবসর বুঝিয়া সংবাদ দিও। আমরা সকলেই প্রস্তুত হইয়া রহিলাম, ভবানী দেবীর মন্দিররক্ষার নিমিত্ত এখনি আমি সুবন্দোবস্ত করিব।"

প্রণাম করিয়া গোমস্তা বিদায় হইল। শম্ভুরাম যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, স্বয়ং রাঘবের কুটীরে গমন করিয়া গোমস্তাকথিত বিবরণগুলি বিজ্ঞাপন করিলেন; কহিলেন, "এ যুদ্ধে আমি স্বয়ং সেনাপতি হইব, আশ্রমের উত্তরদিকে আমি অবস্থান করিব, তোমাকে দক্ষিণাংশের সেনাদলের সেনাপতি হইতে হইবে। তুমি প্রস্তুত হও, আমি এখন ভবানীদেবীর মন্দিরের ব্যবস্থা করিতে চলিলাম।"

রাঘবের মুখে সময়োচিত পরামর্শ শ্রবণ করিয়া শম্ভুরাম কতিপয় সৈনিক পুরুষের সহিত দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, সেখানে

বিপ্রবরকে উপস্থিত সঙ্কট বিজ্ঞাপন করিয়া মন্দিররক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন, মন্দিরের চারিধারে একশত অস্ত্রধারী সৈনিক পুরুষ সতর্ক হইয়া সমস্ত রজনী প্রহরিতা করিবে। বিপক্ষদলের কোন লোক দুষ্ট-বুদ্ধিতে মন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইলে প্রথমে কৌশলক্রমে তাহাদিগকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিবে। তাহাতেও যদি কৃতকার্য্য না হয়, দু একটা মস্তক দেবীর উদ্দেশে বলিদান করিবে, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে অধিক রক্তপাত করিবে না।"

সৈনিকগণকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া শম্ভুরাম পুনরায় রাঘবের কুটীরে আসিলেন ;—বলিলেন, "বিপক্ষপক্ষ রণাভিলাষে অগ্রসর হইলেও অগ্রে আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিব না, তাহারা আক্রমণ করিলে আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করিব. ইহাই আমার যুক্তি ; আততায়িগণকে বিনাশ করাই সাধুসম্মত। আপনারা আততায়ী হইয়া অপরের অনিষ্টসাধন করা ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ।"

রাঘব এই যুক্তিতে সায় দিলেন। সময়োচিত আরও অনেক প্রকার পরামর্শ হইতে লাগিল। রাত্রি দশ দণ্ড অতীত। তিথি শুক্লপক্ষের পঞ্চমী। আকাশে অল্প অল্প মেঘ থাকিলেও পঞ্চকলা শশধর তরল মেঘের ছায়ায় ছায়ায় রাত্রি দশ দণ্ড পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া অল্পে অল্পে অদৃশ্য হইলেন। এতক্ষণ বরং বনমধ্যে মেঘাবৃত চন্দ্রের অপরিস্ফুট কিরণ প্রভাসিত হইতেছিল, চন্দ্রের অস্তগমনে সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেল ; বনভূমি ঘোর অন্ধকার। দূরস্থ ও নিকটস্থ দীর্ঘ দীর্ঘ তরুকুঞ্জ যেন এক একটী অন্ধকার পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। শীতকালের আকাশে গাঢ় মেঘমালাও ক্রমাগত ঘনীভূত হইয়া আসিল,

পূর্ব্বদিকে কাদম্বিনী-ক্রোড়ে একবার চপলা চমকিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ।

সৈন্যগণ পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিল, তাহাদের দুই জন নায়ক শীঘ্র শীঘ্র শম্ভুরামের সমীপবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইবার অনুমতি চাহিল। শম্ভুরাম বলিলেন, "আমি অগ্রে যাইব, তোমরা আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে। আমার অশ্ব আনয়ন করিতে বল।"

নায়কেরা অনুমতি লইয়া চলিয়া গেল। অনতিবিলম্বে শম্ভুরামের ও রাঘবের দুটী অশ্ব সেই স্থানে আনিত হইল। শম্ভুরামের অশ্বের নাম 'লাল,' এ পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। রাঘবের অশ্বের নাম 'রঘুবর'। উভয় অশ্বই রণকৌশলে সুশিক্ষিত।

লালের পৃষ্ঠে শম্ভুরাম ও রঘুবরের পৃষ্ঠে রাঘব আরোহণ করিলেন। সৈন্যগণ আহূত হইল, গণনায় এক সহস্র। তন্মধ্যে পাঁচ শত শম্ভুরামের ও অবশিষ্ট পাঁচ শত রাঘবের অনুবল হইল। দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহারা অরণ্য-সীমায় উপস্থিত হইলেন;—উত্তরাংশে শম্ভুরাম, দক্ষিণাংশে রাঘব। তাঁহাদের সৈন্যগণের মধ্যেও প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষেরা অশ্বারোহী। তাঁহাদের হস্তেও এক এক রণশৃঙ্গ। সেনাপতির সঙ্কেতে ভোঁ ভোঁ শব্দে সেই সব শৃঙ্গ বাজিতে লাগিল। বিপক্ষ-সৈন্য কিছু দূরে ছিল, শৃঙ্গধ্বনি শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে মহা-বেগে ধাবিত হইয়া আসিল, উভয়দলে সম্মুখ-যুদ্ধ আরম্ভ। বিপক্ষদলের শত অনুচরের হস্তে, শত শত প্রজ্বলিত মশাল, আশ্রমবাসী সেনাদল অন্ধকারে অসি, চর্ম্ম, ধনুর্ব্বাণ, সুতীক্ষ্ণ বর্শা, দীর্ঘ দীর্ঘ সড়কী, প্রভৃতি হস্তে দণ্ডায়মান; কাহারো কাহারো হস্তে আগ্নেয়াস্ত্র।

দেখিতে দেখিতে উভয়দলে অবিশ্রান্ত অস্ত্রবৃষ্টি, উভয়পক্ষেই শত শত লোক হতাহত, এই সময় গুড় গুড় করিয়া মেঘ ডাকিল, মুষলধারে এক পসলা বৃষ্টি হইল, বিপক্ষ-পক্ষের সমস্ত মশাল নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, ভীষণ অন্ধকারে রণস্থল পরিব্যাপ্ত, অন্ধকারেই মহাসংগ্রাম, অন্ধকারে শত্রু মিত্র ভেদ করা অসাধ্য হইয়া উঠিল, পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়দলই রণশায়ী হইতে লাগিল। শম্ভুরামের লাল সর্ব্বপ্রকারে সুশিক্ষিত, রণক্ষেত্রে কিরূপে বিচরণ করিতে হয়, তাহা তাহার বিলক্ষণ জানা ছিল; অন্ধকারেও তাহার দক্ষতার কিছুমাত্র অপচয় হইল না। বিপক্ষ যখন শম্ভুরামের মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি চালনা করিল, লাল তখন জানু পাতিয়া নত হইয়া রহিল। বিপক্ষ যখন শম্ভুরামের কটিদেশ অথবা উরুদেশ লক্ষ্য করিয়া অসি উদ্যত করিল, লালও তখন লম্ফ দিয়া দুই তিন হাত উর্দ্ধে উঠিল। অরাতিপক্ষের সমস্ত লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল; যোধগণের শোণিতে কাননপ্রান্তে রক্তনদী বহিল। যে দিকে শম্ভুরাম সেনাপতি, সেই দিকে প্রকাণ্ড এক গজপৃষ্ঠে অসিধারী নগরীর রাজা; তাঁহার মস্তকের কিরীটের রত্ন-জ্যোতিতে শম্ভুরাম তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার প্রাণবিনাশ করা শম্ভুরামের ইচ্ছা ছিল না। লালকে সম্মুখে চালিত করিয়া শম্ভুরাম অতি চমৎকার কৌশলে রাজার হস্তের তরবারি কাড়িয়া লইলেন। বাহুবলে হস্ত আকর্ষণ করিয়া হস্তীপৃষ্ঠ হইতে রাজাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন; পার্শ্বের লোকেরা ইঙ্গিত বুঝিয়া রাজাকে তৎক্ষণাৎ লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিল। রাজার হতাবশিষ্ট সেনাগণ জীবনে হতাশ হইয়া অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

শম্ভুরামের জয়লাভ। তাঁহার বিজয়ী সৈন্যগণ 'জয় ভবানী দেবী! জয় গুরুদেব!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

ওদিকে দক্ষিণাংশে রাঘব বিপক্ষের সর্ব্ব-সৈন্য দলন করিয়া 'জয় ভবানী দেবী' শব্দে রণস্থল বিকম্পিত করিতেছিলেন, একজন যোদ্ধা ভীষণ তরবারি-প্রহারে রঘুবরের সম্মুখের দুইখানি পদচ্ছেদন করিয়া ফেলিল। রঘুবর বিকলাঙ্গ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে রাঘবও পতিত হইলেন; বিপক্ষের শরাঘাতে তাঁহার কলেবর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রুধিরাক্ত হইয়াছিল; পতনমাত্রেই তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। সেই অবসরে তাঁহার অনুবর্ত্তী সেনাগণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজপক্ষীয় সেনাগণকে খণ্ডবিখণ্ড করিতে আরম্ভ করিল; যাহারা বাঁচিল, তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। এই সময়ে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল, দু একটী মশাল জ্বলিয়াছিল, সমুজ্জ্বল উষ্ণীষধারী একটী যুবাপুরুষ একটী মশাল হস্তে লইয়া ভূপতিত রাঘবের নিকটবর্ত্তী হইলেন। শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তাঁহার নেত্রযুগল অশ্রু-প্লাবিত হইল। চারি জন রক্ষী পুরুষের সহিত ধরাধরি করিয়া রাঘবের অচেতন দেহ তিনি একটী বৃক্ষতলে স্থাপন করিলেন। কে সেই যুবাপুরুষ?—শীঘ্র যদি চলিয়া না যান, অচিরে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

যাঁহারা ভবানী দেবীর মন্দির ভগ্ন করিবার উদ্দেশে মন্দির আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, মন্দির-রক্ষকেরা ইতিপূর্ব্বেই তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিল। বহুলোককে প্রাণে মারে নাই; দশজনমাত্র কাটা পড়িয়াছিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মারণ্যের এক নিভৃত প্রদেশে একখানি পর্ণকুটিরে সামান্য শয্যায় বিক্ষতাঙ্গ রাঘব শয়ন করিয়া আছেন, অল্প অল্প জ্ঞানোদয় হইয়াছে ; ক্ষণেক অবসাদ, ক্ষণেক বিক্ষোভ, ক্ষণেক নিস্তব্ধ, ক্ষণেক অস্পষ্টভাষ, নেত্রপুট ক্ষণেক উন্মীলিত, ক্ষণেক নিমীলিত ; ক্ষণেক নিশ্চেষ্ট, ক্ষণেক সচেষ্ট . শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষণেক দীর্ঘ, ক্ষণেক হ্রস্ব ; বদনে অথবা অপরাপর অবয়বের লক্ষণে কোনপ্রকার যন্ত্রণার ভাব অভিব্যক্ত হইতেছে না ; রাঘবের তখন এইরূপ অবস্থা।

শয্যাপার্শ্বে শম্ভুরাম, একজন সেনানায়ক, চারিজন অনুচর আর সেই অপরিচিত যুবাপুরুষ। শম্ভুরাম ক্ষুদ্র একটী যন্ত্রের সাহায্যে রাঘবের ওষ্ঠপুটে বিন্দু বিন্দু দুগ্ধ প্রদান করিতেছেন। রাঘব একবার নয়ন উন্মীলন করিলেন ; দৃষ্টি শম্ভুরামের মুখের দিকে ; নয়নের সঙ্কেতের ভাবে শম্ভুরাম বুঝিলেন, কুটীরের অপর লোকগুলিকে সরাইয়া দিবার ইচ্ছা।

পার্শ্বস্থিত লোকগুলিকে সম্বোধন করিয়া মিষ্টবচনে শম্ভুরাম বলিলেন, "তোমরা ক্ষণেকের নিমিত্ত অন্য একখানি কুটীরে প্রবেশ কর ; বোধ হয়, নির্জ্জনে আমাকে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা রাঘবের মনে উদয় হইতেছে।"

লোকেরা দ্বিরুক্তি না করিয়া আদেশ পালন করিল, শয্যাপার্শ্বে

শম্ভুরাম একাকী রহিলেন ; মুখের কাছে মুখ নীচু করিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে ধীরে ধীরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাঘব! ভাই! প্রিয়তম! আমাকে কি কিছু বলিবার ইচ্ছা করিতেছ?"

রাঘব একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ; অর্দ্ধপরিস্ফুট ক্ষীণ স্বরে অল্পে অল্পে থামিয়া থামিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব—মা—ভবানী—দেবীর—চরণে—নমস্কার!—মায়া—সংসারের—মায়া—জীবনের—মায়া—আপনার—চরণ—প্রসাদে—আমি—মায়া—মমতায়—বিসর্জ্জন—দিয়া—ভবানীর—পাদপদ্ম—আপনার—পাদপদ্ম—সেবা করিয়াছি—"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে বীরপুরুষের নির্জ্জল চক্ষু সহসা বাষ্প-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল ; কষ্টে—অতি কষ্টে, অশ্রু সংবরণ করিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব!—প্রভু!—ক্ষমা—করুন্—আমার—হৃদয়—নির্ম্মল—ছিল—কুক্ষণে—দেবীরূপে—নয়ন—আকৃষ্ট হইয়া—ছিল।—আপনার—ধর্ম্ম—পত্নীর—সুপবিত্র—রূপরাশির—দিকে—আমার—পাপ—দৃষ্টি—নিপতিত—হইয়াছিল—কেন—তৎ-ক্ষণাৎ—জ্বলিয়া—যায়—নাই—জানি—না?—ভবানীর—কি—মনে—ছিল—জানি—না—আমার—অন্তরে—অন্তরে—পাপ—কি—পাপ—চিন্তা—প্রবেশ—করিয়াছিল—মনের—পাপানলে—আমি—দগ্ধ—হইতে—ছিলাম।—তাহার—পরেই—এই—মহাযুদ্ধ—সংঘটন।—উত্তম—অবসর—প্রাণের—মায়া—ত্যাগ—করিয়া—আমি—সমরে—প্রবৃত্ত—হইয়া—ছিলাম—যে—ব্রত—ছিল—না,—রণক্ষেত্রে—সেই—ব্রতে—ব্রতী—হইয়া—ইচ্ছা—পূর্ব্বক—আমি—অনেকগুলি—নরহত্যা

—করিয়াছি।—যে—পাপে—আমি—পাপী—তাহার—নিকট—এ—পাপ—অতি—তুচ্ছ। আর—মানুষ—মারিব—না—আমি—নরাধম—তিনি—দেবী—আমি—তাঁহাকে—প্রণাম—করিবার—অযোগ্য।—তিনি—যেন—কৃপা—করিয়া—ক্ষমা—করেন।—প্রভু!—নররূপী—দেবতা!—আজ—ঐ—চরণের—দাস—এই—নরাধম—রাঘব—আপনার—চরণে—আশীর্ব্বাদ—চাহিতেছে,—শান্তি—শান্তি এ—দাস—যেন—শান্তিধামে—প্রস্থান—করে।—যে—ধামে—জরা—নাই—মৃত্যু—নাই—রোগ—নাই—শোক—নাই—মোহ—নাই,—লোভ—নাই—ইন্দ্রিয়ের—বিকার—নাই—যে—ধামে—ইন্দ্রিয়—সংযমের—পন্থা—পরিষ্কার—সেই—ধামে—যেন—যাইতে—পাই—সঙ্কল্পে—অশ্ব—পৃষ্ঠে—বসিয়া—আমি—অস্ত্র—পরিত্যাগ—করি—সেই—সুযোগে—শত্রু—খড়্গে—আমার—রঘুবর—বিকলাঙ্গ—হইয়া—পড়ে—তাহার—পতনেই—আমার—পতন—সে—পতন—আমার—ভাগ্য—সেই—পতনে—এখন—আমি—পতিত—দয়া—করিয়া—পদ—ধূলি—প্রদান—করুন—আপনার—চরণে—প্রণাম—করি।—গুরুপত্নী—দেবীকে—আমার—প্রণাম—জানাইবেন—শেষ—প্রণাম—এ—জন্মে—আর—প্রণাম—করিতে—আসিব—না—পবিত্র—পবিত্র—পন্থা—পরিষ্কার—আশীর্ব্বাদ—সেই—সুপবিত্র—শান্তিধামে—যেন—আমি—আশ্রয়—পাই—বিদায়—জন্মের—মত—বিদায়—ভবানীর—চরণে—এই—ভিক্ষা—পরলোকে—আপনার—তুল্য—গুরুদেবের—সহিত—যেন—আমার—মিলন—হয়;—জন্মান্তরে—আপনার—তুল্য—দেব—সদৃশ—গুরু—যেন—পাই।"

আর বাক্যস্ফুরণ হইল না; দেখিতে দেখিতে পরিতাপীর যুগল নেত্র নিমীলিত, প্রাণপাখী উড়িয়া গেল!

শম্ভুরামের দয়ার্দ্র হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তাঁহার লোচন-যুগলে অবিরল বারিধারা। মহাপুরুষ নীরবে রোদন করিলেন। যিনি কখনও শোক-দুঃখে অভিভূত হন না; রাঘবের বিরহে তিনি ক্ষণেকের নিমিত্ত শোকাভিভূত হইলেন।

সর্ব্বদা শম্ভুরামের সঙ্গে সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র শঙ্খ থাকিত, তখনও ছিল, তিনি তিনবার শঙ্খধ্বনি করিলেন, যাহারা ইত্যগ্রে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহারা সেই কুটীরে পুনঃ প্রবেশ করিল; তখনকার দৃশ্য বর্ণনা করা অসাধ্য। শোকে অধীর হইয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। স্বয়ং কাতর হইয়াও শম্ভুরাম প্রবোধবাক্যে সকলকে সান্ত্বনা করিলেন। ভয়ঙ্করী কাল-বিভাবরী উষাদেবীকে আসন দিয়া বিদায় হইয়া গেল; উষাও সে শোকাবহ দৃশ্য অধিকক্ষণ দেখিতে পারিল না; অল্প অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল, প্রভাত।

ময়ূরাক্ষী * নদীতীরে ধর্ম্মানুসারে রাঘবের দেহের সৎকার করা হইল।

নৈশ সংগ্রামে উভয় পক্ষের যে সকল সৈন্য নিহত হইয়াছিল, রীত্যনুসারে তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শম্ভুরাম

---

* ময়ূরাক্ষী নদীকূলে রাঘবের সৎকার। এই নদীর একটী বিচিত্রতা আছে। গয়াধামের ফল্গু নদী যেমন অন্তঃসলিলা, বীরভূমের ময়ূরাক্ষী সেরূপ নহে। নদীতে যখন জল থাকে না, বালুকারাশি ধু ধু করে, পান্থলোকে পদব্রজে পার হইয়া যায়, সেই সময়ে আকাশে একটু মেঘ উঠিলে ময়ূরাক্ষী এককালে তীরভূমি অতিক্রম করিয়া পরিপ্লাবিত হইয়া থাকে।

শোকাকুল চিত্তে রঙ্গিলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, যখন গেলেন, তখন তাঁহার দিব্য শান্তভাব। পতিমুখে নির্ঘাত সংবাদ শ্রবণ করিয়া রঙ্গিলা দেবী আর্ত্তরব করিয়া ভূলুণ্ঠিতা হইলেন ; সান্ত্বনা দান করিয়া শম্ভুরাম কহিলেন, "শোক করিতে নাই। যে সকল বীরপুরুষ সম্মুখ-সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা স্বর্গবাসী হন। কাহার জন্য শোক? শোকের কোন কারণ নাই। মৃত্যু?—মৃত্যু কি?—জীবাত্মা এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করেন, জগতের ভ্রান্ত লোকে ইহাকেই মৃত্যু বলে ; মৃত্যু নাই, আত্মা অবিনাশী, আত্মার ধ্বংস হয় না, তবে কেন আত্মীয় বিরহে শোক? দেবি! তুমি বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মশীলা, তুমি মহাভারত পাঠ করিয়াছ, ভারত-যুদ্ধে কুরু-কুল ধ্বংস হইলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সতী এবং রাজা যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, যখন মহা শোকে আকুল হইয়াছিলেন, তখন মহর্ষি বেদব্যাস হস্তিনায় আগমন করিয়া যোগবলে রণনিহত পুরুষগণের মূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়াছিলেন ; সশরীরে স্বর্গধামে প্রবেশ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরও নিহত আত্মীয়বর্গকে অমররূপে দর্শন করিয়া-ছিলেন। শোক করিবার কোন কারণ নাই। আত্মাকে বশীভূত করিতে পারিলেই, নশ্বর নরদেহের অনিত্যতা অনুভব করিলেই সমস্ত শোকের অবসান হয়। অতএব তুমি বৃথা শোক সংবরণ কর।

শম্ভুরাম এরূপ অনেক উপদেশ দিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে যে রাঘব মানসিক পাপ স্বীকার করিয়াছিলেন, সে কথাটী রঙ্গিলাকে বলিলেন না। পতির মহার্ঘ উপদেশে রঙ্গিলা দেবী প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন।

যে সময়ের কথা, সে সময়ে বিদ্যুৎ ইহ-সংসারে দৌত্যকার্য্য করিত

না, তথাপি রাঘবের মৃত্যুসংবাদ বিদ্যুদ্গতিতে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল। যাঁহারা যাঁহারা শম্ভুরামের দৈবক্ষমতার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা আশ্রমে উপনীত হইয়া সম্ভবমত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, মানভূমের রাজা বলেন্দ্রসিংহ, রাজরাণী অহল্যা দেবী এবং রাণীগঞ্জের বংশীবদন ধর্ম্মারণ্যে আগমন করিয়া গুরুদেবের সহিত সহানুভূতি জানাইলেন;—বিষাদের সহিত পূর্ণ সহানুভূতি।

এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত অপরিচিত যুবাপুরুষের পরিচয়। যুবাপুরুষকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া শম্ভুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? আপনি যে দয়া করিয়া আহত রাঘবের শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তাহার বা কারণ কি?"

যুবক উত্তর করিলেন, "আমি আমার পিতার সৈন্যসামন্তের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলাম। পিতার প্রতি আমার তাদৃশ শ্রদ্ধা নাই। যুদ্ধক্ষেত্র উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু তাঁহার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করি নাই। আপনি গুরুদেব, তাহা আমি জানিতাম, তাবৎ লোকে আপনাকে ভাকাইত বলিয়া দুর্নাম দেয়, তাহাতে আমি মনে মনে অতিশয় ক্ষুণ্ণ থাকিতাম; অন্তরে অন্তরে আমি সর্ব্বদাই আপনার গুণের পক্ষপাতী; অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার দলে না থাকিয়া যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত আমি বীরবর রাঘবের পার্শ্বরক্ষক ছিলাম; রাঘবের পক্ষ হইয়াই যুদ্ধ করিয়াছি। রাঘব যখন অস্ত্রত্যাগ করিয়া ছিন্নপদ অশ্ব হইতে ভূপতিত হন, তখন আমি তাঁহাকে সযত্নে বৃক্ষতলে লইয়া রাখিয়াছিলাম, সেই সময় ভারত প্রবীর ভীষ্মদেব আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রত্যাগ করিয়া যেরূপে ভীষ্মদেব শরশয্যা আশ্রয় করেন তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু

হইয়াছিল, দক্ষিণায়নে তিনি তনুত্যাগ করেন নাই; শরশয্যায় শয়ন করিয়া উত্তরায়ণ-সংক্রমণে মাঘমাসের শুক্লাষ্টমীতে তি... গমন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাঘবের ইচ্ছামৃত্যু হয় নাই ব... তিনি উত্তরায়ণের দ্বিতীয় দিবসে নরলীলা সংবরণ করিয়াছেন... রাঘব! ধন্য আপনার ধর্ম্মাশ্রম! আপনিও ধন্য! ভবা... আপনার প্রতি চিরপ্রসন্ন। নগরের রাজা আমার পিতা, ... লোকের প্রতি তিনি অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেন, সেই কারণে ... অনুচিত কার্য্য হইতে আমি স্বতন্ত্র থাকিতাম, এক্ষণে আমি ... নার শরণাপন্ন হইলাম, রাজ্যসুখের আশা ত্যাগ করিয়া অ... এই ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিতে অভিলাষ করি।' আপনার কৃপাভিলা... অনুগত দাসের নাম অচ্যুতানন্দ।"

শম্ভুরাম বলিলেন, "তুমি দীর্ঘজীবী হও, এখন তোমাকে ... বাসী হইতে হইবে না। তুমি তোমার পিতৃরাজ্যে রাজা ... প্রকৃত রাজধর্ম্মানুসারে রাজগুণে বিভূষিত হইয়া প্রজাপালন ... তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। গত রাত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি ... পিতাকে বন্দী করিয়াছি, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তোমার ... লইয়া গিয়া নজরবন্দীতে রাখিতে পার।"

কুমার অচ্যুতানন্দ বলিলেন, "পিতা অত্যাচারী হইলেও ... আমি বন্দী করিয়া রাখিতে পারিব না, আপনি আমাকে ক্ষমা ...

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শম্ভুরাম আপন অনুচরগণকে আদে... লেন, "বন্দীরাজাকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।"

রাজা আনীত হইলেন। বন্দী অবস্থায় মনে মনে যাহা তিনি ...

করিয়াছিলেন, শম্ভুরামের নিকটে তাহা প্রকাশ করিলেন, অ[illegible] ভবানীর সেবক হইয়া, শম্ভুরামের অনুগত হইয়া ধর্ম্মাশ্রমে বাস করি[illegible] বেন, পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ করিবেন, অকপটে ইহা[illegible] স্বীকার করিলেন। শম্ভুরাম তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন।

উপসংহার।

যে সকল পরাক্রান্ত অত্যাচারী লোক দরিদ্র প্রজা-লোকের উপর ক্রমাগত অত্যাচার করিত, তাহাদিগকে দমন করিয়া, সদুপদেশ-দানে দুষ্ট লোককে শিষ্ট করিয়া শম্ভুরাম নিশ্চিন্ত হইলেন। কুমার অচ্যুতা[illegible]নন্দ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ন্যায়ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। মন্দাকিনীকে লইয়া বংশীবদন সংসারী হইল, প্রতিমাসের অমাবস্যা-দিবসে ধর্ম্মাশ্রমে আসিয়া ভবানীর পূজা দিয়া শম্ভুরামের চরণ বন্দন করিয়া যাইত। রাজা বলেন্দ্রসিংহ দুইদিন আশ্রমে বাস করিয়া [illegible] দেবীর সহিত স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। সকল দিকেই মঙ্গল হইল। মাননীয় লোকেরা সকলেই জীবিত রহিলেন, চলিয়া গেলেন কেবল রাঘব।

শম্ভুরামের দস্যু দুর্নাম তিরোহিত হইয়া গেল। শত্রু মিত্র সকলেই তাঁহাকে সাধুপুরুষ বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। আগামী অমাবস্যা-রজনীতে শম্ভুরাম রঙ্গিলা দেবীর সহিত পরম ভক্তিভাবে মহা সমারোহে ভবানী দেবীর পূজা দিলেন; জটাধারী যোগিবর ভবানী [illegible] বিপ্রদেব তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ! জয় মা ভবানী

সম্পূর্ণ।